চুপিচুপি আসছে

সায়ন্তনী পূততুন্ড

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

চুপিচুপি
আসছে
Guess Who?
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সিরিয়াল কিলিং
সায়ন্তনী পূততুন্ড
BIVA
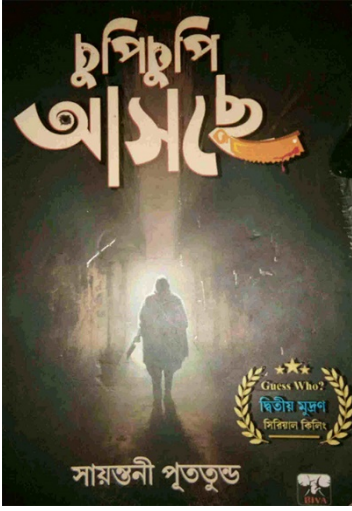
(১)

টিভিতে অনেকক্ষণ ধরেই চলছে 'টম অ্যান্ড জেরি'র লম্ফঝম্প। ছোট্ট ইঁদুর জেরি বড়সড় বিড়াল টমকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ছে। টম অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই জেরিকে বাগে আনতে পারছে না। বরং নিজেই ল্যাজে-গোবরে হয়ে শেষমেষ জিভ বের করে হাঁফাচ্ছে। যখনই বেচারি বিড়ালের ক্লান্ত হয়ে হাল ছাড়ার উপক্রম, ঠিক তখনই জেরি টমের আশেপাশেই সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে দৌড়ে বেরিয়ে তাকে আরও বেশি উসকে দিচ্ছে। কখনও পিন দিয়ে তার পশ্চাদ্দেশে খোঁচা মারছে, কখনও বা ধ্রাম করে হাতুড়ি বসিয়ে দিচ্ছে তার মাথায়! এক কথায় রীতিমতো টর্চার! টম নিরুপায় হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে, নখ বের করে হুড়ুম হুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম করে তার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছে।

নিতান্তই নিরীহ একটা মজার শো! বাচ্চা থেকে বুড়ো, প্রত্যেকেই 'টম অ্যান্ড জেরি' কার্টুনের ভক্ত। এই শো'টা দেখতে ভালোবাসে না, এমন কেউ বোধহয় নেই। এই চিরকালীন 'ইঁদুর বিড়ালে'র খেলা প্রায় অমর হয়ে আছে গোটা বিশ্বে।

টিভির ঠিক সামনে একটা জরাজীর্ণ প্রাচীন সোফাতে বসেছিল একটা একলা নিঃসঙ্গ মানুষ। ঘরটা অন্ধকার। তার মধ্যেই অদ্ভুত একটানা ধাতব তীব্র, তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মাঝে মাঝে কয়েক টুকরো স্ফুলিঙ্গ ঝিকিয়ে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গহ্বরে। একপাশে কালার টিভির উজ্জ্বল আলো সরলরেখায় এসে পড়েছে একটা অস্পষ্ট মুখে। মানুষটার মুখ পরিষ্কার না দেখা গেলেও সে যে অত্যন্ত আগ্রহে টম আর জেরির কোস্তাকুস্তি দেখে চলেছে তা তার হাবে-ভাবেই স্পষ্ট। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কালার টিভির স্ক্রিনের দিকে। টমের শোচনীয় পরাজয় দেখে, থেকে থেকেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে আর মনে মনে জেরির বুদ্ধির তারিফ করছে।

টিভির স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার ভুরু সামান্য অসন্তোষে বেঁকে গেল। 'টম অ্যান্ড জেরি' তার চিরকালের প্রিয় শো। এককথায় এই কার্টুন চরিত্র দুটিকে কিংবদন্তী বলা চলে। কিন্তু তার কাছে এর কৌতুকময় দিকটা কখনই প্রকাশিত হয়নি। টম

আর জেরি তার কাছে নিছকই বিনোদন নয়— বরং অনেক বেশি কিছু! হয়তো বা তার জীবনের সারসত্য! সে আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। গোটা পৃথিবী টম আর জেরিকে কার্টুন ক্যারেক্টার হিসাবেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু কেউ কখনও ভেবে দেখেছে কি টম সেই ব্যক্তিত্ব যে চিরকালই শিকারীর মর্যাদা পায়। তথাকথিত শক্তিশালী প্রাণী। যার কাছে ইঁদুরের পরাজয় নিশ্চিত। বিড়াল ইঁদুরকে খেলিয়ে খেলিয়ে শেষপর্যন্ত মারবেই— এটাই রূঢ় বাস্তব! টম হচ্ছে সমাজের সেই 'সুপিরিয়র' গোষ্ঠী যারা সবসময়ই খেলায় জিতে যায়। আর জেরি চিরকালই বঞ্চিতের দলে, যার বিড়ালের থাবায় পিষে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই! সে সেই পীড়িত, শোষিত ও ভীরু মানুষের প্রতিনিধি যাদের ভাগ্য লিখন পরাজয়েই শেষ হয়।

কিন্তু সবসময় তা হয় না! ডিকশনারিতে 'ব্যতিক্রম' বলেও একটা শব্দ আছে! ভাবতেই লোকটার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ভেসে ওঠে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল তীক্ষ্ণ, হিংস্র দাঁত। সে একটু টেনে টেনে হাসে। কখনও কখনও পরম শক্তিধর টমকেও নাস্তানাবুদ হতে হয় দুর্বল জেরির কাছে। শিকারী নিজেই শিকার হয়ে যায়! অবিকল এই টমের মতোই অসহায়, নিরুপায়ভাবে দেখে, জেরি জিতে যাচ্ছে! দুর্বল লোকটা মাত দিয়ে দিচ্ছে সবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে! তখন তার কিছু করার থাকে না! কিচ্ছু না! কী মজা! কী বীভৎস মজা!... লোকটা হাসতে হাসতেই হঠাৎ থেমে গেল! ধাতব শব্দটা 'রি রি' করে আরও তীব্র হয়ে উঠেছে! তার মুখ আলো আঁধারিতে রহস্যময়। শুধু দুটো উজ্জ্বল চোখ কোনও আকস্মিক এক অজানা ব্যথায় সজল হয়ে ওঠে! চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে!

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এ.ডি.জি শিশির সেনের মুখ। একটু আগেই নিউজ চ্যানেলে দেখা দৃশ্যটা আচমকা মনে পড়ে গেল তার। এ.ডি.জি সেনকে ঘিরে রেখেছে সাংবাদিকের দল। তাদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। বত্রিশ বছর আগের সেই নারকীয়, দানবীয় ঘটনার ওপর থেকে পর্দা তোলার প্রচেষ্টা চালাবে সি.আই.ডি, হোমিসাইড! এবার কেসফাইল যাচ্ছে সি.আই.ডি, হোমিসাইডের 'শ্রেষ্ঠ' অফিসারের হাতে। আজ পর্যন্ত কখনও নাকি ব্যর্থ হননি এই বিশেষ অফিসারটি। 'সর্বনাশিনী' কেসের অভাবনীয়

সাফল্যের পরে এই মুহূর্তে 'টক অফ দ্য টাউন' হয়ে আছেন আইজি, সি.আই.ডি, হোমিসাইড! সুতরাং মিডিয়ার উত্তেজনা যে প্রবল হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

মানুষটা অদ্ভুত অভিমানে দু'চোখ মুছে নিল। কিছুক্ষণের জন্য ধাতব আওয়াজটা থামল। যেন সাময়িক বিরতি দিল। টেলিভিশনের পর্দায় এ.ডি.জি সেনের পাশে ঐ যুবক কে ছিল? স্বয়ং তদন্তকারী অফিসার নিশ্চয়ই। দীর্ঘদেহী, শাণিত মুখের আদল! মসৃণ বাদামি ত্বক উজ্জ্বল আভা ছড়াচ্ছে! যেন স্বয়ং গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উদ্ধত গৌরবে! সুন্দর! বড় অসহ্য রকমের সুন্দর ও শক্তিশালী! এত সৌন্দর্য সহ্য করা যায় না! শিশির সেন যদি যৌবনে এমন চরম পুরুষালি হতেন, তবে...! সে কাঁদতে কাঁদতেই হেসে ফেলল! থ্যাঙ্কস টু শিশির সেন। অবশেষে চরম লোভনীয় শিকার তার সামনে! বত্রিশ বছর পরে আবার একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী! সম্ভবত সবচেয়ে লোভনীয়ও বটে! হতেই হত! দশ নম্বর যে! দশ সংখ্যাটা তার জন্য চিরকালই সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। হ্যাঁ, এর আগের ন'জন এই পুরুষটির নখের যোগ্যও ছিল না।

আগামী অমাবস্যা কবে? লোকটা চোখ কুঁচকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। আর বারো দিন— নয়? তাহলে...!

সে আড়চোখে তাকায় ধুলো পড়া শোকেসের দিকে। বত্রিশ বছর ধরে ঐ শোকেসটা খোলেনি। ন'টা ট্রফি সাজানো আছে এখনও। দশ নম্বর একটু আগেই তার সামনে ছিল। টিভির পর্দায়! এখনও জীবন্ত। দশ নম্বরের জন্য জায়গা ফাঁকা করতে হবে!

ভাবতেই তার মুখে ধূসর বিষণ্ণতা দীঘল ছায়া ফেলল! আইনের চোখে সে শুধুমাত্র একজন অপরাধী! একজন ভয়ঙ্কর খুনী! তার সম্বন্ধে মানুষের কী ধারণা তা একটু আগেই স্বকর্ণে শুনেছে। বারবার রিপোর্টাররা তাকে নানারকম বিশেষণে বিশেষিত করছিল। 'নৃশংস', 'সাইকো কিলার', 'নিষ্ঠুরতম খুনী', 'হৃদয়হীন দানব' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ওদের কে বলে দেবে, এই নৃশংস সাইকো ভালোবাসতে জানত! তার চেয়ে বড় হৃদয় খুব কম লোকেরই ছিল! ওরা কি জানে; খুনী হওয়া বরং অনেক ভালো, কিন্তু দুর্বল হওয়া মহাপাপ? ওরা কেউ জানে না! ওরা কেউ কিচ্ছু জানে না! অথচ কী সহজে বলে দিল 'দানব', 'রক্তপিপাসু রাক্ষস', 'বিকৃতমস্তিষ্ক খুনী', 'নরপশু'!

মানুষটা এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। এক নিঃশব্দ বোবা কান্না তার কণ্ঠনালি বেয়ে উঠে আসছে। সে দু'হাতে মুখ ঢাকে। গোটা শরীর কান্নার দমকে দমকে কেঁপে উঠছে। তবু এক অদ্ভুত জেদে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। মনে পড়ে যায়, বহুযুগ আগের এক তীব্র ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর— "মেয়েদের মতো কাঁদিস কেন! ব্যাটাছেলেদের অমন ছিঁচকাঁদুনে মাগীপনা মানায় না! তুই শালা নির্ঘাৎ হিজড়ে!"

কথাগুলো মনে পড়তেই তার চোয়াল দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। সযত্নে মুছে নেয় অশ্রুসজল চোখ মুখ। না— কান্না নয়! কান্না মানে দুর্বলতা! তাকে নিষ্ঠুর হতে হবে। আরও নিষ্ঠুর! দানবই ভালো। রাক্ষসই ভালো! ধাতব আওয়াজ আরও বাড়ল। টিভিতে তখনও মারপিট করে চলেছে রঙীন টম অ্যান্ড জেরি। তার আলো এসে পিছলে পড়ছে তার হাতের কাছে। তাতেই স্পষ্ট দেখা যায় তার হাতের চকচকে প্রমাণ সাইজের অস্ত্রটা। ডাক্তারি পরিভাষায়— 'সার্জিক্যাল স'! অনেকদিন ধার দেওয়া হয়নি। এখন দিতেই হবে যে! একেবারে দক্ষ হাতে শান দিচ্ছে অস্ত্রটাকে। এতটাই দক্ষ সে, যে হাতের দিকে তাকে তাকাতেও হয় না। চশমা পরারও দরকার নেই। অন্ধকারে অর্জুনের মতোই সে চোখ বুঁজে অস্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে। সার্জিক্যাল স প্রবল শব্দে বেশ কিছু স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দিল। স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। কিন্তু বুকের ভেতর নিরন্তর যে আগুন জ্বলছে, তাকে দেখানো যায় না! তুমি বড় নিষ্ঠুর শিশির! এমন লোভ দেখাতে আছে! যদি তোমায় আমার মনের ভেতরটা দেখাতে পারতাম! আমি তৃষ্ণাতুর! বত্রিশ বছর ধরে আমি তৃষ্ণার্ত! বত্রিশ বছর একবিন্দু সৌন্দর্য পান করিনি! তুমি বুঝবে না। কেউ বুঝবে না! কোনওদিন বোঝেনি!

অস্ত্রে শান দিতে দিতেই টম আর জেরির কীর্তি দেখে হেসে উঠল সে। সজোরে তার হাসি বদ্ধ দেওয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। অপরাধ তখন আরও সুন্দর হয় যখন তা ইঁদুর-বিড়ালের খেলা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে কে শিকার আর কে শিকারী; সেটা বুঝতে আরও বারোদিন লাগবে!

অস্ত্রে শান দিতে দিতেই ফের সশব্দে হাসল লোকটা। গেম... অন! হাসির শব্দ আছে। কিন্তু যন্ত্রণা নিঃশব্দ। কান্না নিঃশব্দ। মৃত্যুরও কোনও শব্দ হয় না। সে চুপিচুপি আসে...!

(২)

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজতে চলল।

আজ সন্ধ্যেবেলায় কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়েছে। এখন আর বৃষ্টি নেই ঠিকই, তবে মাঝে মধ্যেই একটা জোরালো হিমেল হাওয়া ঝাপ্টে এসে পড়ে কনকনে ভাবটাকে আরও প্রবল করে তুলছে। আপাতত আশেপাশে কোনও মানুষজন নেই। শুনশান রাস্তা। মাঝে-মধ্যে একটা দুটো গাড়ি হুশহাশ শব্দ তুলে চলে যাচ্ছে বটে, তবে তাও এত সন্তর্পণে যে নিবিড় নিস্তব্ধতার বুকে তেমন আঁচড় কাটতে পারছে না। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ভিজে পিচের রাস্তা চিকচিকিয়ে ওঠে। যেন মসৃণ দেহের বিরাট এক কালকেউটে! বিশাল শরীরটাকে এলিয়ে পড়ে রয়েছে চুপ করে। সব মিলিয়ে রাত্রি যতটাই শান্ত, ঠিক ততটাই বিপজ্জনক! যে কোনও মুহূর্তে ছোবল মারতে পারে।

– "হে-ই! সে-ক্সি!"

- নির্জন রাস্তায় একা একটি সদ্য যুবতী মেয়ে প্রায় উর্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছিল। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে প্রকট রীতিমতো ভয়ার্ত সে। তার ছায়া রাস্তায় পড়ে দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে। মেয়েটির হাবভাব দেখে মনে হয় বুঝি তাকে কোনও বন্য জন্তু তাড়া করেছে। যেন ছায়াটাকেও কোনওক্রমে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে! পড়িমড়ি করে ছুটছে সে। আর তার পেছনে ধাওয়া করছে একটা বাইক। বাইক আরোহী চিৎকার করে ছুঁড়ে দিল বেশ কয়েকটা শব্দ— "লেটস হ্যাভ সাম ফান বেবস! কা-ম অ-ন!"

অসহায় শিকার একবার নিরুপায়ভাবে এদিক-ওদিক দেখে নেয়। চতুর্দিকে শুধু রাতের শূন্য অন্ধকার রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। একটি মানুষও নেই যার কাছে সে সাহায্য চাইতে পারে। তার রক্ত হিম হয়ে যায়। এই জনহীন রাস্তায় যদি তাকে রেপ করে খুন করেও ফেলে দেয় এই জানোয়ারটা, তাহলেও কিচ্ছু করার নেই।

"সেক্সি লে-ডি, ইউ ড্রাইভ মি ক্রে-জি!" চেঁচিয়ে বলল দুর্বৃত্ত "বড্ড ঠান্ডা লাগছে। একটু গরম করে দাও সোনা!" মেয়েটি দৌড়তে দৌড়তেই হোঁচট খেল! আরেকটু হলেই উলটে পড়ত। কিন্তু সামলে নিয়েছে। তবে রীতিমতো 'হী... হী' করে ভয়ে কাঁপছে। তার

ভয়ার্ত হাবভাব দেখে বাইক আরোহী আরও মজা পেল। সে যেন শিকারী বিড়ালের মতো ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করছে। চিৎকার করে গাইতে শুরু করল; "এ-বি-সি-ডি পড়লি বহোৎ/ ঠন্ডি আঁহে ভরলি বহোৎ/ অচ্ছি বাতেঁ করলি বহোৎ/ অব করুঙ্গা তেরে সাথ...!"

"গ-ন্দি-বা-ত!"

হঠাৎ একটা অচেনা গম্ভীর পুরুষালি স্বর দুর্বৃত্তের গানের পাদপুরণ করে দিল। মেয়েটা ভয়ের চোটে কোথায় যাবে বুঝতে পারছিল না! বাইক আরোহী প্রায় ঘাড়ের ওপরেই এসে পড়েছে। এবং তার উদ্দেশ্য যে আদৌ মহৎ নয় তা গান এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতেই প্রকট! বাইকের সঙ্গে কাঁহাতক দৌড়ে পারা যায়! ভয়ের চোটে হয়তো সে কেঁদে ফেলতেই যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কোথা থেকে যেন একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি এসে বাইকের গতিপথ প্রায় পাহাড়ের মতোই রোধ করে দাঁড়াল। আকাশ থেকে নামল না পাতাল ফুঁড়ে উঠল, ভগবানই জানেন।

তবে বাইক আরোহী ঠিক এই মুহূর্তে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে রীতিমতো ব্যোম্‌কে গিয়ে কোনওমতে ঘ্যাঁস করে ব্রেক কষেছে। বাইকটা কিছুটা স্কিড করে গিয়ে প্রায় আগন্তুকের গা ঘেঁষে থম্‌কে দাঁড়াল। আরেকটু হলেই ঠুকে দিত! অথচ ছায়ামূর্তির কোনও হেলদোল নেই। সে নিজের জায়গা থেকে বিন্দুমাত্রও নড়েনি! দুর্বৃত্ত মনে মনে স্বীকার করল, উল্টোদিকের লোকটার নার্ভের জোর আছে। লম্বা মানুষটি খুব ঠান্ডা অথচ গম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে নেতিবাচকভাবে মাথা নেড়ে শব্দটা আবার বলল; "গ-ন্দি-বা-ত!"

বাইক আরোহী অতিকষ্টে ঘাড় মাথা উঁচিয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করে। লম্বা লোক সে জীবনে হয়তো অনেক দেখেছে। কিন্তু এইরকম চলমান মনুমেন্ট সম্ভবত দেখেনি! আড়চোখে তাকিয়ে দেখল তার শিকার আপাতত মনুমেন্টের চওড়া পিঠের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।

"হু দ্য হেল আর ইউ?" আরোহী ধম্‌কে ওঠে; "কে বে তুই?" ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দীর্ঘ মানুষটির মুখটা অস্পষ্টভাবে হলেও দেখা গেল। মিষ্টি একটা হাসি ঝিলিক দিয়ে

উঠেছে তার মুখে। বাইকের গায়ে ভারী মনোরম ভঙ্গিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘন কণ্ঠস্বরে বলল, "ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম সেক্সি?"

এটা আবার কেমন ভুতুড়ি! একজন বীরপুরুষ রাস্তায় কোমল, নরম সরম মেয়েকে দেখলে, 'সেক্সি' বলতেই পারে। কিন্তু এরকম আইফেল টাওয়ারের মতো পুরুষকে কোনওমতেই 'সেক্সি' উপাধি দেওয়া যায় না! সে রেগেমেগে কিছু কড়া রকমের মন্তব্য করতেই যাচ্ছিল, তার আগেই কে যেন পেছন থেকে তার কাঁধের ওপর ভারী হাত রাখে! ও তড়িৎগতিতে ফিরে তাকিয়ে দেখল, আরও একজন কখন যেন অতর্কিতেই তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মানুষটি প্রথমজনের মতো অত লম্বা, সুগঠিত না হলেও যথেষ্ট বলিষ্ঠ। নীচুস্বরে বলল, "আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন! ইজ হি সেক্সি?"

এ কী জাতীয় উৎপাত! কোথায় এই ঠান্ডার দিনে একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বেচারি উষ্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তা নয় দু'দুটো বুলডোজারের মতো পুরুষ তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তার ওপর আবার কী উদ্ভট প্রশ্ন ! বাইক আরোহীর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। আজকাল সুন্দরী মেয়েদের চোখে হিরো সাজার জন্য অনেকেই এসব ফালতু নাটক করে। কিন্তু যন্ত্র দেখলেই পালায়!

দুর্বৃত্ত হিংস্র হাসল। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎগতিতে হিপ পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে এনেছে। শাণিত ছুরির ফলা সামান্য আলোতেই ঝকঝক করে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে, "এটা দেখেছিস? বেশি হিরোগিরি করলে পুরো অপারেশন করে দেব! ফো-ট্ এখান থেকে!"

বিপন্ন মেয়েটি দীর্ঘদেহী আগন্তুকের পেছন থেকেই প্রায় ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে। ছুরিটার দশাসই ফলা দেখলেই বোঝা যায় সেটা আদৌ খেলার জিনিস নয়! আর যার হাতে সেটা ধরা রয়েছে তার মুখের ক্রুর রেখাগুলো প্রমাণ করে, যা সে বলছে, তা করেও দেখাতে পারে। রীতিমতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি! কিন্তু দীর্ঘদেহী মানুষটির মুখে কোনও ভয়ের ছাপ পড়েনি। বরং পেছন থেকে মেয়েটি চিৎকার করে ওঠায় সে যেন একটু বিরক্ত হল। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ম্যাডাম, আপনি কাইন্ডলি এরকম হরর ফিল্মের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেওয়া বন্ধ করবেন প্লিজ?"

মেয়েটি থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। দীর্ঘকায় আগন্তুক এবার দুষ্কৃতীকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে তাকিয়েছে। তার ভুরু সামান্য কৌতুকে নেচে উঠল, "অর্ণব, ও কি আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে?" দ্বিতীয় ব্যক্তি, তথা অর্ণবের সপ্রতিভ জবাব, "ইয়েস স্যার"।

"শিওর?" -

প্রথম লোকটি, তথা 'স্যার' একবার চোখ কুঁচকে ধারালো ছোরাটার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা একশো বিরাশি সিক্কার মোক্ষম ঘুঁষি অব্যর্থভাবে আছড়ে পড়ল দুর্বৃত্তের চোয়ালে। অত লম্বা মানুষটা যে কখন হাত তুলল, কখন পাঞ্চটা মারল – সঠিকভাবে বোঝাই গেল না! শুধু মনে হল, বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল! বাইক আরোহী বোধহয় বুঝতেও পারেনি যে ব্যাপারটা আদতে ঠিক কী ঘটল! একটা শব্দও উচ্চারণ করার সুযোগ পায়নি সে। কেউ কিছু বোঝার আগেই পুরো কাটা কলাগাছের মতো ধড়াস করে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। হাতের ছুরিটা ধাতব 'খন্ খন্' শব্দ তুলে পড়ল তার পাশেই! ।"

— "লাইটস্ আউট!" স্যার গম্ভীর স্বরে বললেন, " আমি ভয় পেয়েছি" হাফ সেকেন্ড লাগল!" অর্ণব মুচকি হাসল, "দ্যাটস ট্রিমেন্ডাস সেক্সি স্যার!"

স্যার ফিক্ করে হেসে ফেলেছেন, "গুড ওয়ান অর্ণব! দেখো তো, বেঁচে আছে, না টপকে গেল?"

অর্ণব দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে অভ্যস্ত হাতে ধরাশায়ী দুর্বৃত্তকে পরীক্ষা করে, "গ্রীন সিগন্যাল। বেঁচে আছে।"

"মালটাকে লোকাল থানায় ডাম্প করতে হবে। গাড়িতে তোলো।"

"ওকে।" - -

অর্ণব আর কোনও কথা না বাড়িয়ে বেহুঁশ লোকটিকে আনায়াসে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যায়। অকুস্থল থেকে একটু দূরেই তাদের বিরাট গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। অর্ণব লোকটিকে গাড়ির ডিকিতে ঢুকিয়ে দেয়। অর্ণবের 'স্যার' এবার পিছন ফিরে ভিকটিমটির দিকে তাকিয়েছেন। বেচারি তখনও কাঁপছে। একটু আগের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ট্রমা থেকে তখনও বেরোতে

পারেনি। সে হতভাগ্য মেয়ে তখনও ভেবে চলেছে, যদি এই দুটি লোক আচমকা এখানে এসে উদয় না হত, তবে ঠিক কী হত তার সঙ্গে! দুর্বৃত্তের কাছে ছুরি ছিল! সে মনশ্চক্ষে দেখল, শুনশান রাস্তায় তার ছিন্নভিন্ন, অপমানিত, চরম লাঞ্ছিত গলা কাটা লাশটা পড়ে রয়েছে। কাগজে হেডলাইন! মা-বাবার মাথা হেঁট! পাড়া-পড়শীর ফিসফাস, কেচ্ছা...!

"আপনি এখনও এখানে কীসের জন্য ওয়েট করছেন!" মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন স্যার, "ফর অ্যানাদার ইভটিজার অর রেপিস্ট?"

– "আমি... আমি!" মেয়েটি দরদর করে ঘামছে। কোনমতে ঢোঁক গিলে বলল, "আমার বাড়ি এখান থেকে আরও একটু দূরে। আমার স্কুটিটা মাঝপথে খারাপ হয়ে গেছে। কোনও ক্যাবও পাইনি।" তিনি জোরে একটা শ্বাস ফেললেন, "ফাইন, বাড়ির অ্যাড্রেসটা দিন। পৌঁছে দিচ্ছি।"

মেয়েটি একটু বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। আচমকাই সে অদ্ভুত একটা দোলাচলে ভুগতে শুরু করেছে। এখন তার মনের যা অবস্থা, তাতে বোধহয় কাউকেই বিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই লোকদুটি কে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্যে এসেছে; তাই বা কে জানে! যেরকম আকস্মিকভাবে উদয় হল তাতে তো কোনও সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না! হাবভাবও মোটেই সাধারণ নয়। এরা কারা!

লম্বা মানুষটি ভালোভাবে মেয়েটিকে একবার দেখে নিলেন। বাচ্চা মেয়েই বলা যায়। বয়েস টেনেটুনে বাইশ কী তেইশ! হয়তো অনার্স শেষ করে সদ্য চাকরিতে জয়েন করেছে, অথবা এখনও পড়াশোনা করছে। তার বিপন্নতাও চোখ এড়াল না। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "ডোন্ট ওরি। আমরা পুলিস! জাস্ট এখান দিয়েই পাস করছিলাম। ঐ জানোয়ারটা আপনাকে টিজ করছে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম।" অর্ণব ততক্ষণে গুটিগুটি ফিরে এসেছে। স্যার তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। সে তৎক্ষণাৎ নিজের আইডি কার্ড বের করে মেয়েটির নাকের সামনে মেলে ধরল, "সি আই ডি, হোমিসাইড।"

সি আই ডি, হোমিসাইড! এতক্ষণে যেন মেয়েটির প্রাণে বল এল। সে একবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভীরু দৃষ্টিতে রক্ষাকর্তা দু'জনের দিকে তাকায়। লম্বা মানুষটির দিকে তাকাতেই হঠাৎ তার দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এতক্ষণ একটা প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে ছিল

বলে ঠিক মতো লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এই দীর্ঘকায়, অত্যন্ত সুগঠিত চেহারাটা তার একদম অপরিচিত নয়। কিছুদিন ধরেই টিভিতে, কাগজে দেখছে! কিন্তু বাস্তবে মানুষটাকে এই মুহূর্তে আরও বেশি রূপবান, আরও বেশি দেবকান্তি মনে হল তার! কোনমতে বলল, "ওয়েট... আমি আপনাকে চিনি...! টিভিতে দেখেছি!... আপনি...!"

– "থ্যাঙ্কস টু দ্য মিডিয়া!" তিনি ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন, "অধিরাজ ব্যানার্জী, আই জি, হোমি...!" সম্ভবত শেষ শব্দটা 'হোমিসাইডই' ছিল। কিন্তু কথা শেষ করার আগেই মেয়েটি আচমকা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অধিরাজকে! এমনভাবে জাপ্টে ধরল যেন ঐ মানুষটিই তার একমাত্র অবলম্বন! অধিরাজ স্তম্ভিত! অর্ণব আড়চোখে দেখল সে বিস্ময়ের ধাক্কায় কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছে। মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্ত শিশুর মতো বুকে মুখ গুঁজে কান্না মাখা স্বরে পাগলের মতো বলছে, "থ্যাঙ্ক ইউ... থ্যাঙ্ক ইউ... থ্যাঙ্ক ইউ স্যার... থ্যাঙ্ক ইউ ফর সেভিং মি!"

অধিরাজ এই অনভিপ্রেত 'থ্যাঙ্ক ইউ'র ধাক্কা কীভাবে সামলাবে বুঝে উঠতে পারছে না! সবচেয়ে বিপদ হয়েছে হাত দুটোকে নিয়ে। ও দুটোকে কোথায় রাখা যায় তা নিয়ে পুরোপুরি কনফিউজ! সদ্য যৌবনবতীর কোমল পিঠে হাত রাখতে তার প্রবল আপত্তি। সে দু'হাত প্রায় সারেন্ডার করার ভঙ্গিতে তুলে দিয়ে অসহায়ের মতো অর্ণবের দিকে তাকাল, "ওকে অর্ণব, নাও সেভ মি!"

অর্ণব হেসে ফেলল।

(৩)

ফরেনসিক ল্যাব তখন শুনশান। এই মুহূর্তে এখানে কোনও পোস্টমর্টেম হচ্ছে না। কাজের চাপ বেশি হলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও তার দলবল প্রায় সারা রাতই জেগে থাকেন। ল্যাবও সরগরম থাকে। কিন্তু আজ তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এসি একদম শৈত্য প্রবাহের চূড়ান্ত সীমায়। গোটা ঘর চিল্ড হয়ে আছে! কেন, কী জন্য বা কার জন্য; তা ভগবানই জানেন!

সেই নৈঃশব্দের মধ্যেই স্মার্ট ভঙ্গিতে জুতোর শব্দ তুলে ল্যাবে ঢুকে পড়ল অধিরাজ ও অর্ণব। সচরাচর সিরিয়াস কোনও কেস না থাকলে তারা এত রাতে ফরেনসিক ল্যাবে আসে না। কিন্তু ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডঃ চ্যাটার্জী ঘণ্টা দুয়েক আগেই জব্বর হুড়ো দিয়ে তাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ রাতেই তার কোনও বিশেষ দরকারি কথা আছে। কথাটা কী জানতে চাইতেই বুড়ো চটে ব্যোম! ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে বললেন, "আমি কি তোমায় আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করছি যে ফোনেই সব নোম্‌ম্‌... নোম্‌... নোম্‌... করে বলে দেব?"

"ওয়েট, ওয়েট!" অধিরাজ গম্ভীর হয়ে বলে, "আপনি বিয়ে করছেন! কে 'হ্যাঁ' বলল? মিস্ কাটামুন্ড না দীপিকা?"

ফোনে দেখা যায় না। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল ডঃ চ্যাটার্জী অন্তত তিনখানা হাইজাম্প মারলেন, "ব-দ-মা-য়ে-শ ছোঁড়া! আমার সঙ্গে ফাজলামি! লম্বা গলা চারপেয়ে লা-মা! আমি তোমার বাপের বয়েসী!"

"তাও ভালো ঠাকুর্দার বয়েসী বলেননি!" -

উত্তরটা শুনে ভদ্রলোক লম্ফঝম্প থামিয়ে উৎসুক অথচ সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চান, "কেন? তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হত?"

"কারণ আমার ঠাকুর্দা যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়েস প্রায় বিরানব্বই।" অধিরাজের মুখে পেটেন্ট বদমায়েশি হাসিটা ঝলসে ওঠে, "কিন্তু তখনও তাঁর মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ছিল।"

বলাই বাহুল্য এরপর ডঃ চ্যাটার্জী অধিরাজের বাপ ঠাকুর্দা চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত একতরফা বেশ কিছুক্ষণ গালিগালাজ করে ভদ্রলোক একখানা বিরাট শ্বাস টেনে বললেন, "চুলোয় যাও, গোল্লায় যাও, আই ডোন্ট কেয়ার! কিন্তু আজ রাতে আসছ, কি আসছ না?"

অধিরাজ মনে মনে হেসে নিয়ে বলে, "এমন সপ্রেমে বললে অভিসারে তো আসতেই হবে স্যার! সি ইউ ইন ফরেনসিক কুঞ্জ।" ডঃ চ্যাটার্জী ঘ্যাচ করে লাইনটা কেটে দিয়েছিলেন!

সেই জরুরি তলব পেয়েই এত রাতে দুই মূর্তি ল্যাবে এসে হাজির। মাঝপথে ইভটিজিঙের কেস সামলাতে গিয়ে সামান্য দেরি হয়েছে বলে দু'জনেই ভয়ে ছিল, মূর্তিমান দুর্বাসা আজ নির্ঘাৎ শাপশাপান্ত করেই ছাড়বেন! কিন্তু অভিশাপ তো দূর, স্বয়ং ডঃ চ্যাটার্জী কোথায়! চতুর্দিক ভোঁ ভাঁ! অধিরাজ এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু অবাক হয়েই বলল, "এ তো পুরো ফাঁকা মাঠ! বুড়ো গেল কই!"

অর্ণবও চিন্তায় পড়ল। ডঃ চ্যাটার্জী কখনও ল্যাব ছেড়ে কোথাও যান না। আজ তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনার ছাপ পেয়েছিল অর্ণব। সচরাচর অসীম চ্যাটার্জী নিতান্তই নিরুপায় না হলে তাকে ফোন করেন না। জুনিয়রদের, তথা চুনোপুঁটিদের ফোন করা তাঁর স্বভাবই নয়। অথচ সেই তিনিই আজ স্বয়ং ফোন করেছিলেন অর্ণবকে। শুধু দুটো বাক্যই বলেছিলেন; "আজ রাতে রাজার সঙ্গে ল্যাবে চলে এসো। সঙ্গে নিজের প্রয়োজনীয় জামাকাপড়, ব্যাগেজ রেডি রেখো।"

অর্ণব আকাশ থেকে নয়, প্রায় স্যাটেলাইট থেকে পড়েছিল! জামাকাপড় আর ব্যাগেজ কী জন্য লাগবে! ডঃ চ্যাটার্জী কি বেড়াতে নিয়ে যাবেন নাকি! কিন্তু পালটা প্রশ্ন সে খুবই কম করে। উপরন্তু ডঃ চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বলে দিয়েছিল যে কোনও কারণে তিনি স্ট্রেসে আছেন। তাই খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিল ও;

"ওকে স্যার।"

অথচ সবাইকে ঠেলেঠুলে, গুঁতিয়ে গাঁতিয়ে এখন ভদ্রলোক নিজেই হাওয়া! হল কী!

“এটা বুড়োর কোনওরকম প্র্যাঙ্ক নয়তো!” অধিরাজ একটু সন্দিগ্ধ চিত্তে বলে, “কে জানে, মিস্ নরমুন্ড তো আবার প্র্যাঙ্ক করতে ওস্তাদ। বুড়ো হয়তো স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিচ্ছে আমাদের জব্দ করার জন্য! বিশ্বাস নেই।” -

অর্ণব কিছু একটা উত্তর দিতেই যাচ্ছিল। তার আগেই চোখে পড়ল, ডঃ চ্যাটার্জীর পার্সোনাল ফরেনসিক লাইব্রেরীর দিকে। লাইব্রেরীতে একটা হালকা আলো জ্বলছে। কিন্তু সেই সামান্য আলোতেও এক চিলতে সাদা ল্যাবকোটের নড়াচড়া স্পষ্ট দেখা গেল। সে চোখের ইশারায় অধিরাজের দৃষ্টি সেদিকেই আকর্ষণ করে।

“বোঝো! উনি ওখানে ঘাপ্টি মেরে বসে আছেন, আর আমরা খুঁজে মরছি!” অধিরাজ লাইব্রেরীর দিকে পা বাড়ায়, “চলো।” দু’জনেই আর কোনও কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সেদিকেই। লাইব্রেরীর দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল সম্পূর্ণ দৃশ্যটা। যদিও ডঃ চ্যাটার্জী লাইব্রেরীতে খুব কম পাওয়ারের একটা লাইট লাগিয়ে রেখেছেন! প্রায় টর্চ মেরে দেখতে হয় যে আলোটা জ্বলছে কি না! এত কম লাইটে সঠিক কেস ফাইলগুলো কী করে খুঁজে পান ভদ্রলোক তা উনিই বলতে পারবেন। এই স্তিমিত কমজোরি আলোয় ওনাকেই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না! ল্যাবকোট, আর মাথার মাঙ্কিক্যাপটুকুই শুধু যা বোঝা যায়। তবে এই মুহূর্তে কম আলোর চেয়েও অন্য আরেকটি বড় সমস্যায় আছেন তিনি! দশাসই শোকেসের সামনে একটা ছোট্ট মইয়ে চড়ে পেছন ফিরে বসে আছেন ভদ্রলোক। ছোটখাটো চেহারার মানুষ হওয়ার দরুণ একটি ফাইলের দিকে গোড়ালি উঁচু করে বারবার হাত বাড়াচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই হাতে পাচ্ছেন না! মইটা বিপজ্জনকভাবে একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে নড়বড় করছে। দেখলেই ভয় হয়, এখনই উলটে পড়বে।

অধিরাজ এগিয়ে গিয়ে কথা নেই, বার্তা নেই ভদ্রলোকের কোমর ধরে অবলীলায় টুক করে তুলে ধরল। ঘটনাটার আকস্মিকতায় কেঁপে উঠলেন তিনি। কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, “ভয় পাবেন না ডক্! আপনি এখন সেফলি এভারেস্টের মাথায় চড়েছেন।”

ডঃ চ্যাটার্জী কোনও কথা না বলে আঙুল তুলে সামান্য ডানদিকের ফাইলটা নির্দেশ করলেন।

“রাইট ওয়ান?” -

মাথা ঝাঁকালেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। অধিরাজ ভারী সাবলীলভাবে তাকে ডানদিকে লিফট করল। একটু বিস্মিত হয়েই বলল, "আপনি এত হালকা ডক্! দেখে তো মনে হয় না!"

"কী মনে হয় না পণ্ডিতপ্রবর!" ডঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণে পেছন না ফিরেই গরগর করে উত্তর দেন! -

"আপনার কোমর তো হাতে ধরে বেশ কোমরের মতোই মনে হচ্ছে!" অধিরাজ নিরীহভাবেই বলে, "দেখে তো রেলের কামরা মনে হয়! এমন জিরো সাইজ কোমর রাতারাতি আমদানি করলেন কোথা থেকে?" ডঃ চ্যাটার্জী পুরো খ্যাঁকখ্যাঁক করে ওঠেন, "এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই দেব। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।" -

"প্লিজ প্রসিড!"

– "এটা কি তোমার পার্সোনাল জিম পেয়েছ?" ভদ্রলোক পুরোপুরি 'চটিতং' হয়ে বললেন, "ওটা ডাম্বেল নয়, একজন ফিমেল! আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়ে তুমি মাঝরাতে অমন লোফালুফি শুরু করেছ কেন?" — "হো-য়া-ট!"

আরেকটু হলেই অধিরাজের হাত কেঁপে যাচ্ছিল। তার আগেই হাঁইহাঁই করে উঠলেন ডঃ চ্যাটার্জী, "এই...! ফেলবে না! একদম ফেলবে না! অত ওপর থেকে যদি পড়ে তবে ঠ্যাং ভাঙা অবধারিত! আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের পা ভাঙলে আমি গোটা ফরেনসিক ল্যাবটাই তোমার মাথায় ভাঙব! দয়া করে শুধু ঘাড়টা ঘোরাও।"

ততক্ষণে অবশ্য উপস্থিত দুই মূর্তিই বজ্রাহতের মতন পেছন দিকে তাকিয়েছে। লাইব্রেরীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে যে লোকটা মোষের মতো রেগে গিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে, কোনও সন্দেহই নেই তিনিই ডঃ চ্যাটার্জী! তার মানে যে মানুষটিকে অধিরাজ ধরে আছে তিনি...! "মিস্ মুখার্জী!"

অধিরাজ ও অর্ণব প্রায় একসঙ্গেই সবিস্ময়ে বলে ওঠে! অধিরাজের বাহুবেষ্টিত ল্যাবকোটধারী এবার মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। নিঃসন্দেহে ডঃ চ্যাটার্জীর মাঙ্কিক্যাপের ভেতরে মিস্ আহেলি মুখার্জীই! মৃদু হেসে রিনরিনে স্বরে বলল, "ফাইল পেয়ে গিয়েছি। এবার প্লিজ, আমায় নামিয়ে দিন অফিসার!"

অধিরাজ প্রায় সিঁটিয়ে ল্যাম্পপোস্ট হয়েই গিয়েছিল। আহেলিকে এমন ভয়ে ভয়ে নামাল যেন কয়েক কোটি টাকার অ্যান্টিক শোপিস নামিয়ে রাখছে! বেচারির পুরো আক্কেল গুড়ুম! তার ওপর এবার ডঃ চ্যাটার্জী ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে পুরো বুলডগের মতো দাঁত কিড়মিড় করতে শুরু করেছেন, "তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ! না কয়েক পেগ চড়িয়ে এসেছ! আহেলি মোটেই আমার জুড়ুয়া বোন বা ক্লোন নয়। দু'জনের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ!"

"কিন্তু বুঝব কী করে?" বেচারি আমতা আমতা করে জানায়, "এই আধখানা আলো, আর আধখানা অন্ধকারে ল্যাবকোট আর মাঙ্কিক্যাপ দেখে কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম!" -

- "কনফিউজ মানে!" ভদ্রলোকের ভ্রূকুটি আরও ভয়াল হল, "ল্যাবকোট ছাড়া আরেকটি জিনিস সবসময়ই তোমার চোখে পড়ে। এক ও অদ্বিতীয় আমার টাক! আর এখানে এতবড় টিকিটা নজরে পড়ল না!" কথাটা বলেই একটান মেরে আহেলির ল্যাবকোটের ভেতর থেকে তার লম্বা বিনুনিটা বের করে আনলেন তিনি। এত জোরে টান মেরেছেন যে বেচারি আহেলি কুঁইকুই করে উঠল। সেদিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করে বলেন ডঃ চ্যাটার্জী, "আমার টাক তো তুমি একবারও মিস করো না! এই কয়েকহাত লম্বা টিকি দেখতে পেলে না! নাকি ভাবলে আমি জিরো সাইজের কোমরের সঙ্গে সঙ্গে ডাবর আমলা মেখে রাতারাতি বিশাল চুলও আমদানি করেছি? কোন্ আক্কেলে এই মহিলাকে পটাং করে কোলে তুলে নিলে!"

ঐ স্বল্প আলোয়ও স্পষ্ট বোঝা গেল আহেলির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছে। অর্ণব নীরব অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তাকে। ঐ লজ্জারুণ মুখে কি শুধুই বিড়ম্বনার আভাস? না অনেকখানি ভালো লাগাও জুড়ে আছে? অন্যদিকে অধিরাজ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত! তার স্বাভাবিক সপ্রতিভ ভাব সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। সে অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে। যদিও বেচারির দোষ নেই। আহেলির বিনুনিটা আধখানা মাঙ্কিক্যাপে আর বাকি আধখানা ল্যাবকোটের ভেতরেই ঢেকে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মাথায় কী আছে, টাক না টিকি তা বোঝা দুষ্কর! কিন্তু সে কথা ডঃ চ্যাটার্জীকে কে বোঝাবে!

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবার আহেলির দিকে ফিরলেন, "আর তুমিই বা কথা নেই বার্তা নেই আমার মাঙ্কিক্যাপটা পরে বসে আছ কেন? লম্বুকে কনফিউজ করার জন্য?"

"সরি!" আহেলি বেচারি মিউমিউ করে জানায়, "আসলে এসিতে খুব ঠান্ডা লাগছিল...।" -

"তাহলে বাড়ি থেকে সোয়েটার, চাদর, শাল, লেপ, কাঁথা, কম্বল বয়ে আনবে!" রাম ধমক দিলেন তিনি, "কিন্তু আমার মাঙ্কিক্যাপে ফের কখনও হাত দেবে না খবরদার! এটা এক্সক্লুসিভলি আমার!" -

ধমক খেয়ে আহেলি অবিকল মীনা কুমারীর মতো অশ্রু ছলছলে করুণ মুখ করে ফেলেছে। অধিরাজও কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ডঃ চ্যাটার্জী বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন দু'জনেরই মুখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত দু'জনকেই জরিপ করে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "বাই দ্য ওয়ে রাজা, আহেলির ওয়েট কত?"

অধিরাজের চোখে সামান্য বিস্ময় উঁকি দিয়ে ফের মিলিয়ে গেল, "ফিফটি টু কেজি, আই প্রিজ্যুম স্যার!"

"আন্ডার ওয়েট?" -

"হ্যাঁ।"

– "তার মানে ওর আরও চাইনিজ খাওয়া দরকার।" ডঃ চ্যাটার্জীর ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি যেন ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, "বাই দ্য ওয়ে। তোমাদের চাইনিজ ডিনার ডেট কেমন হল বলোনি তো?"

এই রে! সর্বনাশের সাড়ে বত্রিশ ভাজা ! অর্ণব অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আহেলির দিকে তাকায়। সে এখন বিষণ্ন মীনা কুমারীর জায়গায় হিংস্র ললিতা পাওয়ারের মতো কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। অর্ণব মনে মনে জিভ কাটে! সেরেছে! মিস মুখার্জী পালটা শোধ না তুলে ছাড়বেন না!

– "ডিনার আর হল কই!" এইবার আহেলি ফ্যাঁস করে প্রায় 'খামচা মারেঙ্গা' মূর্তি ধরেছে, "চায়না টাউনে হাক্কা নুডলস দেখেই অফিসার ব্যানার্জীর মনে পড়ে গেল যে অফিসার সরকার নুডলস খেতে ভালোবাসেন। অমনিই দৌড়লেন ওনার জন্য চাইনিজ

ডিশ প্যাক করাতে। আমায় চেয়ারে বসিয়ে নিজের ক্রেডিট কার্ডটি ধরিয়ে দিয়ে মিষ্টি করে বললেন, 'মিস মুখার্জী, এই রইল আমার কার্ড, আর সমস্ত ডিটেলস! আপনার যা খুশি খেয়ে নিন। আমি অর্ণবকে এই প্যাকেটগুলো দিয়ে আসি। ও চাইনিজ খেতে খুব ভালোবাসে!' এবং তারপর যতক্ষণ না প্যাকেট রেডি হয়ে এল, উনি অফিসার সরকারের চাইনিজ ফুড প্রীতি নিয়ে ঝাড়া লেকচার দিয়ে গেলেন। আর যেই বয় গরমাগরম প্যাকেট নিয়ে এল, অমনি সবগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে ধাঁ!"

"মা-নে!" ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ দুটো চড়াৎ করে তাঁর টাকে উঠে গেছে, "তুমি একা একাই খেলে? রাজা ডিনার করেনি?"

আহেলি তীব্র দৃষ্টিতে অধিরাজকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ব্যঙ্গ বঙ্কিম ভঙ্গিতে বলল, "আজ্ঞে উনিও ডিনার করেছেন। চাইনিজই খেয়েছেন। তবে আমার সঙ্গে নয়, অফিসার সরকারের সঙ্গে, ওনার বাড়িতে!" - – "হোয়াট!" ডঃ চ্যাটার্জী অর্ণবের দিকে তাকান, "অর্ণব! আহেলি সত্যি কথা বলছে?"

অধিরাজের পর এবার গরুচোরের ভূমিকায় অর্ণব! সে ভয়ে ভয়ে মাথা, নাড়ে, "আজ্ঞে!"

- "রা-জা!" গর্জন করে উঠলেন তিনি, "ইউ আর সিম্পলি ইম্পসিবল! একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ডিনার ডেটে গিয়ে তোমার শেষে অর্ণবের কথা মনে পড়ল! বু-ল, শি-ট!"

অধিরাজ চোরের মতো আড়চোখে একঝলক ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "ইয়ে, মানে, আমি..."

"তুমি আহেলিকে ওখানেই একা রেখে চলে গেলে! ও বাড়ি ফিরত কী করে ?" -

সে একটু আমতা আমতা করে, "না, মানে গাড়ি আর ড্রাইভারকেও ওখানেই রেখে গিয়েছিলাম যে! ড্রাইভারকেও বলা ছিল যাতে ও মিস মুখার্জীকে বাড়িতে ড্রপ করে দেয়। আমি তো...।"

"তুমি একটি অপদার্থ!" ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মুখ এবার অবিকল অ্যাংরি বার্ডের 'রেড'-এর মতো লাগছে, "তোমার কিস্যু হওয়ার নয়! এডিজি শিশির সেন ডাকলে তুমি সব ছেড়েছুড়ে বিরহিনী রাধার মতো ওঁর অফিসে দৌড়াও! আহেলির সঙ্গে ডিনার ডেটে

গিয়ে তুমি চাইনিজ হাতে অর্ণবের বাড়ি দৌড়াও! তোমার সব দৌড় এডিজি সেন আর অর্ণব অবধি গিয়েই থামে কেন? প্রবলেমটা কী? মেয়েদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে না?" অধিরাজ কিছু বলতে যাওয়ার আগেই আহেলি সরু চোখ করে শাণিত কণ্ঠে বলে উঠল, "মোটেই না স্যার, খুব ভালো লাগে! বিশেষ করে ভার্মিলিয়ন রেড কালারের লিপস্টিকওয়ালা মেয়েদের!"

"তোমায় আবার কে বলল পঞ্চুরাণী তর্কচুঞ্চী?" ডঃ চ্যাটার্জী বিরক্তস্বরে বললেন, "আর ভার্মিলিয়ন রেডই বা টপকে পড়ল কোথা থেকে!" -

"টপকে পড়েনি। ওনার শার্টেই লেগে আছে! ভার্মিলিয়ন রেড কালারের লিপস্টিক।"

কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই আহেলি প্রায় অর্ণবকে এক গোঁত্তা মেরে হনহন করে চলে গেল। অর্ণব পুরো স্তম্ভিত। কী চোখ মহিলার! এই কম আলোর মধ্যেই

ভার্মিলিয়ন রেড কালারের লিপস্টিক ঠিক শনাক্ত করেছে! সে মনে মনে স্বীকার করল, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর! আহেলির হবে। ডঃ চ্যাটার্জী টাক চাপড়ালেন, "ওঃ, আই উইদড্র! পঞ্চুরাণী তর্কচুঞ্চী নয়, শি ইজ পঞ্চুরাণী অপেরা!" তারপরই থেমে কৌতূহলী স্বরে যোগ করলেন, "কিন্তু ভার্মিলিয়ন রেডের কেসটা কী?"

"বিশেষ কিছুই না! একটি মেয়ে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছিল।" অধিরাজ একটু অপ্রস্তুত হয়েই জানায়, "তখনই হয়তো লেগে গেছে।" -

— "মা-নে!" তিনি আরও বিস্মিত, "তুমি কি জগন্নাথ মন্দিরের বটগাছ যে মনস্কামনা পূর্ণ হলেই মহিলারা তোমার গায়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মুখ ঘসবে।" অধিরাজ অসহায় দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়। অর্ণব বুঝতে পারল এখান থেকে তাকেই কেস 'টেক ওভার' করতে হবে। সে গোটা ব্যাপারটাই আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে বলে। ইভটিজিং থেকে শুরু করে 'থ্যাঙ্কস' পর্ব অবধি সবটাই। গোটা বৃত্তান্ত শুনে ডঃ চ্যাটার্জীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলেন, "হুঁ! ইভটিজিং, রেপ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট; সবই যেন ক্রমাগত বাড়ছে এই শহরে।"

অধিরাজ মন্তব্য না করে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়। অর্থাৎ, সে সম্পূর্ণ সহমত। তিনি একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, "তোমার এবারের কেসটাও কাইন্ড অফ রেপ কেস।

আই মিন, রেপ-মার্ডার কেসই।”

এবার দুই অফিসারই বিস্মিত! কারণ যতটুকু তারা প্রেস কনফারেন্সে শুনেছে, তাতে কেসটা মাস-মার্ডারেরই বলে মনে হয়েছিল। এবং যারা খুন হয়েছিলেন, তারা সকলেই পুরুষ! তাহলে এর মধ্যে রেপকেস এল কোথা থেকে! “কিন্তু ওটা তো মাস মার্ডার কেস! আর ভিকটিমরা মেল! তবে...!”

অধিরাজ কিছু বলার আগেই তাকে হাত নাড়িয়ে থামালেন ডঃ চ্যাটার্জী, ‘রেপের আবার মেল ফিমেল কী! রেপ ইজ রেপ! অ্যান্ড ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন, মেয়েদের মতো ছেলেরাও রেপ কেসের শিকার হয়। দুঃখের বিষয় সেগুলো হাইলাইটেড হয় না! মেয়েদের রেপ যতখানি আম জনতার কাছে বেদনাদায়ক, ছেলেদেরটা ততই হাস্যকর। কারণ সাধারণ মানুষ মানতেই চায় না যে পুরুষেরাও সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের শিকার হতে পারে! তাই হয়তো তুমিও এটা রেপ কেস শুনে আকাশ থেকে পড়ছ, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ! ইটস আ কেস অব মাস রেপ-মার্ডার!”

– “কিউরিঅ-সার অ্যান্ড কিউরিঅ-সার!” অধিরাজের ডানদিকের ভুরুটা বিস্ময়ে সামান্য উঠে গিয়েছে, “কিন্তু সে কথা এডিজি সেন বললেন না কেন? উনি তো এবার আমায় কেস ফাইলও দেননি! প্রেস কনফারেন্সের পর থেকেই হাওয়া হয়ে গেলেন! ফোনেও পাচ্ছি না!”

– “আপাতত পাবে না।” ডঃ চ্যাটার্জী নিজের কেবিনের দিকে পা বাড়ালেন, “এসো, কেস ফাইল দেওয়ার দায়িত্ব এবার আমার ঘাড়েই পড়েছে।”

“আপনি!” প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় অধিরাজ কী বলবে বুঝে পায় না,“কিন্তু এডিজি সেন...!” -

“এডিজি সেনই চার ঘণ্টা আগে পার্সোনালি আমায় কেস ফাইল দিয়ে গিয়েছেন। অফিশিয়ালি, ওনারই এটা দেওয়ার কথা। কিন্তু...।” ডঃ চ্যাটার্জী একটু সময় নিলেন। অধিরাজ এবং অর্ণব দু'জনেই নীরব । তারা উদগ্র কৌতূহলে পরের বাক্যটার অপেক্ষা করছে।

"এই বিশেষ কেসটায় বত্রিশ বছর আগে শেষ যে ভিকটিম মারা গিয়েছিলেন, তিনি এডিজি শিশির সেনের তৎকালীন বস ছিলেন।" তিনি আস্তে আস্তে জানান, "যেমন আজকে তোমার অর্ণব, তেমন বত্রিশ বছর আগে অফিসার রথীন দাশগুপ্ত'র বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন শিশির সেন। এডিজি শিশির সেনই শেষপর্যন্ত কেস ক্লোজ করেছিলেন; কিন্তু অফিসার দাশগুপ্তকে বাঁচাতে পারেননি! অত্যন্ত প্রিয় 'স্যার'এর ছিন্নভিন্ন-রক্তাক্ত লাশটা আজও তাঁকে হন্ট করে। সেজন্যই এই কেসটা তাঁর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আরও একটা কারণ অবশ্য আছে, যার জন্য শিশির সেন তোমায় এই কেস ফাইল দেননি! এই কেসটা বোধহয় রি-ওপেন না হলেই ভালো হত...!" অধিরাজ চুপ করে ডঃ চ্যাটার্জীর জন্য অপেক্ষা করছে। সে জানে, কারণটা তিনিই বলে দেবেন।

ডঃ চ্যাটার্জী নিজের চেয়ারে বসে পড়ে এক চুমুক জল খেলেন। তাঁর বুক ভেঙে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকান, "এই কেসটায় যত লোককে তুমি ইন্টারোগেট করবে, তার মধ্যে এডিজি সেনও রয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর ভূমিকাও বত্রিশ বছর পরে কেস রি-ওপেনড হওয়ায় এবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।"

উপস্থিত দুই অফিসারের মাথায় এবার সত্যিই গোটা হিমালয়টাই ভেঙে পড়ে! সাসপেক্ট লিস্টে এডিজি শিশির সেন স্বয়ং!

পরম ও চরম ধর্মসঙ্কট!

(৪)

বত্রিশ বছরও আগে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, এক কথায় বর্ণনা করতে গেলে নজিরবিহীন! এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পুলিশ-প্রসাশন। সমস্ত ক্রাইমের ক্ষেত্রেই কোনও না কোনওভাবে দুর্ঘটনার অশনি সঙ্কেত পাওয়া যায়। অন্তত প্রবল দাবানলের আগে অপরাধের সম্ভাবনা স্ফুলিঙ্গ আকারে দেখা দেয়ই।

কিন্তু এই ক্রাইমের শুরুতেই যা ঘটল তাই গোটা শহরের রক্ত হিম করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমনকী ঘটনা ঘটার আগে কোনওরকম ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি! সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ, যে মাস-মার্ডারকে মূল ক্রাইম ভাবা হচ্ছিল, আদতে তা সূত্রপাত মাত্র! মূল ঘটনাপ্রবাহ আসলে আরও বিধ্বংসী অপরাধের দিকে যাচ্ছিল, যা শুধুমাত্র প্রশাসন কেন, স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব ছিল না! বত্রিশ বছর আগের এই কেস গোটা কলকাতার নগরজীবনকে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ছেড়েছিল। আর এটাই বোধহয় একমাত্র কেস, যেখানে সি আই ডি'কেও বাধ্য হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল! বাঘা বাঘা অফিসাররাও এই বিশেষ কেস ফাইলটিকে দেখলেই ভয় পেতেন।

তখন শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই পথঘাট শুনশান। বত্রিশ বছর আগে কলকাতা পার্টি, নাইটক্লাব বা ডিস্কো-ঠেক নিয়ে এতখানি সরগরম ছিল না। সোশ্যাল মিডিয়া তো দূর, ইন্টারনেটের দৌরাত্ম্যও শুরু হয়নি। অন্তত মধ্যবিত্তদের মধ্যে তথাকথিত 'পার্টি অ্যানিমল' হয়ে রাত জাগার প্রবণতা কমই ছিল। তাই প্রবল শীতে কুয়াশা মাখা শহর নিশ্চিন্তেই গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল। কেউ ভাবতেই পারেনি, এই কুয়াশাবৃত অন্ধকারে কোনও অপরাধ সংঘটিত হতে পারে বা হতে চলেছে!

কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল, তা অভাবনীয়! ১৯৮৬ সালের, বাংলা মতে ত্রিশে ডিসেম্বরের রাত্রিটা সম্ভবত কোনওদিন ভুলতে পারবে না কলকাতা! ঠিক রাত একটা থেকে ভোর চারটে অবধি; মাত্র এই তিনঘণ্টার মধ্যেই শহরের পাঁচটি বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের সামনে পাঁচজন পুরুষের লাশ ডাম্প করা হল। বত্রিশ বছর আগে পুলিশ স্টেশনের সামনে সিসিটিভির সুবন্দোবস্ত ছিল না। ফলস্বরূপ কে লাশগুলো ফেলে দিয়ে গেল— তা বোঝা

অসম্ভব! কিন্তু লাশগুলো দেখার পর পুলিশ অফিসারদেরই রক্ত হিম হয়ে যায়। পাঁচটি লাশই বীভৎসভাবে ছিন্নভিন্ন! যেন কোনও হিংস্র বন্য জন্তুর তীক্ষ্ণ নখ তাদের ছিঁড়েখুঁড়ে ফালাফালা করেছে! উপরন্তু প্রত্যেকটি লাশই মুণ্ডহীন! খুনী অত্যন্ত নিপুণ হাতে কেটে নিয়েছে তাদের মাথা! তার বদলে বসিয়ে দিয়েছে একটি করে মাটির হাঁড়ি। তার ওপরে রক্ত দিয়েই লেখা, 'গেস হু?'

এই জাতীয় বীভৎস রসিকতায় স্তম্ভিত কলকাতা! পুলিশ হতবাক হলেও আপ্রাণ খুঁজতে লাগল খুনীকে। মৃত ব্যক্তিদের পরিচয় জানার জন্যও উঠে পড়ে লাগল। তখন অজ্ঞাত লাশের পরিচিতি খুঁজে বের করা অত সহজ ছিল না। তার ওপর আবার লাশের মাথাই নেই! তা সত্ত্বেও ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হাল ছাড়লেন না। গোটা শহরের মিসিং পার্সনস রেকর্ড থেকে একে একে খুঁজে বের করলেন হতভাগ্য পাঁচ ব্যক্তির পরিচয়। কিন্তু ভিকটিমদের পরিচয় প্রকাশ পেতেই ফের বড়সড় ধাক্কা! মৃত পাঁচজনের মধ্যে কোনওরকম যোগসূত্রই নেই! তাদের মধ্যে কেউ রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার, কেউ ডাক্তার, কেউ পাড়ার নামকরা গুন্ডা, কেউ উদীয়মান কুস্তিগীর আবার কেউ বা কোনও বারের বাউন্সার! পেশাগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনও মিলই নেই! কেউ কাউকে চিনতেন বলেও জানা গেল না! ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের মনে হল হয়তো কেসটা 'র‍্যান্ডম কিলিঙের। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর নৃশংস খুনী! ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা যখন তার কিলিং মেথড সামনে আনলেন তখন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারও হতবাক হয়ে গেলেন! বিশেষজ্ঞরা জানালেন, খুনী ভিকটিমদের মাথা কেটে আদৌ খুন করেনি। বরং প্রথমে এক এক করে সুনিপুণ হাতে শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্টারিগুলোকে কেটেছে। ব্রঙ্কিয়াল, ইসোফেগাল, পেরিকার্ডিয়াল, ইন্টারকোস্টাল থেকে শুরু করে অ্যাবডোমেন আর্টারিজ, অক্সিয়াল, ব্রাকিয়াল, রেডিয়াল এমনকি লেগ আর্টারিগুলোও কাটা! অ্যাওর্টা, অ্যাবডমিন্যাল অ্যাওটাও জখম! অর্থাৎ মানুষগুলোর মৃত্যু প্রবল রক্তপাতে হয়েছে। এখানেই শেষ নয়! যখন ভিকটিমরা রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুমুখী, সেই অবস্থাতেই তাদের সঙ্গে পেরিমর্টেম আনন্যাচারাল সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ঘটেছে! মানে, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলোকে একরকম রেপই করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ অ্যাবনর্মাল। এবং মৃত্যুর পরই তাদের মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা জানালেন, অত্যন্ত ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে পরিষ্কারভাবে মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে। অস্ত্রটা 'সার্জিক্যাল স' হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা !

ইনভেস্টিগেটিং অফিসার কী বলবেন বা কী করবেন বুঝে পেলেন না। তিনি আপ্রাণ সমস্ত স্পটে গিয়ে তন্ন তন্ন করে ক্লু খুঁজলেন। কিন্তু খুনীর সম্বন্ধে কোনও ক্লু নেই ! কেউ বা কারা রাত দুপুরে পাঁচ পাঁচটা থানার সামনে পাঁচখানা বড়ি ফেলে এল, অথচ কেউ তাকে বা তাদের দেখেনি! এমনকি ধড়গুলোর মাথা কোথায় গেল তারও কোনও কূলকিনারা করতে পারল না পুলিশ !

তদন্ত কোন পথে এগোবে, কীভাবে এগোবে তা হয়তো তখনও বুঝে উঠতে পারেননি উক্ত ইনভেস্টিগেটিং অফিসারটি। কিন্তু আরও কিছু বোঝা, বা শোনার আগেই ফের জোরদার ধাক্কা খেল পুলিশি তদন্ত! ১৯৮৭ সালের আঠাশে জানুয়ারি, রাত বারোটার সময়ে আরেক পুলিশ স্টেশনের সামনে আবার একটি মুণ্ডহীন লাশ পড়ল! 'মোডাস অপারেন্ডি' একই! সেই একই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ, মস্তকহীন কবন্ধের ওপরে একটি মাটির হাঁড়ি- 'গেস হু?' লেখা, যথারীতি সমস্ত আর্টারি কেটে খুন করা হয়েছে তাকেও, রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু, মৃত্যুর আগে পেরিমর্টেম সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, 'সার্জিক্যাল স' এর ব্যবহার; সব হুবহু এক! কিন্তু সেই লাশের শনাক্তকরণ হতেই আঁতকে উঠল পুলিশ প্রশাসন! এবারের ভিকটিম আর কেউ নয়— ইনভেস্টিগেটিং অফিসারটি স্বয়ং!

এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, বিভীষিকাময় ও রক্তাক্ত। প্রথম ইনভেস্টিগেটিং অফিসার খুন হয়ে যেতেই পুলিশ আর কোনওরকম রিস্ক না নিয়ে কেসটা সি আই ডি'কে ট্রান্সফার করল। সি আই ডি'র তৎকালীন সেরা গোয়েন্দা এবার মাঠে নামলেন। কিন্তু হত্যালীলা থামল না! বরং সাতাশে ফেব্রুয়ারি রাত দেড়টায় পাওয়া গেল সেই হতভাগ্য সি আই ডি অফিসারের দেহ! যথারীতি একইভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁকেও। লাশে মাথার জায়গায় 'গেস হু' লেখা হাঁড়ি চাপানো। ফরেনসিক বিশারদ যেন তোতাপাখির মতো গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে গেলেন সেই একই শব্দগুলো, "আর্টারি কেটে খুন, রক্তক্ষরণে মৃত্যু, পেরিমর্টেম সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, সার্জিক্যাল স!"

সি আই ডি কিন্তু সহজে হাল ছাড়ল না। দ্বিতীয় ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এলেন। চার্জ বুঝে নিলেন। কিন্তু আরও কিছু বোঝার আগেই তিনিও খুন হলেন! আঠাশে মার্চ রাত্রি পৌনে তিনটেতে তাঁরও মুণ্ডহীন লাশ পাওয়া গেল। বলাইবাহুল্য, পদ্ধতি একই! ফের পুনরোচ্চারিত হল শব্দগুলো; "গেস হু? আর্টারি কেটে খুন, রক্তক্ষরণে মৃত্যু, পেরিমর্টেম সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, সার্জিক্যাল স!"

- এবার 'সার্জিক্যাল স-'এর ভয়ে কাঁপতে শুরু করল গোটা কলকাতা! বিভিন্ন ভাষার সংবাদপত্রে একটাই হেডলাইন – " 'গেস হু?' হত্যাকাণ্ডের পেছনে কে?" যতক্ষণ কেসটা র‍্যান্ডম কিলিঙের পর্যায়ে ছিল, ততক্ষণ ভয়ের রূপ একরকম ছিল। কিন্তু যখন স্বয়ং শহরের রক্ষাকর্তা, বাঘা বাঘা ইনভেস্টিগেটিং অফিসাররাই বিপন্ন, তখন নগরবাসীরা কার ভরসায় থাকবে! আতঙ্কে, ত্রাসে মানুষেরা সন্ধ্যা নেমে এলেই পড়িমড়ি করে বাড়ি ফিরে আসতে শুরু করল। এবং অন্ধকার নেমে আসতে না আসতেই এই 'সার্জিক্যাল স' কিলারের তান্ডবের ভয়ে কলকাতার জনজীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো থমকে গেল। অন্যদিকে বিপন্ন গোয়েন্দা বিভাগও! তাদের মাথায়ও তখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছে; 'গেস হু?' অর্থাৎ এরপর কার পালা! কার কাছে যাবে এই অভিশপ্ত কেস ফাইল!

গোয়েন্দা বিভাগ এবার পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। কারণ সি আই ডি'র দু- দু'জন অফিসারের মর্মান্তিক মৃত্যুর আঘাত সবাইকেই স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল। কিছুদিনের জন্য এই কেস ফাইলকে ধামাচাপা দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু সংবাদপত্র ও জনসাধারণের প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল সি আই ডি'কে। তৎকালীন এডিজি'র কাছে মিডিয়া কিংবা জনসাধারণের জন্য কোনও উত্তর ছিল না। কী-ই বা বলতেন তিনি? এই সেটি যে তার অফিসারদের কাছে চরমতম দুঃস্বপ্নের থেকেও ভয়ঙ্কর তা স্বীকার করতে পারতেন না। তিনি নিজেই যে ট্রমাটাইজড, তাও বলা যেত না! একের পর এক সন্তানসম ইনভেস্টিগেটিং অফিসারদের অসহায় মৃত্যু তাঁর পক্ষেও সহ্য করা অসম্ভব ছিল! তার ওপর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বারবার রিপোর্টে লিখছিলেন যে এমন দানবীয় ও 'ব্রুটাল' মার্ডার তাঁরা নিজেদের কেরিয়ারে আর কখনও দেখেননি। স্বয়ং সি আই ডি'র শ্রেষ্ঠ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তৎকালীন এডিজিকে ব্যক্তিগতভাবে জানান;

"স্যার, এ সাধারণ খুনী নয়! এ জলজ্যান্ত উন্মাদ ও বিকৃত মস্তিষ্ক রাক্ষস! বকরাক্ষস বলাই ভালো।" তাই তাঁর পক্ষে আরও একজন তরুণ ও যোগ্য অফিসারকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই কিছুদিনের জন্য এই হত্যালীলার তদন্তকে বন্ধ রাখা হল।

কিন্তু তৎকালীন সি আই ডি'র অন্যতম ডাকাবুকো অফিসার, 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট' রথীন দাশগুপ্তের ডিপার্টমেন্টের এই কাপুরুষসুলভ মনোভাব পছন্দ হল না। তিনি সরাসরি গিয়ে দরবার করলেন এডিজি'র কাছে। স্পষ্ট জানালেন, "স্যার, আমি এই সার্জিক্যাল স-এর কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে চাই।"

এডিজি প্রথমে তাঁকে নিরস্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন। প্রথমে হুকুমের সুরে, তারপর রীতিমতো অনুরোধ করে অফিসার দাশগুপ্তকে বারণও করলেন। কিন্তু অফিসার দাশগুপ্ত শুনবেন না! তাঁরও রোখ চেপে গিয়েছিল। যখন এডিজি স্পষ্টভাবে জানালেন যে এই কেস ফাইলের অন্য নাম 'মৃত্যু', তখন তিনি বলে বসলেন, "তাহলে আমিও মৃত্যুকে দেখতে চাই। আমি এই খুনীর কিছু কিছু প্যাটার্ন বুঝতে পারছি। তাছাড়া আমার সঙ্গে শিশির আছে। কিচ্ছু হবে না।"

শেষপর্যন্ত অফিসার দাশগুপ্তের এই প্রবল জেদের সামনে হার মানলেন এডিজি। দীর্ঘ ছ'মাস পর, অক্টোবরে ফের খোলা হল 'সার্জিক্যাল স' কিলারের সেই কালান্তক কেস ফাইল। এবার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট' রথীন দাশগুপ্ত, সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ততম সঙ্গী অফিসার শিশির সেন।

– "কিন্তু অফিসার দাশগুপ্ত ঠিক কোন্ প্যাটার্নের কথা বলেছিলেন?" অধিরাজ এতক্ষণ বত্রিশ বছর আগের সেই কালান্তক কেস ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে ডঃ চ্যাটার্জীর কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। এবার অন্যমনস্ক চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "উনি কি সত্যিই কোনও প্যাটার্ন বের করতে পেরেছিলেন?"

— "পেরেছিলেন।" ডঃ অসীম চ্যাটার্জী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "রথীন দাশগুপ্তও নিতান্তই কাঁচা খেলোয়াড় ছিলেন না। তিনি তলে তলে কেসটাকে স্টাডি করেছিলেন। এবং বুঝতে পেরেছিলেন, এ খুনীর কিছু নির্দিষ্ট স্টাইল আছে। যেমন, সে রীতিমতো জানান দিয়ে হত্যা

করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আগের তদন্তকারী অফিসাররা তার এই অদ্ভুত স্টাইলটি ধরতে পারেননি।”

“স্ট্রেঞ্জ!” অধিরাজের চোখ কুঁচকে যায়, “রঘুডাকাতের মতো চিঠি লিখে আগেভাগে দিন, তারিখ, তিথি, নক্ষত্র সব জানিয়ে খুন করতে যেত -নাকি মার্ডারার!”

“একদমই না।” ডঃ চ্যাটার্জীর মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট, “সে জানান দিত ঠিকই, তবে চুপিচুপি”।

“মানে?”

- “অফিসার দাশগুপ্ত তাঁর মৃত সহকর্মীদের এবং তার আগে মৃত ভিকটিমদের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে বেশ কিছু জিনিস কমন পেয়েছিলেন”। ফরেনসিক বিশারদ জানালেন, “তারা প্রত্যেকেই অদ্ভুত একটা অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি এই অস্বস্তিটা মৃত অফিসাররাও কথাচ্ছলে তাঁদের সহকর্মীদের জানিয়েছিলেন, যার ফলে অফিসার দাশগুপ্ত এই ব্যাপারটা জানতে পারেন। প্রত্যেক ভিকটিমের মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই মনে হত, কেউ যেন তাকে সবসময়ই ফলো করছে। কেউ বা কারা যেন অষ্টপ্রহর তার ওপর সতর্ক নজর রাখছে। কিন্তু কেউ ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেননি। রথীন দাশগুপ্ত এই পয়েন্টটা নোট করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, ভিকটিমদের প্রত্যেকের বাড়িতে কোথাও না কোথাও, কখনও পাঁচিলে, কখনও বাড়ির দেওয়ালে খড়ি দিয়ে লেখা অদ্ভুত সব আনতাবড়ি সংখ্যা চোখে পড়েছিল তাঁর। অনেকটা সিক্স, এইট, নাইন, সেভেন – এরকম!” “সিক্স, এইট, নাইন, সেভেন – না নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স?” - - -

তার দু'চোখ যেন তীক্ষ্ণ তরবারির ফলার মতো ঝিকিয়ে ওঠে, “কাউন্টডাউন?”

— “এ-গ-জ্যা-ক্ট-লি!” সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, “কাউন্টডাউনই ছিল। খুনী তার প্রত্যেকটি শিকারের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত ও মৃত্যুর ঠিক দশদিন আগে থেকেই প্রকাশ্যে কাউন্টডাউন শুরু করত। কিন্তু এই সামান্য খড়ির দশ, নয়, আট, সাত, ছয় লেখাকে কেউ পাত্তাই দেয়নি! কিন্তু অফিসার দাশগুপ্ত প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর এই থিওরি কতখানি সত্যি!” ডঃ চ্যাটার্জী একটু থেমে ফের বললেন, “দুঃখের বিষয়, তার জন্য লোকটাকে নিজের প্রাণটা দিতে হল।”

"অর্থাৎ তিনিই নয় নম্বর শিকার ছিলেন।"

"তিনিই।" তাঁর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা কষ্ট, "এডিজি শিশির সেন এই কেসটার কথা কখনও বলেন না। কিন্তু তাঁর বয়ান পড়লে বুঝতে পারবে যে অফিসার দাশগুপ্তও কখনও নিজের বাড়ির আয়নায়, কখনও বাড়ির দেওয়ালে, কখনও দরজার বাইরে এরকমই 'দশ, নয়, আট, সাত, ছয়...' নাম্বারিং দেখেছিলেন। অর্থাৎ তাঁকেও জেনেশুনেই চ্যালেঞ্জ করছিল অপরাধী। তিনিও সেইরকমই অস্বস্তি ফিল করেছিলেন, যেমন বাকিদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। অফিসার দাশগুপ্ত নিজের ক্যামেরাতেও সেই কাউন্টডাউনের ছবি তুলেছিলেন। এভিডেন্স হিসেবে সেই ছবিগুলোও তুমি ফাইলে পাবে।"

"অদ্ভুত ব্যাপার!" অর্ণব বলে ওঠে, "খুনী ওঁর বাড়ির ভেতরে বা চৌহদ্দির মধ্যেই কাউন্টডাউন লিখছিল, অথচ উনি অফিসারদের সঙ্গে মিলে ফাঁদ পেতে তাকে কাউন্টডাউন লেখার সময়েই ধরার চেষ্টা করলেন না কেন? সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল!"

"সেটাই সবচেয়ে বোকামি হত অর্ণব।" অধিরাজ মাথা নাড়ে, "উনি যদি দলবল নিয়ে যে কাউন্টডাউন লিখছে তাকে ধরতে যেতেন তবে পালটা মানহানির মোকদ্দমা খেতে হত। যে লোকটা চক খড়ি নিয়ে দেওয়ালে শুধু একটা নম্বর লিখছে তাকে উইদাউট এনি এভিডেন্স শুধু খড়িহাতে গ্রেফতার করা মানে সেধে কেস খাওয়া। দেওয়ালে নম্বর লেখাটা আইনত কোনও অপরাধ নয়। আর যে এত চতুর অপরাধী, যে রীতিমত অফিসারদের ফলো করার ক্ষমতা রাখত; সে এটা জানতে পারত না যে তার জন্য অফিসার দাশগুপ্ত এরকম বোকার মতো একটা ফাঁদ পাতছেন! সে আদৌ ধরা পড়ত? উলটে হয়তো অন্য কাউকে টাকাপয়সা দিয়ে চক-খড়ি সমেত পাঠিয়ে দিত কাউন্টডাউন লিখতে। সেক্ষেত্রে মিসটেকেন্ আইডেন্টিটির ফাঁড়া ছিল। যদি ধরাও পড়ত, তবে মরে গেলেও কবুল করত না যে সে-ই খুনী। কোর্টে কী প্রমাণ হত? তবে যদি অফিসার তাকে ধরে এনকাউন্টার করে দিতেন, সেটা অন্য বিষয় ছিল। তাতেও সেই মিসটেকেন আইডেন্টিটির কেস হতে পারত। একজন ইনোসেন্টকে মারার রিস্ক কি নিতেন তিনি?" -

– "না। সে রিস্ক অফিসার দাশগুপ্ত নিতেন না। ডিপার্টমেন্ট তাঁকে যতটা মূর্খ ভাবত, তিনি ঠিক তার উল্টোটাই ছিলেন।"

-"কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি খুনীকে ধরতে পারেননি?" অধিরাজের কণ্ঠস্বরে অগাধ বিস্ময়, "অফিসার দাশগুপ্ত তো রীতিমতো কিংবদন্তী! শার্প শ্যুটার, অসম্ভব বুদ্ধিমান....!"

-"তা সত্ত্বেও তাঁর ভুল হয়েছিল। বোকার মতো না হলেও তিনি একটা ফাঁদ ঠিকই পেতেছিলেন।" ডঃ চ্যাটার্জী বিষাদঘন কণ্ঠে বললেন, "এমনকি যেদিন উনি খুন হন, সেদিন কাউন্টডাউনে 'জিরো' এসেছিল। শিশির সেনও ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু উনি বলেছিলেন, চিন্তার কিছু নেই। আমি ঠিক থাকব। একটা ফাঁদ পেতেছি। তুমি তৈরি থেকো।"

"তারপর?"

"তারপর ১৯৮৭ সালের একুশে অক্টোবর তিনি মারা যান। একইভাবে তাঁর লাশও পাওয়া যায়। ঠিক একটা বেজে পনেরো মিনিটে তাঁর মুণ্ডহীন দেহ ডাম্প করা হয় লালবাজারের সামনে। কিন্তু এইবার অকুস্থল থেকে একজন সন্দিগ্ধকে ধরে ফেললেন শিশির সেন। পুলিস রেকর্ডের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে মিলিয়ে ফরেনসিক নিঃসন্দেহে জানাল যে উনি রথীন দাশগুপ্তই বটে, শিশির সেনও আইডেন্টিফাই করলেন। খুনীও ধরা পড়ল।"

'স্ট্রেঞ্জ... স্ট্রেঞ্জার... স্ট্রেঞ্জেস্ট!" অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, "এতদিন নানা ছোটখাটো পুলিস স্টেশনের সামনে বডি ডাম্প করছিল। এবার একদম খোদ লালবাজারের সামনে কেন? এরকম একজন মারাত্মক খুনী এমন ছেলেমানুষী ভুল করল! আর শিশির সেনই বা অফিসার দাশগুপ্ত'র সঙ্গে ছিলেন না কেন?" -

"তা বলতে পারব না। কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু শিশির সেন- অফিসার দাশগুপ্ত তাঁকে অর্ডার করেছিলেন, তুমি বিকেল ছ'টার পর থেকে লালবাজার পুলিস স্টেশনের সামনে একা অপেক্ষা করবে। আমি খুনীকে হাতেনাতে ধরব। শিশির সেনও বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ঠিক রাত একটা দশ নাগাদ একটু ক্লান্তি এসে গিয়েছিল তাঁর। কয়েক মিনিটের জন্য ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়েছিলেন। তখন কে জানত যে খুনী ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে, আর স্বয়ং অফিসার দাশগুপ্ত'র লাশটাই ডাম্প করবে! - তা নিয়ে শিশির সেনের আজও আফসোসের শেষ নেই।"

– "হুঁ"। অধিরাজের কপালে চিন্তার ভাঁজ, "যদিও ধাঁধাটা পরিষ্কার হল না। অফিসার দাশগুপ্ত শিশির সেনকে লালবাজারের সামনেই অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। তার মানে তিনি জানতেন যে খুনী যে কোনও কারণেই হোক লালবাজারের সামনেই লাশটা ডাম্প করবে। কিন্তু এটা তিনি জানলেন কীভাবে? শহরে আরও অনেক পুলিস স্টেশন আছে যেখানে খুনী লাশ ফেলে যেতে পারত। বাট, সে যে বাঘের ঘরে; মানে একদম হেডকোয়ার্টারেই ডাম্প করবে এ ব্যাপারে রথীন দাশগুপ্ত এতটা নিশ্চিত হলেন কী করে। আর যদি বা এটা শিওর শট বুঝতেই পারলেন, এটা বুঝলেন না যে কার লাশ ডাম্প করা হবে! ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তো তিনি নিজেই ছিলেন, আর প্রত্যেকবার তারা'ই খুন হচ্ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের ক্ষেত্রে কেন কোনও প্রিকশান নেননি? আর শিশির সেনকে একা কেন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন? ফোর্স নিয়ে কেন নয়? ওরকম একটা ভয়ঙ্কর পাগল খুনীকে ধরা হবে, যে কি না সি আই ডি অফিসারদেরও ছাড়ছে না; তাকে কি আদৌ শিশির সেন একা ধরতে পারতেন! অসম্ভব! শিশির সেন স্বয়ং বিপন্ন হতে পারতেন! লোকটার কি আত্মহত্যা করার শখ হয়েছিল!"

ডঃ চ্যাটার্জী আফসোসে মাথা নাড়েন, "এটা রথীন দাশগুপ্ত'র ওভার কনফিডেন্ট হওয়ার মাশুল। ভদ্রলোক যখন সি আই ডি'তে ছিলেন, তখন আমি সদ্য ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে জয়েন করেছি। বিশ্বাস করো, লোকটাকে দেখলে মনে হত, ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না! তথাকথিত এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট- যার নামে সব অপরাধীরা কাঁপত, সে লোকটি আদৌ দশাসই ছিলেনই না! ফর্সা টুকটুকে, ছোটখাটো এবং রীতিমতো গোলগাল চেহারা। কিন্তু বাঘের মতো সাহসী! চূড়ান্ত বেপরোয়া। উনি যে কী পরিমাণ দুর্দান্ত ছিলেন, তা ওঁর চোখ দেখলেই বোঝা যেত।"

অধিরাজের চোখ অফিসার দাশগুপ্ত'র ছবির ওপর স্থির হল। ডঃ চ্যাটার্জী আদৌ বাড়িয়ে বলছেন না। এই সেই বাঘের মতো এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট। ভাবাই যায় না! একেবারে গোলাপের মতন ফর্সা টুকটুকে মানুষ। ফুলো ফুলো গাল! দেখলে মনে হয়; একেবারে ছাপোষা ভালোমানুষ। কেউ বলবে, যে এর রিভলবারের সামনে দাঁড়াতে সাক্ষাৎ শয়তানও ভয় পেত!

"এ তো পারফেক্ট নাড়ুগোপাল!" অর্ণব সবিস্ময়ে বলে ওঠে। -

"হ্যাঁ। এমনকি ওনার গলার আওয়াজটাও বেশ সরু আর কোমল ছিল।" ডঃ চ্যাটার্জী মৃদু হাসলেন, "কিন্তু আদতে রাবণেরও বাবা। মানুষটা যে কী পরিমাণ ডাকাবুকো ছিল ভাবতে পারবে না! ভয় কাকে বলে; জানতেনই না! অসম্ভব সাহসী, ঝুঁকি নিতে ওস্তাদ... অনেকটা রাজারই মতো...!" -

বলতে বলতেই থমকে গেলেন। চরম বিষণ্নতায় গলা ধরে এল তাঁর। ভদ্রলোক যেন নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিলেন। অধিরাজ এবার নিজেই নীরবে, পরম মমতায় জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিল তাঁর দিকে।

- "অথচ সেই দুঃসাহসই কাল হল তাঁর। তিনি চরম ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার এই বেপরোয়া পদক্ষেপের মূল্য দিতে হল সি আই ডিকে।" তিনি সামান্য গলা ভিজিয়ে নিয়ে ফের বলতে শুরু করেছেন, "সবশেষে তিনিই মারা গেলেন! তাঁর ছিন্নভিন্ন মুণ্ডহীন ধড়টা ডাম্প করা হল লালবাজারের সামনে। তবে এবার খুনী পালাতে পারল না। শিশির সেন অকুস্থল থেকে ধরলেন একটি লোককে। লোকটির জামাকাপড়ে রক্ত ছিল! সে পালাবার তালে ছিল। কিন্তু তার আগেই শিশির ধরে ফেলেন তাকে। লোকটির নাম সুকোমল পান্ডে। যথারীতি অফিসার দাশগুপ্ত'র ক্ষেত্রেও একই কথা বলল ফরেনসিক; 'আর্টারি ছিন্নভিন্ন, রক্তক্ষরণে মৃত্যু, পেরিমর্টেম সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এবং সার্জিক্যাল স।' ওখানেই 'সার্জিক্যাল স কিলারের' তান্ডব শেষ।" "একটা কথা বুঝলাম না।" অধিরাজ ফাইলটা ওল্টাতে ওল্টাতেই "যেসব ভিকটিমদের কথা এখানে আছে, তাদের প্রোফাইল যথেষ্ট স্টং! শেষের চারজন তো আবার পুলিস অফিসার। তার মধ্যে একজন এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট! তার আগের পাঁচজন যথাক্রমে এক্স আর্মি অফিসার, ডাক্তার, গুন্ডা, কুস্তিগীর ও বারের বাউন্সার! প্রত্যেকেই যথেষ্ট শক্তিশালী। অথচ খুনী এদের এত সহজে রেপ করে, খুন করে লাশ ডাম্পও করে গেল! কেউ বাধাই দিলেন না! রীতিমতো লক্ষ্মী ছেলের মতো খুন হলেন সকলেই!"

"তাদের কিছু করার ছিল না।" ডঃ চ্যাটার্জী আস্তে আস্তে বলেন, "প্রথম দিকে ব্যাপারটা ধরা যায়নি। কারণ ১৯৮৭ সালে অনেক কিছুই ফরেনসিকের ক্ষেত্রেও অজানা ছিল।

বুঝতেই পারছ টেকনোলজি অতটা উন্নত হয়নি। তাই ফরেনসিকের প্রথমে বুঝতে সমস্যা হলেও পরে ধরা গিয়েছিল যে ভিকটিমরা কেন বাধা দিতে পারেননি।" -

তিনি ফাইল থেকে বেশ কয়েকটি পেপার বের করে এগিয়ে দিয়েছেন, "এই হল তোমার প্রশ্নের উত্তর। ভিকটিমদের প্রত্যেককেই প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম নামক একটি নিউরোমাসকিউলার ব্লকিং এজেন্ট ইঞ্জেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বেসিক্যালি মাসল রিল্যাক্সিং ড্রাগ। ভিকটিমদের সামান্য নড়াচড়া বা হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাটুকুও ছিল না, ফাইট ব্যাক করা তো দূর অস্ত। সেজন্য তাদের শ্রেফ অসহায়ভাবে রেপড আর মার্ডার হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিলই না। খুনী ক্ষমতাশালী মানুষগুলোকে পুরো 'লেম ডাক' বানিয়ে ছেড়েছিল। প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামকে তখন কুখ্যাত বানিয়েছিল আমেরিকান সিরিয়াল কিলার রিচার্ড এঞ্জেলো! সে ঘটনাও ১৯৮৭ সালেরই। সেজন্যই ফরেনসিক কানেক্ট করতে পেরেছিল। নয়তো ভারতে কোনও সিরিয়াল কিলিঙে তখনও পর্যন্ত এ ড্রাগ ব্যবহারই হয়নি।"

"মা-ই গুডনেস!" বিস্ময়ে অধিরাজ হতবাক।

চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন ডঃ চ্যাটার্জী, "এর থেকে একটা শিক্ষা নিয়ে নাও রাজা। খুনীকে আন্ডার এস্টিমেট কোর না। রথীন দাশগুপ্ত সম্ভবত এই ভুলটাই করেছিলেন।"

অধিরাজ উত্তেজনায় অভ্যাসবশত বুক পকেট হাতড়াচ্ছে দেখে অর্ণবের ভুরু কুঁচকে গেল। সে মৃদু স্বরে বলে, "ওটা ওখানে নেই।"

"সরি... সরি!" সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "কিন্তু বত্রিশ বছর আগে যদি সার্জিক্যাল স কিলারের কেস বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কেস ফের রি-ওপেনড হচ্ছে কেন?"

"কারণ শিশির সেনের পোড়া কপাল!" একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বললেন ডঃ চ্যাটার্জী, "বত্রিশ বছর আগে সুকোমল পান্ডের বিরুদ্ধে চার্জশিট তৈরি করেছিলেন শিশির। লোকটার বিরুদ্ধে সমস্ত সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ছিল। সে স্পটে অফিসার দাশগুপ্ত'র লাশের সামনেই ছিল, ওখান থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল, অফিসার দাশগুপ্ত'র রক্ত তার জামায়, অফিসার দাশগুপ্ত'র বড়িতে তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট। খুনীর প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের

ব্যবহার, আর্টারি কাটার স্টাইল, বা সার্জিক্যাল স-এর ব্যবহার স্পষ্ট করে যে তার মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। অন্যদিকে সুকোমল পান্ডেরও মেডিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। লোকটা হসপিটালে ওয়ার্ডবয়ের চাকরি করত, মেডিক্যাল স্টোরে তার রীতিমতো যাতায়াত। সর্বোপরি লোকটা বাই-সেক্সুয়াল। বৌ ছিল। কিন্তু, তার পুরুষের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ। এবং সে অ্যাট্রাকশন নিরামিষ নয়!"

"আই সি!" অধিরাজ আপনমনেই বলে, "এই গে'র অ্যাঙ্গেলটা মারাত্মক! এবার বোধহয় লিঙ্কটা পরিষ্কার হল। মৃতদের চেহারাগুলো দেখুন, প্রোফাইল দেখুন। আর্মি অফিসার ও ডাক্তারটি রীতিমতো হ্যান্ডসাম! গুন্ডা ও বার বাউন্সার দেখতে হয়তো সুদর্শন নয়, কিন্তু রীতিমতো মাসলড ফিজিক পুলিস অফিসারস আর এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের তো কথাই নেই! পেশাটাই অসম্ভব পুরুষালি ! সম্ভবত এটাই সেই লিঙ্ক। বিইং ম্যানলি! এক্ষেত্রে শিশির সেন কোনওরকম ভুল করেননি বলেই তো মনে হচ্ছে।" -

অর্ণব অধিরাজের দিকে একটু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতেই তাকায়। খুনী যে-ই হোক, তার বারবার পুরুষদের রেপ করার স্বভাব প্রমাণ করে যে সে সমকামী। এবং সেই কেসে এতগুলো ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের মৃত্যু হয়েছে! তাও এভাবে! এবং সেই কেসই ন'জনের প্রাণ নিয়ে ফের ফিরে আসছে অধিরাজের হাতে। সে আশঙ্কিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দীর্ঘ, সুঠাম দেহটা মেপে নেয়। যে 'ম্যানলিনেসের' কথা অধিরাজ বলছে, সেই ম্যানলিনেস যে তার নিজেরই দেহে রীতিমতো ঔদ্ধত্যে বিরাজ করছে, সে খবর সে নিজেই রাখে তো! অর্ণবের খণ্ডমুহূর্তের জন্য মনে হল, সে কোনও অফিসারকে নয়, দশম ভিকটিমকে দেখছে, যে সম্ভবত ঐ সমকামী বা বিকৃতকাম খুনীর জন্য জ্যাকপট!

"হ্যাঁ। তার ওপর লোকটা ছিল একনম্বরের মিথ্যাবাদী।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "পুলিশি জেরার সময়ে, এমনকী কোর্টে উঠেও একের পর এক মিথ্যে কথা বলে গিয়েছিল। সে মিথ্যে চূড়ান্ত হাস্যকর। সচরাচর ক্রিমিনালরা নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যে বলেই। কিন্তু এ মিথ্যের কোনও মা-বাপ নেই রাজা! লোকটা আপাদমস্তক ভুলভাল বলে গেল। এমনকী নিজের নামটাও বারবার মিথ্যে বলেছিল। বলেছিল তার নাম নাকি সুকোমল পান্ডে নয়, সুমঙ্গল পন্ডিত ! তার মিথ্যে কথা বলার জ্বালায় উকিলরা তো বটেই, এমনকী জাস্টিসরা

পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তাকে 'আসামী' বলে শনাক্ত করে আজীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়ে সকলেই বাঁচলেন! কোর্টের রায় তুমি ফাইলেই পাবে।"

"আজীবন কারাদণ্ড কেন?" অর্ণব এবার স্বভাববিরুদ্ধভাবেই বলে ওঠে, "ফাঁসি দিলে হত না?" -

– "সেটা তোমরা হাইকোর্টের জাস্টিস গাঙ্গুলিকেই জিজ্ঞাসা করে নিও। সাজা শোনানো আমার ডিপার্টমেন্ট নয়। তবে ঘাড়ে যখন পড়েছে তখন রিসেন্ট আপডেটটাও দিয়ে দিচ্ছি।" ডঃ চ্যাটার্জী চিন্তিত, "বত্রিশ বছর পর, বর্তমানে সুকোমল পান্ডের ছেলে সুদর্শন পান্ডে এসে কেসটাকে সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে গিয়েছে। যখন সুকোমলের সাজা হয় তখন সুদর্শনের বয়স মাত্র ছ'মাস। এখন সে ছেলে পড়াশোনা করে রীতিমতো লায়েক হয়েছে। সে কেসটা সুপ্রিম কোর্টে নিয়েছে এবং তার পক্ষের উকিল প্রমাণ করে দিয়েছেন যে শিশির সেনের গোটা চার্জশিটই সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সের ওপর সাজানো, কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই, এমনকী শিশির সেন স্বয়ং তাকে শুধু ভয় পেয়ে পালাতে দেখেছেন, খুন করতে দেখেননি। ইনফ্যাক্ট কেউই তাকে খুন করতে দেখেনি।"

– "হুঁ।" অধিরাজের কপালে ভাঁজ পড়ে, "সেক্ষেত্রে বর্তমানে আইনও তাকে জোর দিয়ে খুনী বলতে পারে না। একটা সময়ে সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সের ওপরই জোর দেওয়া হত। কিন্তু এখন আবার প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রয়োজন।"

"রাইট। এক্ষেত্রে তা নেই। তাছাড়া শিশির সেনের চার্জশিটে অনেকগুলো দুর্বলতাও আছে। অনেক প্রশ্নও তুলেছেন ডিফেন্স কাউন্সিলর।" তিনি জানান, "লোকটাকে স্পট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ঠিকই। মোটিভ যদি বা বোঝা যায়, কিন্তু তার কাছে কোনও মার্ডার ওয়েপন ছিল না। এমনকী সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু যেটা, যার নামে এই মাস-মার্ডার কেসের নামকরণ হয়েছিল, সেই সার্জিক্যাল স'ও সুকোমলের হাতে ছিল না। তার বাড়িতেও তন্নতন্ন করে খুঁজেছিলেন শিশির সেন। এমনকী বাড়ির চতুর্দিকেও মাটি খুঁড়ে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সার্জিক্যাল স পাওয়া যায়নি। সুকোমল যদি লুকিয়ে থাকে, তবে লাশ ডাম্প করা আর তার ধরা পড়ার মধ্যে সময়ের ফারাক মাত্র দু এক সেকেন্ডের। তার মধ্যে ও স'টা এমন কোথায় লুকোল যে খুঁজেই পাওয়া গেল না! তাছাড়া ন'টা মুণ্ডহীন লাশের

মাথাই বা কোথায় গেল? সুকোমলের কাছে পাওয়া যায়নি! সবচেয়ে বড় তুরুপের তাস যেটা ছিল সেটা সুকোমলের ডাইনে-বাঁয়ে ভয়াবহ মিথ্যে বলা। কিন্তু সেটাকেও এনকাউন্টার করল ডিফেন্স।" -

"লাই ডিটেকটর?"

অধিরাজের দিকে তাকিয়ে প্রশংসায় ভুরু নাচালেন তিনি, "মোক্ষম ধরেছ! লাই ডিটেকটর বা পলিগ্রাফ টেস্টে বসানো হল সুকোমলকে। সেখানেও সে চূড়ান্ত মিথ্যে কথা বলে গেল! ঠিকানা, বাবার নাম, ছেলের নাম- সব মিথ্যে! যথারীতি নিজের নামও সুমঙ্গল পন্ডিতই বলল! কিন্তু এখানেই গল্পে ট্যুইস্ট! টেস্টে দেখা গেল সে সব কথা সত্যি বলছে! অর্থাৎ পলিগ্রাফ টেস্ট তার সমস্ত মিথ্যে কথাকেই সত্যি বলে ডিটেক্ট করল!"

"ও-তেরি!"

পাহাড় প্রমাণ বিস্ময়কে আর আটকে রাখতে পারল না অর্ণব। কিন্তু অধিরাজ সজোরে হো হো করে হেসে ওঠে। অর্ণব তো বটেই, এমনকি ডঃ চ্যাটার্জীও চমকে উঠলেন! কোনওমতে বললেন, "পেগলে গেলে নাকি? এমন হাসছ কেন?"

– "আই লাভ দ্য টুইস্ট!" অধিরাজ হাসতে হাসতেই জানায়, "লোকটা প্যাথোলজিক্যাল লায়ার- তাই বলবেন তো?"

"এটাই হচ্ছে তোমার প্রবলেম! সব কিছুই আগেভাগে বুঝে বসে থাকতে হবে এমন দিব্যি তোমায় কেউ দিয়েছে?" ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মুখটা হাঁড়ি করে ফাইলটা অধিরাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "সবই যখন বুঝে বসে আছ তখন এই নাও বাপু! আমায় আর জ্বালিও না!" -

"সরি ডক"। সে অতিকষ্টে হাসি সংবরণ করে, "কিন্তু কারেন্ট স্টেটাস তো বলুন। বত্রিশ বছর আগে যাদের যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ক'জনকে এখন পাওয়া যাবে?" -

"টোটাল বারোজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য যে তাদের মধ্যে মাত্র সাতজনই বর্তমানে বেঁচে আছেন, ইনক্লুডিং শিশির সেন।" -

"বেশ! মিস্টার সুকোমল পান্ডে আপাতত কোথায় আছেন?"

"কোর্টে কেস এখনও চলছে। জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। নিজের বাড়িতে বসে চর্ব-চোষ্য খাচ্ছেন।" ডঃ চ্যাটার্জীর মুখে আশঙ্কা ও আতঙ্কের - যুগপৎ মেলবন্ধন, "তুমি কি ঐ লোকটাকে জেরা করার কথা ভাবছ?"

"আমি সবাইকেই জেরা করার কথা ভাবছি। তবে ওনাকে দিয়েই শুরু করব।" -

"ফাইন।"

- "আর কিছু? যা বত্রিশ বছর আগের ফরেনসিক রিপোর্টে লেখা নেই?" — "হ্যাঁ"। ডঃ চ্যাটার্জী এবার লাশের ছবিগুলো প্রায় তাসের মতো বিছিয়ে দিয়ে বললেন, "ভালো করে লক্ষ্য করো।" -

অর্ণব ভয়ে ভয়ে ছবিগুলোর দিকে তাকায়! কী বীভৎস লাশগুলো! নিজের কেরিয়ারে রক্তাক্ত লাশ সে খুব কম দেখেনি। অনেক বিকৃত মৃতদেহ দেখে সে অভ্যস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত ভয় তার মেরুদণ্ড হিম করে নেমে গেল। মুণ্ডুহীন লাশের মাথার হাঁড়িগুলো যেন তার ভয় বুঝতে পেরে পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে ওঠে! কী ভয়ঙ্কর পরিণতি!

"ফরেনসিক এক্সপার্টরা বলেছেন যে ভিকটিমদের আর্টারিগুলো কেটে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে ট্রিমেন্ডাস রক্তপাত হওয়ার কথা। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। রক্তক্ষরণের ফলেই তাঁরা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রাইমস্পটে তেমন কোনও রক্ত দেখতে পাচ্ছ?"

- "ব্লাডট্রেস খুব কম!" অধিরাজ বলল, "যতখানি থাকা দরকার, ততখানি অন্তত নেই।"

— "রাইট ইউ আর!" তিনি ইতিবাচকভাবে মাথা ঝাঁকালেন, "তার মানে খুনটা আশেপাশে কোথাও হয়নি। খুনী খুনটা অন্যত্র করেছে। এমন কোথাও, যেখানে সে আরামসে নিজের কাজটা বিনা বাধায় করতে পারে। রক্ত সাফ করার জন্য এনাফ সময় তার কাছে ছিল।"

"পরের খুনগুলোর কথা যদি বাদও দিই, তবুও প্রথম খুনগুলোর কথা ভাবুন। পাঁচ পাঁচটা লোককে একদিনে মেরেছিল সে।" তার চোখে চিন্তার আভাস, "পাঁচজন মানুষের রক্ত পরিষ্কার করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। খুনী কী করে সেটা এত অবলীলায় পরিষ্কার করে ফেলল! আর ব্লাড তো বরফ নয়, যে একজায়গায় জমে থাকবে। যখন ভিকটিমরা

মৃত্যুমুখী তখন তারা রেপড হয়েছিলেন। পেরিমর্টেম সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট। তার মানে তাদের আর্টারি কাটা হলেও তখনও তাদের হার্ট ব্লাড পাম্প করছিল। আর হার্ট যতক্ষণ ব্লাড পাম্প করবে ততক্ষণ রক্তের ধারা ছড়াতে থাকবে! যদি ধরেও নিই, সে কোনও রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে খুনগুলো করছিল, তা সত্ত্বেও সারা ঘরময় রক্তারক্তি কাণ্ড হওয়া উচিত। ইনফ্যাক্ট এরকম ব্লিডিং হলে বন্ধ দরজার বাইরেও রক্তের ধারা বেরিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ কারোর চোখে সেটা ধরা পড়ল না! যদি মেনে নিই যে সে পথে ঘাটে, বনে-বাদাড়ে খুন করেছিল, সেক্ষেত্রেও তো কেউ না কেউ, কখনও না কখনও এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখবেই। আর ঘরে রক্ত পরিষ্কার করা বরং সুবিধা, কিন্তু অন্য কোথাও হলে ব্লাড ট্রেস তো ডেফিনিটলি থাকবেই। চাপ চাপ রক্ত জমে থাকবে। কোনও লোকাল লোকের চোখে পড়লে সে তো চেঁচিয়ে মেচিয়ে একসা করবে। এবং অবভিয়াসলি পুলিসকে জানাবে! অথচ নটা খুন হয়ে গেল, ইনভেস্টিগেটিং টিম কোথাও রক্তের ট্রেসই পেল না! মানেটা কী!”

“কী বলতে চাইছ?” 1

“আমি বলতে চাইছি যে খুনী স্পটে বসে খুন করেনি এটা তো বোঝাই গেল। তবে সে কোথায় বসে মহা আরামে এতগুলো খুন করে গেল, উইদাউট লিভিং এনি ব্লাড ট্রেস? নিজের বাড়িতে করতেই পারে না। যদি লোকটা একাও থাকে তবু এত পরিমাণ রক্ত গড়িয়ে বাইরে যাবেই। আর রক্ত ওরকম লক্ষ্মী ছেলের মতো এক জায়গাতেই বসে থাকবে না, দেওয়ালে ছিটকে লাগবে, মেঝের কোণায় কোণায় গড়াগড়ি দেবে। সেসব একদম ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার করে ফেলা এককথায় অসম্ভব। রক্ত দেখলে আর কেউ না হোক, প্রতিবেশীরা হল্লা করবে। আর বাইরে খুন হলে কেউ না কেউ নোটিস করতই। কারণ মসৃণ মেঝের ওপর দিয়ে রক্ত সাফ করা সম্ভব, রাফ সারফেসে নয়। তাহলে এমন ব্লাডিমার্ডার, এমন অদ্ভুত ব্লাডলেস হল কী করে?” অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, “আমার প্রশ্নটা গেস হু নয়, গেস হোয়্যার? লোকটা খুনগুলো ঠিক কোথায় করেছিল?”

“ইউ আর ড্যাম রাইট!” ডঃ চ্যাটার্জী বিস্ময়াভিভূত, “এভাবে তো ভেবে দেখিনি! ইনফ্যাক্ট শিশির সেনও ভাবেননি।” -

"আমি ভাবছি।" সে মৃদু হাসে, "আর কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ"। ডঃ চ্যাটার্জীর মুখে আশঙ্কার কালো মেঘ জমেছে, "আমি জানি না রাজা, আসল খুনী কে! এতদিন পরে জানতেও চাই না। ইনফ্যাক্ট আমার সন্দেহ, যদি সুকোমল পান্ডে না হয়ে থাকে তবে নির্ঘাৎ বত্রিশ বছরে খুনীর কর্মক্ষমতা ও শারীরীক ক্ষমতা অনেকটাই নিঃশেষ, অথবা সে আর ধরাধামে নেই। কিন্তু বাই এনি চান্স যদি সে বেঁচে থাকে, এবং জানতে পারে...!" তাঁর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক স্পষ্ট, "তাহলে...।"

"আমায় মারবে।" অধিরাজ এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মিটিমিটি হেসে বলল, "ইন দ্যাট কেস, তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কারণ এটা ১৯৮৭ সাল নয়, ২০১৯। আমার বাড়িতে এবং চতুর্দিকে সিসিটিভি রয়েছে। আপনারাও তার পরিচয় জানতে পারবেন।"

"এভাবে সেটা আমরা জানতে চাই না!" ডঃ চ্যাটার্জীর মুখ রাগে থমথমে, "তোমার কী মনে হয়? পুরো ব্যাপারটাই ফাজলামি হচ্ছে! ন ন'টা জাঁদরেল মানুষ মারা গিয়েছে রাজা! দিস ইজ নট আ ম্যাটার অব জোক! তোমার ধারণাও আছে যে কার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে যাচ্ছ?"

- "আই নো!" সে হাসছে, "আমার মাথার ওপর একটা সার্জিক্যাল স নেমে আসছে বলছেন? দেখাই যাক না! ইট উইল বি আ গুড রিয়ালিটি শো!"

— "হে-ল, নো!" তিনি প্রায় গর্জন করে ওঠেন, "দিস ইজ নট আ রিয়ালিটি শো! কোনওরকম জাগলারি চাই না আমাদের! রথীন দাশগুপ্তকে দেখে শিক্ষা নাও! শিশির সেন লিভ নিয়েছেন। কিন্তু এখনও উনি তোমার এডিজি। ওঁর অর্ডার অনুযায়ী তোমার বাড়িতে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। আরও টাইট সিকিউরিটি দেওয়া হবে। তবে ওপর ওয়ালারা মনে করছেন যে এই মুহূর্তে তোমার বাবা-মায়ের তোমার সঙ্গে থাকাটা বিপজ্জনক। অতএব তাদের দেখা তুমি আর আজ রাত থেকে পাবে না।"

"কী!" অধিরাজ বিস্ময়ে কথা খুঁজে পায় না, "বাবা মায়ের দেখা পাব না মানে!"

"যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ, ঠিক তখনই অফিসার পবিত্র আচার্য ও মিস আত্রেয়ী দত্ত অলরেডি তোমার বাড়ি চলে গিয়েছেন। ওরা তোমার বাবা-মাকে বুঝিয়ে

সুঝিয়ে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র শিফট করে দেবেন। হয়তো অলরেডি করেও দিয়েছেন। ওঁরা সেফ থাকবেন। এখন থেকে তোমার বাড়িতে শুধু তোমার ফুল টিম থাকবে। তুমি, অর্ণব, পবিত্র, মিস দত্ত এবং আহেলি! এই মুহূর্ত থেকে শুধু এরাই তোমার পরিবার!" এইবার যেন অধিরাজের মাথায় সত্যিই সার্জিক্যাল স পড়ল! সে পুরো হাঁ। কোনমতে বলল, "পবিত্র, অর্ণব অবধি তবু ঠিক ছিল, কিন্তু মিস মুখার্জী! উনি কেন? আই মিন...!"

"কেন? অর্ণবের সঙ্গে লিভ টুগেদার করতে তো তুমি এক পায়ে খাড়া! মিস মুখার্জী কী দোষ করেছেন? উনি কি তোমায় কামড়াবেন?" তিনি ভ্রূকুটি করেছেন, "তোমরা তো হোমিসাইডকে হোমোসাইড বানিয়ে ছাড়বে দেখছি!"

অর্ণব জব্বর বিষম খেল। অধিরাজ কাঁচুমাচু মুখে বলে, "না। অফিসাররাই তো যথেষ্ট! এর মধ্যে মিস মুখার্জী কী করবেন? উনি তো ক্যারাটেও জানেন না!"

– ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় গর্জন করে উঠলেন, "এটা ক্যারাটে কম্পিটিশন হচ্ছে না! ওপরমহলের কড়া নির্দেশ। পুরো টিমটাই একসঙ্গে থাকবে উইথ অ্যাট লিস্ট ওয়ান ফরেনসিক এক্সপার্ট। তোমরা যে ধরনের গর্দভ সম্রাট, তাতে মিস দত্ত একা একা বোর হবেন বলে মিস মুখার্জীকেই পাঠাচ্ছি। তোমরা একসঙ্গে কাজ করবে, একসঙ্গে তদন্তে যাবে, এটাই অর্ডার। ওপরমহল থেকে অলরেডি তোমাদের সবাইকে ই-মেলও করে দেওয়া হয়েছে। তোমার বাড়িতে লম্বা কোনও হলঘর আছে?"

- "তা আছে, এবং একাধিক!"

"ফ্যান্টাস্টিক।" তিনি বললেন, "ওটাই এখন থেকে ল্যাব। আমি আহেলিকে সব রেডি করতে বলছি। আপাতত মিস দত্ত আর অফিসার আচার্য চলে গিয়েছেন বলেই খবর পেয়েছি।" -

অধিরাজ বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে অসন্তুষ্ট মুখে তাকিয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য, এ জাতীয় ব্যবস্থা তার মোটেই পছন্দ হয়নি। কিন্তু ওপরওয়ালাদের নির্দেশ অমান্য করাও সম্ভব নয়। তাই বিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, "মিস কী যেন...! উনি আবার কে!"

– "মিস দত্ত স্যার।" অর্ণব ফিসফিসিয়ে অধিরাজের ভ্রম সংশোধন করে। ডঃ চ্যাটার্জী বিরক্তিমাখা স্বরে বললেন, "উনি বিশ্বসুন্দরী! দেখছ না, গোটা সি আই ডি টিম তোমার বাড়িতে ঘাঁটি গাড়ছে, সুতরাং মিস দত্ত কি এয়ার হস্টেস হবেন? উনি লেডি অফিসার অফকোর্স। মিস আত্রেয়ী দত্ত। নিউ রিক্রুট!"

"বুঝলাম!" অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যদিও এ ব্যবস্থা সে মোটেই মেনে নিতে পারছে না, তবু উপায়ই বা কী?

"আমি রেডি স্যার!" পেছন থেকে ফের মিষ্টি আদুরে রিনরিনে স্বর ভেসে এল। আহেলি এসেছে।

কিন্তু তার মূর্তিটা দেখে চক্ষু চড়কগাছ অর্ণবের। এ কী মারকাটারি বেশে এসেছে! নীল রঙের কুর্তির নীচে কালো ট্রাউজার! কানে ডোকরার গয়না। রেশমী ঘন চুল পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। কানের পাশ দিয়ে সামান্য ঢেউ খেলানো চুলের কারুকাজ! খুব 'কেয়ারের' সঙ্গেই সৃষ্ট 'কেয়ারলেস বিউটি'। ঠোঁটে লিপস্টিক! গা থেকে ভেসে আসছে নেশাধরানো সুগন্ধী। সম্ভবত গ্যাব্রিয়েল! পিঠে ব্যাকপ্যাক।

- "দেন হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর?" ডঃ চ্যাটার্জী ভ্রূকুটি করে বললেন, "আ রেড কার্পেট? মুভ মুভ! বাড়ি যাও।"

"ভার্মিলিয়ন রেড।"

— "কী!" অধিরাজ একটু ঘাবড়ে গিয়ে অর্ণবের দিকে তাকায়। বলাই বাহুল্য, আহেলির দিকে একঝলক তাকালেও রহস্যটা সে ভেদ করতে পারেনি।

– "আজ্ঞে, ভার্মিলিয়ন রেড!" ঢোঁক গিলে কোনমতে দ্বিতীয়বার শব্দটা বলল অর্ণব। কারণ এই মুহূর্তে আহেলির লিপস্টিকের শেড ওটাই!

(৫)

জনশূন্য ফুটপাথে ল্যাম্পপোস্টের তলায় একটা বয়স্ক, কুদর্শন ভিখিরি বসেছিল।

এমনিতে এই দৃশ্যে কোনওরকম অস্বাভাবিকতা নেই। এই বিশেষ ভিখিরিটি বহুবছর ধরেই এই ল্যাম্পপোস্টের তলাতেই বসে আছে। ঠিক কবে থেকে এখানে আছে সে, তা হয়তো কারোরই মনে নেই। তবে আশেপাশের বাড়ির বাসিন্দারা তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। সকলেই জানে যে লোকটা পাগল। সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়ায় তার কোনও ঠিক নেই। কিন্তু সন্ধ্যের পর থেকে এই ল্যাম্পপোস্টটা তারই দখলে। সামনের বিশাল বাগানওয়ালা তিনতলা বাড়ির মালকিনের বড় দয়ার শরীর। এই পাগল, অনাথ ভিখিরিটাকে রাতের খাবার প্রতিদিন তিনিই পাঠিয়ে দেন।

ল্যাম্পপোস্টের আলো লোকটার ওপর পড়ে কিছুটা অবয়বকে স্পষ্ট করেছে। তার চেহারার মধ্যেও কোনও বিশেষত্ব নেই। যেমন তিলোত্তমার বুকে কোটি কোটি ভিখিরি বৈশিষ্ট্যহীন একইরকম হুলিয়া নিয়ে ঘুরছে, সেও সেই দলেরই প্রতিনিধি। একমুখ দাড়ি-গোঁফের আড়ালে আসল মুখের আদল বহুদিন হল বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছে। একরাশ জটাভরা চুল বিস্ত হয়ে পড়েছে পিঠের ওপরে। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা জামা, যার আসল রঙ কী ছিল তা খোদায় মালুম! তার ওপর একটা বেমানান কম্বল। তিনতলার বাড়ির মা জননীরই দয়া! বেচারির শীতে কষ্ট হয় বলেই গতবছর দান করেছেন।

লোকটা কম্বলটা মাথার ওপর একটু টেনে দেয়। তার উৎসুক দৃষ্টি সামনের তিনতলা বাড়ির দিকে প্রসারিত। আজ ও বাড়ি থেকে বরাদ্দ রাতের খাবার আসেনি। বরং কিছু একটা ঘটছে ও বাড়িতে। কী ঘটছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে একটু রাত হতে না হতেই হুশহাশ করে একের পর এক গাড়ি আসছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে! ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গাড়ির আসা-যাওয়া লক্ষ্য করছিল। এমনিতেই বাড়ির ভেতরে কড়া প্রহরা। এ বাড়ির মালিকের ছেলে পুলিশে চাকরি করে। তাই হয়তো পাহারার কড়াকড়ি। বাইরে বিরাট একখানা লোহার গেট। ভেতরে উর্দিধারী প্রহরী। কিন্তু তার মধ্যেও একটা অস্থিরতা তার চোখ এড়িয়ে যায়নি।

ভিখিরিটা একটু চোখ সরু করে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করে। বেশ রাতের দিকে একটা বিরাট কালো গাড়ি হুশ করে এই বাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেল। গাড়িতে কে ছিল, তা দেখতে পায়নি। কিন্তু সেই গাড়িটা বেরিয়ে যেতে না যেতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অন্য আরেকটা গাড়ি গেটের সামনে এসে থামল। এই গাড়িটা আবার সাদা। গাড়ি থেকে নামল বেশ বলিষ্ঠ চেহারার একজন পুরুষ, সঙ্গে একজন ছোটখাটো চেহারার মহিলা! তারা স্মার্টভঙ্গিতে গট গট করে গেটের ভেতরে ঢুকে যেতে না যেতেই ঠিক ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার একটা লাল গাড়ি ভেতর থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত নীরবে চলে গেল! তার ভেতরে কারা ছিল, কোথায় গেল- ভগবানই জানেন! কিন্তু সে লক্ষ্য করেছে গাড়িগুলোর চলন ভারী সাবধানী! চুপিচুপি আসছে আর যাচ্ছে। এমনকি হর্ণও দিচ্ছে না!

ভিখিরিটা মুখ ব্যাজার করেছে। এই মুহূর্তে সে শুধু এইটুকু জানে যে তার ভেতরে আগ্রাসী ক্ষুধা বিশাল অজগরের মতো হাঁ করে বসে আছে। কিন্তু খাদ্যবস্তুর দেখা নেই। কখন দেখা মিলবে কে জানে। হয়তো তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকাই সার!

ইতোমধ্যেই ভেতর থেকে সেই বলিষ্ঠ চেহারার যুবক বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে সেই মহিলা! বাইরে দাঁড়িয়ে উর্দিধারীদের কিছু নির্দেশ দিচ্ছে ওরা। লোকটা তার লোলুপ দৃষ্টি যুবকের ওপরে একবার বুলিয়ে নিল। প্রায় পাঁচ ফুট দশ বা এগারো ইঞ্চি লম্বা। গড়নটা মন্দ নয়। রীতিমতো চওড়া কাঠামো। হাতের কবজি, কাঁধ বেশ পুরুষালি। পাশের মেয়েটির একটু ছোটখাটো চেহারা হলেও যথেষ্ট শক্তপোক্ত। উঁচু করে টপনট বেঁধেছে। মুখ প্রসাধনহীন। কিন্তু মেয়েটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। কোনওদিনই কোনও নারী তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। মেয়েদের একরাশ কোমল, নরম বাঁক, মেদসর্বস্বশরীর কখনই তার পছন্দ নয়! আছেটা কী ওদের মধ্যে? সবাইকেই তো একরকম দেখায় ! গুচ্ছ নমনীয় ভাঁজে কোনও রহস্য নেই! মানুষের থেকে বেশি আদুরে বিড়ালের সঙ্গেই বেশি মিল!

রহস্য তো সবচেয়ে বেশি পুরুষের দেহে! সুন্দর তো আসলে পুরুষ! বলিষ্ঠ, পেশল দেহের কারুকার্য যৌন আবেদনে কম কীসে? চওড়া কাঁধ-বুকের ঔদ্ধত্য, রাগী ও চোখা দৃষ্টির ঝাঁঝ, সরু কোমরের বাঁক, লম্বা দুটো পায়ের সিংহের মতো দৃঢ় ও রাজকীয় পদক্ষেপ,

গ্রীক দেবতার মতো টানটান শরীর, রুক্ষ চিবুক, বাদামি দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর- ওঃ! ভোলা যায় না! ভোলা যায় না! পাগল করে দিল!

লোকটা অসম্ভব কামনায় নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। গোটা দেহে ভীষণ ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করছে। কিন্তু খাদ্যবস্তুর যে দেখাই নেই! আর কতক্ষণ? আর কত দেরি? একবারও কি সামনে আসবে না? একবারও কি দেখা যাবে না? সে কাতর দৃষ্টিতে বন্ধ গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। যুবক ও যুবতী তখনও গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে। যুবক মোবাইল নিয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেন সচকিত হয়ে উঠেছে। তার দৃষ্টি এখন এদিকেই নিবদ্ধ। একটু সতর্ক দৃষ্টিতে যেন তাকেই দেখছে।

ও মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে এই ছেলেটির সঙ্গে বার্তালাপ করার ইচ্ছে আদৌ নেই! তার খিদে পেয়েছে! নিজের মধ্যে প্রচণ্ড হিংস্র রাগ টের পাচ্ছিল সে। মাংসাশী শ্বাপদের মতোই নখ দাঁত সব বের করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। পারলে সামনের ছেলেটাকেই ছিঁড়েখুঁড়ে খায়! নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো! ও কি আসবে এদিকে?

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুটা দূরত্বে দাঁড়ানো যুবকের দিকে তাকায়। সেও একদৃষ্টে তার দিকেই দেখছে। এই অবস্থাতেও মনে মনে কিছুটা কৌতুকবোধ না করে পারল না পাগলটা। তার মুখে একটা অনিশ্চিতভাব আলতো ছাপ ফেলেছে। অনেকটা ফাইভ স্টার হোটেলে বিরাট মেনুকার্ডের দিকে তাকিয়ে থাকা বিভ্রান্ত মানুষের মতো। কোনটা বেছে নেবে বুঝতে পারছে না যেন। তবু কী অদ্ভুত আকর্ষণে তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে! তার অজান্তেই চাদরের তলায় লুকোনো ধাতব অস্ত্রটাকে সজোরে চেপে ধরল হাতের পাঁচ আঙুল।

ছেলেটি বোধহয় এদিকেই এগিয়ে আসত। কিন্তু তার আগেই সেই বিরাট কালো গাড়ি সশব্দে এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। লোকটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় গাড়ির দরজার দিকে। কে আছে ভেতরে? এই গাড়িটাকেই বেশ কয়েকঘণ্টা আগেই বেরিয়ে যেতে দেখেছে। এখন আবার ফিরে এল! কে এলেন? তথাকথিত মা জননী নাকি?

গাড়ির দরজা খুলে গেল। যিনি নামলেন তাকে দেখে আর যাই হোক মা জননী মনে হয় না। বিরক্তিতে চোখ সরিয়ে নেয় সে। আবার একটা ঠোঁটে রঙ দেওয়া নমনীয় মেয়ে!

একইরকম দেখতে! সবাই একরকম! দেখার কিস্যু নেই। অবহেলায়, বিতৃষ্ণায় তার ঠোঁট বেঁকে যায়। হয়তো আর ফিরেও তাকাত না। কিন্তু আচমকাই কানে এল পুরুষের ভারী বুটের দ্রুত আওয়াজ! সে বিদ্যুৎগতিতে মুখ তুলে তাকায়। সামনেই দাঁড়িয়ে ইপ্সিত মানুষ। চুম্বকের মতো চোখ আটকে গেল সেদিকেই। লাফ মেরে এক মুহূর্তের মধ্যে হৃৎস্পন্দন যেন পাঁচগুণ বেড়ে গেল। লোকটা টের পেল হঠাৎ করেই তার প্রচণ্ড গরম লাগছে! দামাল ঝোড়ো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উত্তাল রক্তস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ল শিরা-উপশিরায়। ও চোখ বুজে ফেলে। মুখের ভেতরে গরম লালা জমছে! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নিজের ভেতরে তীক্ষ্ণ একটা বেদনা অনুভব করল সে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণা কাতর অস্ফুট শব্দ করে উঠল মানুষটা। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না! কী নেশা! কী আকর্ষণ! এ কী পাগলামি! পাগলামি না বিকৃতি?

"বিকৃত মস্তিষ্ক"! শব্দটা যেন সপাং করে চাবুক মারল তাকে। দাঁতে দাঁত পিষে নেশাচ্ছন্ন মানুষের মতো টলমল করে উঠে দাঁড়াল ও। কোনওমতে শরীরটাকে টানতে টানতে এগিয়ে গেল ওদিকেই। কানে এল দুই পুরুষের কথোপকথন। -

"রাজা, এত টেনসড হওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক আছে।" প্রথম যুবকের কণ্ঠস্বর কানে এল তার। গাড়ির দরজা খুলে ততক্ষণে নেমে এসেছে আরেকজন যুবক। সে তার দিকে ফিরেও তাকাল না। ওর দুটো চোখ অর্জুনের মতোই নিজের লক্ষ্যে স্থির। -

"সে তো বুঝলাম পবিত্র। কিন্তু তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কী করছ?" আয়ত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফুটে উঠল অসন্তোষের ছাপ— "আর ওনাকে এখানেই দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? মিস... কী যেন অর্ণব!"

অর্ণব ফিসফিস করে বলল, "দত্ত স্যার! আর ছড়াবেন না প্লিজ।" – "গৃহকর্তাকে ছাড়া তো আর ঢুকতে পারি না। কী জানি, কাকিমা-কাকুর অনুপস্থিতিতে যদি কিছু মিসিং হয়ে যায় আর তুমি বেচারি পুলিসকেই চোর বলে কাঠগড়ায় তুলে দাও! সেই ভয়েই এখানে ল্যান্ডমার্ক হয়ে দাঁড়িয়ে

আছি...।" প্রথম যুবক তথা অফিসার পবিত্র আচার্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আচমকাই অনভিপ্রেত একটি মানুষকে দেখে থমকে গেল। লোকটি আর এগোনোর

আগেই সে আর অর্ণব তড়িৎগতিতে এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। তাদের হাত আলতো করে স্পর্শ করল কোমরের আগ্নেয়াস্ত্র! ওদের চোখে স্পষ্ট সন্দেহ, চোয়াল শক্ত। ওরা মানব প্রাচীরের মতো অধিরাজকে আড়াল করে দাঁড়াল। অর্ণব কড়া পুলিশি স্বরে বলে, "কী চাই?"

অধিরাজ কম্বলধারীকে লক্ষ্য করে ওদের দু'জনেরই কাঁধে হাত রাখে। আলতো চাপে ওদের আশ্বস্ত করল, "আরে, ও বাবু! ওকে আমি চিনি।" লোকটি মিনতি ভরা চোখ দুটো তুলে তাকায় তার দিকে। অধিরাজ দু'জন অফিসারকে সরিয়ে এসে দাঁড়াল ঠিক তার সামনে। গাঢ় স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলল, "কী রে? তুই এখনও জেগে আছিস!"

— "স্যার!" অর্ণব তখনও সন্দেহ কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পাগলটারদিকে, "আমার ওকে মোটেই নর্মাল লাগছে না। আপনি প্লিজ সরে আসুন।" অধিরাজ পাগল মানুষটার চোখে চোখ রাখে। অর্ণবের কথার কোনও উত্তর দিল না। স্বাভাবিক লাগবে কী! মানুষটাই যে অস্বাভাবিক! মা যে রোজ এ বেচারির জন্য খাবার পাঠান তা তার অজানা নেই। যাতায়াতের পথে অনেকবার দেখেছে। তেমন ভালোভাবে কখনও না দেখলেও এই দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন মুখটা অচেনা নয়। সে দেখল, ওর দু চোখ কী যেন কাতর প্রার্থনা করে চলেছে! এক অব্যক্ত মিনতি ঝরে পড়ছে তার দৃষ্টিতে। কিছু যেন ভীষণভাবে চায়।— "কী হয়েছে?" সে একটু উদ্বিগ্নভাবেই জিজ্ঞাসা করে, "কী চাইছিস?" পরক্ষণেই তার মনে পড়ল আজ বাড়িতে মা নেই! তাড়াহুড়োর চোটে এ বেচারির বন্দোবস্ত করে যেতেই ভুলে গিয়েছেন বোধহয়। সে পাগলটার দু'চোখে স্পষ্ট খিদে দেখতে পায়। ও কোনও এক অসহায় যন্ত্রণায় দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অধিরাজের দিকে। কিছু বুঝি বলতে চায়, তবু বলতে পারছে না! অধিরাজ তার হাত ধরে ফেলে। লোকটার ঘামে ভেজা ঠান্ডা হাত তার হাতে সযত্নে টেনে নিয়ে নরম সুরে বলল, "খিদে পেয়েছে তোর? মা নির্ঘাৎ খাবার দেয়নি!"

লোকটা তার স্পর্শে যেন তড়িদাহতের মতো কেঁপে উঠল। তার চোখ সজল হয়ে ওঠে। আপ্রাণ কিছু যেন বোঝাতে চায় তার চাহনি। অধিরাজ টের পেল, ওর হাত দুটো তার সবল হাতের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে। এবং স্পর্শটাও অদ্ভুত। পাগলটার শীর্ণ হাত দুটো লোভীর মতো তার মসৃণ চামড়ার ওপর খেলে বেড়াচ্ছে! যেন উষ্ণতার ওম বুভুক্ষুর মতো

চেটেপুটে নিচ্ছে! লোকটা মহা আরামে চোখ বুজল। আঃ! কী গরম! অধিরাজ একটু বিস্মিত হয়েই জানতে চায়, “কী হল!”

লোকটা স্পর্শসুখ নিতে নিতেই আচমকা কেঁদে ফেলল। অসহায়, নীরব কান্না অশ্রু হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে তার দু'চোখ বেয়ে। অধিরাজ বিস্মিত। সে যেন ভুরু কুঁচকে কিছু বোঝার চেষ্টা করল। তারপরই মুখ ঘুরিয়ে গেট কীপারকে বলে, “ভেতর থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো তো! মা ওকে খেতে দেয়নি। বেচারা খিদের জ্বালায় কাঁদছে!”

গেট কীপার সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম তামিল করল। একটা থার্মোকলের বড় থালায় ভাত রুটি তরি-তরকারি নিয়ে এসে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাজির।

“নে। এটা ধর।” -

অধিরাজ উন্মাদ মানুষটার হাতে থালাটা ধরিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে গেটের ভেতরের দিকে পা বাড়াল। তার পেছন পেছন বাকিরাও। সে তখনও সেখানে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়েছিল। গেট কীপার ধমকে ওঠে, “ওয়ে পাগলা, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নিজের আস্তানায় যা!”

কম্বলধারীর চোখ দুটো আদুর হয়ে এসেছিল। ধমক শুনে এক মুহূর্তের জন্য সেই জলভরা চোখেই যেন দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গেট কীপারের দিকে! তারপর নীরবেই আস্তে আস্তে চলে গেল সেখান থেকে।

সে ধীর পায়ে রাস্তা ক্রস করল ঠিকই। কিন্তু ল্যাম্পপোস্টের তলায় ফিরে গেল না। বরং হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা দূরে। একটা নির্জন অন্ধকার আবর্জনাময় জায়গায়। সেখানে পূতি গন্ধময় আবর্জনার মধ্যে শুয়েছিল আরেকটা মানুষ। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, মানুষ নয়; নিস্পন্দ, নিথর একটি শীর্ণ মানুষের উলঙ্গ দেহ। মুণ্ডহীন নয়। তাই তার মুখের অবিন্যস্ত গোঁফদাড়ি স্পষ্ট বোঝা যায়। অবিকল এই ভিখিরিটির মতোই দেখতে! বুকের ওপর ছুরির ক্ষতের চিহ্ন। ভনভনিয়ে কতগুলো মাছি ছেঁকে ধরেছে লাশটাকে।

সে ভারী নিশ্চিন্তে সেই আবর্জনার ওপরই বসে পড়ল। আস্তে আস্তে খুলে ফেলল নকল দাড়ি, গোঁফ আর চুল। তারপর লাশটার মাথায় পরম আদরে হাত বুলিয়ে নীচু স্বরে বলল, “তুমি বড় ভালো মানুষ। তোমার নাম বাবু। তাই না?”

লাশ কোনও উত্তর দেয় না। তবু যেন মানুষটা উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করে। ফের আপনমনেই ফিক করে হেসে ফেলল, "না। তোমার মাথাটা কাটছি না। তুমি খুব ভালো মানুষ। নিজের জামা-কাপড় আমায় দিয়েছ। তোমার ভাগের খাবারটাও দিয়েছ। আরেকটা কাজ বাকি আছে। যদি তোমার বুকের ওপর একটা সুন্দর ট্যাটু করে দিই, কিছু মনে করবে না তো?" কেউ কোনও উত্তর দেয় না। শুধু একদল বুভুক্ষু মাছির ভনভন শব্দ।

আর কোনও শব্দ নেই! লোকটার মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ভেসে ওঠে। সে ঝুঁকে পড়ল লাশটার ওপরে। নিথর, আবর্জনামাখা দেহটার কপালে পরম আদরে একটা চুমু খেয়ে বলল, "গুড বয়!"

সে কম্বলের ভেতর থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করে হিংস্র হাসল, "কাউন্টডাউন বিগিনস!"

মৃত ব্যক্তির বুকের ওপর চলতে লাগল ছুরির নিষ্ঠুর কাটাকুটি। মাংস, চামড়া কাটার অদ্ভুত একটা ঘ্যাঁসঘ্যাঁস শব্দ যোগ হল মাছির ভনভনানির সঙ্গে। লাশের ওপরে রক্তে লেখা হল একটা সংখ্যা! দশ!

(৬)

"তোমার হাতে সময় খুব কম ব্যানার্জী !"

একটু আগেই ফোনে বলা এডিজি শিশির সেনের কথাটাই মাথার ভেতরে ঘুরছে! শিশির সেনকে গোটা ঘটনাই জানানো হয়েছে। সব শুনে তিনি একটাই বাক্য বলেছেন! -

বাবুর নগ্ন লাশটার দিকে অনিমেষে তাকিয়ে ছিল অধিরাজ। তার গোটা মুখে ইস্পাতের কাঠিন্য। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা দায়। সে দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। অধিরাজের বাড়িতেই আপাতত আস্তানা গেড়েছে গোটা সি আই ডি টিম। আর বাড়ির সবচেয়ে লম্বা হলঘরটাকে ডঃ চ্যাটার্জীর নির্দেশেই কাল রাতেই প্রায় ফরেনসিক ল্যাব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতত সেই অস্থায়ী ল্যাবের টেবিলের ওপরই শুয়ে আছে বাবু। আহেলি পেশাগত দক্ষতায় তাকে পরীক্ষা করে দেখছে।

অধিরাজের চোখে বেদনা প্রকট হয়ে ওঠে। বাবু তার আপন কেউ ছিল না। কখনও মানুষটাকে ঠিকমতন লক্ষ্যও করে দেখেনি। কিন্তু কোথাও একটা মানবিক স্নেহ ছিল এই হতভাগা পাগল মানুষটার ওপর। ওর অসহায় অবস্থার জন্য অনেকখানি করুণাও ছিল। সর্বোপরি, মা ওকে ভালোবাসতেন। তার জন্য সে স্বকীয় ভঙ্গিতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত। কখনোই ওকে কারোর সঙ্গে ঝামেলা বা ঝগড়া-ঝাঁটি করতে দেখা যায়নি। ও পাগল হলেও হিংস্র ছিল না। বরং উল্টোটাই। খুব শান্ত। কোনওরকম সাতে-পাঁচে থাকত না সে।

অথচ সেই বাবুর এমন পরিণতি! আজ ভোরে কে যেন ওর লাশটা এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে একেবারে অধিরাজের বাড়ির সামনে। নিরাপত্তারক্ষীরা সারা রাত পাহারা দেওয়ার পর ভোরের দিকে হয়তো একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। সেই ফাঁকেই ওর মৃতদেহটাকে ডাম্প করেছে খুনী। বুকের ওপর মাংস গভীরভাবে কেটে দিয়ে বড় করে লিখে গিয়েছে, 'দশ'। অর্থাৎ কাউন্টডাউন শুরু হল!

– "কমপ্লিট রিগর মর্টিস।" বাবুর দেহটাকে গ্লাভস হাতে পরীক্ষা করে দেখছিল আহেলি মুখার্জী, "রিগর মর্টিস একদম পিকে আছে। কমপক্ষে বারোঘণ্টা আগে মারা গেছে।"

অর্ণব আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন সকাল ছ'টা। তার মানে কাল সন্ধ্যেবেলাতেই খুন হয়ে গিয়েছিল বাবু! তাহলে প্রায় মাঝরাতে যে লোকটা খাবার চাইতে এসেছিল সে কে!

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই অবশ্যম্ভাবীভাবেই যে উত্তরটা মনে এল তাতে যেন এগারোশো ভোল্টের ইলেক্ট্রিকের ছ্যাঁকা! খুনী এতগুলো সি আই ডি অফিসারের উপস্থিতিতেই দিব্যি অধিরাজের সামনে এসে, তাকে রীতিমতো স্পর্শ করে চলে গেল। অথচ ওরা কেউ বুঝতেই পারেনি! এমনকী স্বয়ং অধিরাজও বোঝেনি যে ওটা আদৌ বাবু নয়; বরং অন্য কেউ! সে যদি সেই মুহূর্তে একটা ছুরি বের করে অধিরাজের বুকে বসিয়ে দিত, তবে কারোর কিচ্ছু করার ছিল না!

সে অফিসার পবিত্র আচার্য'র দিকে আড়চোখে তাকায়। সম্ভবত এই কথাটা পবিত্রও ভাবছিল। দু'জনের মধ্যে নীরব দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। অর্ণব স্পষ্ট দেখল, জীবনে প্রথম বার পবিত্র'র চোখে ভয় আর আফসোসের মিশ্রণ! বত্রিশ বছর আগে যে সাইকো কিলারের তান্ডব হঠাৎই থেমে গিয়েছিল, আবার সেই দানবীয় হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গেল। বাবুর খুনটা শুধু খুন নয়; গোটা সি আই ডি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের গালে জোরালো এক থাপ্পড়! একটা নিরীহ পাগলকে খুন করে খুনী প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে সে ঠিক কতখানি নিষ্ঠুর। প্রমাণ করে দিল, ইচ্ছে করলেই দশম ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে সর্বসমক্ষে খুন করার ক্ষমতা তার আছে। আদৌ গত বত্রিশ বছরে সে মারা যায়নি অথবা তার শক্তিক্ষয় হয়নি। বরং অপরাধী যে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, বাবুর লাশটাই তার প্রমাণ। খুনী তার অস্তিত্ব ভয়ঙ্করভাবে জাহির করে গেল; অথচ ওরা কেউ কিচ্ছু করতে পারল না!

প্রচণ্ড আফসোসে চোখ বুজল অর্ণব। বিরাট ভুল হয়ে গিয়েছে! তার অধিরাজকে অরক্ষিত রাখাই উচিত হয়নি। এখনও তদন্ত শুরুই হল না, অথচ খুনী এর মধ্যেই একটা পিট্ জিতে নিয়েছে। কিছু করা বা বোঝার আগেই সে তার কাউন্টডাউন শুরু করে দিল। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয় অর্ণবের।

"তার মানে কাল রাতে যে লোকটা এসেছিল সে...!"

পবিত্র'র অনুচ্চারিত প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করে দিল অধিরাজ, "তিনি স্বয়ং আমাদের 'সার্জিক্যাল স' কিলার ছিলেন।"

"কিন্তু তুমি বুঝতে পারলে না রাজা?" পবিত্র গম্ভীরভাবে বলল, "তুমি তো বাবুকে চিনতে। অনেকদিন ধরে দেখছ। পার্থক্যটা বোঝোনি?" অধিরাজ রাগত উষ্ণ দৃষ্টিতে পবিত্রকে দেখে নেয়, "প্রথমত রাতের ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কোনও মানুষের মুখই পুরোপুরি দেখা যায় না। তার ওপর ওর মুখের চেয়ে দাড়ি গোঁফের জঙ্গলই আমার চোখে বেশি পড়ত। অ্যান্ড আই অ্যাডমিট, ওকে আমি কখনও তেমন করে খুঁটিয়ে দেখিনি। আই মিন দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি। ওর ঐ একটাই জামা ছিল, আর একটাই কম্বল! সেটাই ওর সবচেয়ে বড় পরিচয়; অন্তত আমার কাছে। এবং আমি সত্যিই ভাবতে পারিনি যে ব্লোটা এদিক দিয়েও আসতে পারে।" - অত্যন্ত সৎ স্বীকারোক্তি। পথে ঘাটে, ফুটপাথে কত পাগলই তো বসে থাকে। কে তাদের মুখের দিকে ঠিকমতো তাকিয়ে দেখে, মনে রাখা তো দূর! আর যে খুনী এত বড় বড় প্রোফাইলের লোককে খুন করেছে, সে যে একজন নিরীহ সামান্য ভিখিরিকে খুন করবে, তা বোধহয় সবারই ভাবনা-চিন্তার বাইরে!

ভাবতেই অধিরাজের কপালে ফের অসন্তোষের ছাপ! কিন্তু এখানে তো ভিকটিমের শিরচ্ছেদ হয়নি! সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে কি না তা বোঝা মুশকিল। তবে এখানে আর্টারিও কাটা হয়নি। সার্জিক্যাল স-এর ব্যবহার যার সিগনেচার, সে হঠাৎ প্যাটার্ন চেঞ্জ করল কেন! সে সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে আহেলির দিকে তাকায়। "মার্ডার ওয়েপন, শার্প অবজেক্ট! প্রব্যাব্লি ছুরি। তবে বেশ চওড়া।"

আহেলি তার বক্তব্য পেশ করল, "ক্ষত যথেষ্টই গভীর। তবে মার্ডারার বেশ ওস্তাদ লোক। মাল্টিপল স্ট্যাবিং হয়নি। একবারেই হার্ট এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। অটোপ্সি হলে ডঃ চ্যাটার্জী আরও ডিটেলে বলতে পারবেন।"

"হুঁ।" অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক, "এনি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট?" অধিরাজ প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে তাকিয়েছে আহেলির দিকে। আহেলি মিটিমিটি হেসে এক্সপ্লেইন করে, "তিনি কোল্ড ক্রিম ইউজ করেন!" -

"আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছু বলা যাচ্ছে না। প্রাইভেট পার্টসে আমি অন্তত বাইরে থেকে কোনওরকম সিমেন ট্রেস পাইনি। ইন্টারন্যালি কিছু হলে এখন বলতে পারব না, তবে পোস্টমর্টেম হলে বোঝা যাবে। বাট..."। আহেলি অধিরাজের চোখে চোখ রেখে জানায়, "আপনার খুনী বেশ শৌখিন লোক!" উপস্থিত তিন পুরুষ অফিসারেরই চক্ষু চড়কগাছ। অধিরাজের মুখে কাঠিন্যের জায়গায় ফুটে উঠেছে অগাধ বিস্ময়! সে বেশ কৌতূহলী হয়ে বলে,"কীভাবে বুঝলেন?"

"লোকটার কপালটা দেখুন।" -

"আমি তো পচা বাঁধাকপির পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখছি না!" আহেলি বাবুর কপালের একটা অংশ নির্দেশ করে, "এখানে পচা চিংড়ি আর বাঁধাকপি ছাড়াও একটা অন্য খুব হাল্কা স্মেল আছে। তাই আমি ওখানকার কিছু স্কিন স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করেছি।" সে একবার চুপ করে থেকে উপস্থিত সবার মুখের দিকে, বিশেষ করে অধিরাজের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "স্কিন স্যাম্পলে বিসওয়াক্স, পলিগ্রিসেরিল, গ্লিসারিনের ট্রেস আছে। নিঃসন্দেহে কোল্ডক্রিম। এবং সেই কোল্ডক্রিমে অ্যাকোয়া, ক্যাপ্রিলিক ট্রাইগ্লিসারাইড, পলিগ্রিসেরিল, গ্লিসারিন, হাইড্রোজেনেটেড কোকোনাট অয়েল, বিওয়াক্স এবং সানফ্লাওয়ার সিড অয়েলের মলিকিউল পেয়েছি। এই জাতীয় কম্বিনেশন সাধারণ কোল্ডক্রিমে থাকে না।

অধিরাজ সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল। আহেলি এবার খুলে বলে, "সাধারণ কোল্ডক্রিমে বিস্ওয়াক্স থাকে ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে মিনারেল অয়েল, সেরাসিন, ট্রিথানোলামাইন, বেহেনিক অ্যাসিড, সিটাইল অ্যালকোহল জাতীয় পদার্থও থাকে যার একটাও এখানে নেই। সুতরাং এই বিশেষ কম্বিনেশন যুক্ত কোল্ডক্রিমটি হল বেবি কোল্ডক্রিম।

অধিরাজের মুখ দেখে মনে হল সার্জিক্যাল স'টা খুনী নয়, আহেলিই তার মাথায় বসিয়েছে। এরকম নৃশংস একটা খুনী কিনা জনসনস্ বেবি ক্রিম মাখে!

"শুধু তাই নয়, কোনও কারণে সে ভিকটিমের কপালে মুখ ঠেকিয়েছিল। আই থিঙ্ক হি কিসড্ হিম!"

"অ্যা!" অর্ণবের মুখ থেকে অতর্কিতে - শব্দটা বেরিয়েই গেল। অধিরাজ একটু যেন বিরক্ত হয়েই তাকায় তার দিকে, "একজন রুথলেস খুনীর কাছ থেকে তুমি বেটার কিছু আশা করো? তার যা চরিত্র দেখা যাচ্ছে তাতে এটাই স্বাভাবিক। আমি আশ্চর্য হব না যদি সেক্সুয়াল অ্যাসল্টও হয়ে থাকে।"

অর্ণব ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। অধিরাজ একটু বিষণ্ন দৃষ্টিতে বাবুর মৃতদেহের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আহেলি এবার পবিত্র আচার্য'র দিকে ফিরেছে, "অটোপ্সির জন্য বডি ল্যাবে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছেন?"

"হ্যাঁ। অ্যাম্বুলেন্স অন দ্য ওয়ে।"

"ওকে"। আহেলি হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে বলল, "এখানে আর আপাতত কিছু করার নেই। দেখা যাক স্যার কী রিপোর্ট দেন।"

"ওকে। ফাইন।" -

পবিত্র আর কথা না বাড়িয়ে মেইন হল, অর্থাৎ অধুনা অস্থায়ী ফরেনসিক ল্যাব থেকে বেরিয়ে এসে বসার ঘরে এল। তার পেছন পেছন অর্ণবও। অধিরাজ একটা বড় সোফায় চুপ করে বসে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। সামনের বড় টেবিলে কেস ফাইলটা চিত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার সেদিকে লক্ষ্য নেই। অর্ণব বুঝতে পারে, ঐ পাগল মানুষটার মৃত্যু সে মনে মনে মেনে নিতে পারছে না।

ও আস্তে আস্তে গিয়ে অধিরাজের পাশেই বসে পড়ল। নীচু স্বরে কিছু বলতেও যাচ্ছিল। তার আগেই বাধা। একখানা শ্যামলা রঙের মেয়েলি হাত দু'জনেরই নাকের কাছে একখানা ট্রে তুলে ধরেছে। সঙ্গে শোনা গেল একটা মিষ্টি স্বর।

"চা রেডি।"

অধিরাজ যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেল। একটু বিস্মিত হয়েই বলল, "চা! কে বানাল! এখনও তো হিস্টো আসেনি!"

"আমি বানিয়েছি"। মেয়েটি একটু থমকে গিয়ে বলে, "কিন্তু হিস্টো"

"আমাদের কুক"। অধিরাজ একটু উদাসীন ভঙ্গিতেই জানায়, "তাকে কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবেন। দেখলে মনে হবে মোগলাই ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে। কমপ্লিট হিস্টিরিক্যাল ও হিস্টোরিক্যাল। তারই শর্ট ফর্ম, হিস্টো!"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। অবিকল পাহাড়ি ঝর্ণার মতো সাবলীল ও সুরেলা। অর্ণব সকৌতূহলে ট্রে' ধরা মূর্তিটির দিকে তাকায়। মিস্ আত্রেয়ী দত্ত। নতুন লেডি অফিসার। কাল রাতেই একঝলক দেখা হয়েছে। তবে ভালো করে লক্ষ্য করেনি। আজ দিনের বেলায় ঠিকভাবে চোখে পড়ল।

মিস দত্ত'র বয়েস সাতাশ কী আঠাশ হবে। শ্যামলা রঙের ছিমছাম নাতিদীর্ঘ চেহারা। উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। পাতলা কাঠামো। কিন্তু মুখখানা ভারী লাবণ্যময়। নাক, মুখের ডৌল বিচার করলে তাকে মারকাটারি সুন্দরী বলা যায় না। তবু লালিত্যে ঢলঢল করছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার চোখ দুটো। বড় বড়, টানা টানা ও কাজল কালো।

মেয়েটি হাসল, সঙ্গে তার চোখজোড়াও বুঝি হেসে উঠল, "চা নেবেন না স্যার?"

অধিরাজ ফের অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এবার একটু মৃদু হেসে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস! মিস... অর্ণব?"

অর্ণব চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে রামবিষম খায়! বেচারির মুখ থেকে গরম চা জামাকাপড়ে ছিটকে গেল। সেরেছে! স্যার ফের গুলিয়েছেন!

"মিস অর্ণব?" আত্রেয়ী দত্ত ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "না না! অর্ণব তো উনি! আমি আত্রেয়ী। আত্রেয়ী দত্ত!" -

অধিরাজ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করল, "থ্যাঙ্কস মিস্ দত্ত।"

"আত্রেয়ী?" -

অর্ণব মনে মনে প্রমাদ গোনে। এ মেয়ে তো বেশ ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস! দত্তই মনে থাকে না। আত্রেয়ীর ঠ্যালা সামলাতে পারলে হয়! সে আড়চোখে দেখে, অধিরাজ একটু অপ্রস্তুত হেসে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। অর্ণব হাড়ে হাড়ে এ লক্ষণ চেনে। অর্থাৎ, দত্ত অবধিই ঠিক আছে। 'আত্রেয়ী' যথারীতি বাবা আদমের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের কক্ষপথে বিলীন হল!

"আপনি চা বানাতে জানেন?" অর্ণব খুব সরলভাবেই প্রশ্নটা করেছিল। সচরাচর এর আগে যেসব লেডি অফিসারদের সঙ্গে তার মোলাকাত হয়েছে, তারা কখনও ওকে চা বানিয়ে খাওয়াননি। তাই নিতান্তই কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করে বসে।

কিন্তু আত্রেয়ী উত্তর দেওয়ার আগেই ফ্যাঁচ করে উঠল আহেলি, "কোনও সন্দেহ আছে?"

অর্ণব এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কেন?"

-"চোখের সামনে দেখছেন কাপে চমৎকার দার্জিলিং টি সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। শুনছেন অফিসার ব্যানার্জীর কুক এখনও এসে পৌঁছননি। নাকের সামনে ট্রেটা ধরে আছেন মিস দত্ত। অফিসার ব্যানার্জী, অফিসার আচার্য আর আপনি চা বানাতে জানেন না। আমি এতক্ষণ ফরেনসিক ল্যাবে ছিলাম, এবং রান্না করতে জানি না।" আহেলি দস্তুর মতো খ্যাঁক করে উঠল, "তাহলে চা'টা বানাল কে? ভূতে?"

পবিত্র ফিসফিস করে বলল, "অর্ণব! বি ওয়্যার! চাইনিজের বদলা কিন্তু শুরু হল।"

অর্ণব ঢোঁক গিলে কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল তার আগেই অধিরাজ বিরক্তিমিশ্রিত দৃষ্টিতে কটমট করে আহেলির দিকে তাকিয়েছে, "ভূতে চা বানিয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জীর মেজাজের ভূত যে আপনার চড়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"

ঘাড়ে আছোলা বাম্বু খেয়ে আহেলি চুপ করে গেল। কিন্তু অর্ণবের দিকে একটা হিংস্র দৃষ্টি ছুঁড়ে দিতে ভুলল না! এবার প্রতিশোধকামী অরুণা ইরানি! পবিত্র গুজগুজ করে, "বেশ হয়েছে!"

ফের "তবে জনসনস বেবি ক্রিমের লিডটা ব্রিলিয়ান্ট।" এবার অধিরাজের চোখে প্রশংসা, "গুড জব মিস মুখার্জী।" -

মুহূর্তের মধ্যে আহেলির প্রখর চাউনি নরম হয়ে এল। তার গালে সামান্য রক্তিমাভা। মাথা নীচু করে বলল, "থ্যাঙ্কস স্যার।"

দেখা গেল এই ভাবান্তরটা শুধু একা অর্ণবের চোখে নয়, আত্রেয়ী দত্ত'র চোখেও পড়েছে। অর্ণব দেখল লেডি অফিসার মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছেন। এ মেয়েরও হবে!

শুধু স্যারেরই হল না!

“এ কীরকম মার্ডারার রাজা!” পবিত্র বলে ওঠে, “ন’খানা লাশ যে ফেলে দেয়, একটা নিরপরাধ ভিখিরিকে যে শুধুমাত্র একটা কাউন্টডাউন বোঝানোর জন্য খুন করে দেয়, সে লোকটা জনসনস বেবি ক্রিম মাখে! এ কী জাতীয় লোক!” -

অধিরাজের মুখে চিন্তার ছাপ, “এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছ? লোকটা কাল যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন একটা অদ্ভুত পরিচিত গন্ধও পেয়েছিলাম। ঐ মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি কারণ আমার কনসেনট্রেশন ওদিকে ছিল না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ওটা জনসনস বেবি পাউডারের গন্ধ ছিল। ও নির্ঘাৎ জনসনস বেবি সোপও মাখে। আমি খুব আশ্চর্য হব না যদি লোকটা নিয়ম করে কার্টুনও দেখে!”

“জনসন বেবি পাউডার বা সোপ তো বুঝলাম! কিন্তু কার্টু-ন!” পবিত্র মাথাটা সজোরে ঝাঁকিয়ে নিল, “কী বলছ! ‘সার্জিক্যাল স’ কিলার শিচ্যান, ডোরেমন দেখে!” -

“শিনচ্যান, ডোরেমন দেখে কিনা জানি না, কিন্তু কী দেখে তা বলতে পারি।”

- “ভাই রাজা!” সে হাতজোড় করে ফেলেছে, “তুমি কীভাবে দিব্যচক্ষু গজিয়েছ জানি না; কিন্তু আমাদের যে মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে! একটু এক্সপ্লেইন করবে প্লিজ?”

“অ্যাজ ইউ উইশ।”

অধিরাজ বুক পকেটে হাত দেওয়ার আগেই খপ্ করে তার হাত ধরে। ফেলেছে অর্ণব। আলতো করে মাথা নেড়ে ইশারায় বলল, না! সে অগত্যা বাধ্য ছেলের মতো হাত সরিয়ে নিয়েছে। একটু হেসে বলল, “এইমাত্র অর্ণব আমার হাত ধরল দেখলে? ও আমার হাত টাচ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওর স্কিনটা ফিল করতে পারি। অর্ণবের হাত রাফ। ছেলেদের যেমন রুক্ষ স্কিন হয় আর কী! তেমনই কাল খুনীও আমার হাত ধরেছিল।”

“তার থেকে প্রমাণ কী হয়? সে কার্টুন দেখে?” -

– “না”। অধিরাজ মুচকি হাসল, “তার হাত ধরে আমার একটুও সন্দেহ হয়নি, কারণ তার হাতও রুক্ষ ছিল। বাবুর মতো তার হাতও যথেষ্টই খসখসে, রাফ। নরম কোমল বেবি স্কিন নয়। সে গালে নকল, গোঁফ দাড়ি লাগিয়েছিল, এবং অনেকক্ষণ সেই অবস্থাতেই বসে ছিল। কারণ সচরাচর বাবু সন্ধ্যে সাতটা থেকেই ল্যাম্পপোস্টের তলায় বসে। লোকটা

সেটা জানত। এবং সম্ভবত সে সন্ধ্যে সাতটা থেকেই ওখানে বসেছিল। কারণ আমার গেট কীপাররা কিন্তু বাবুকে যথাসময়েই দেখেছে। অ্যাকর্ডিং টু মিস্ মুখার্জী, তার অনেক আগেই বাবু মারা যায়। যদি লোকটা সাতটা থেকে মধ্যরাতেরও বেশি সময় অবধি ওখানে দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে বসে থাকে তার মানে তার সেন্সিটিভ স্কিনও নয়!"

– "ডার্মাটোলজির সঙ্গে কার্টুনের কী সম্পর্ক?" পবিত্র বিরক্ত হয়ে বলে, "ওর স্কিন টাইপ জেনে কোন্ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হবে!" "যদি তার বেবি স্কিন বা সেন্সিটিভ স্কিন না হয়ে থাকে, তবে সে বেবি কোল্ড ক্রিম মাখে কেন? বেবি পাউডার কেন? সচরাচর তারাই বেবি ক্রিম ইউজ করে যাদের বাচ্চাদের মতো একদম সফ্ট আর সেন্সিটিভ স্কিন থাকে; যার কোনটাই ওর নেই। বেবি স্কিন যে নয়, তা হাতের স্পর্শেই বোঝা যায়। লোকটার মুখে মেক-আপ ছিল। কিন্তু হাতের পাতায় নিশ্চয়ই মেক-আপ করেনি। আর যে লোক গালে আঠা লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে বসে থাকে; তার সেন্সিটিভ স্কিন হতেই পারে না। সেন্সিটিভ স্কিন হলে অতক্ষণ গাম লাগিয়ে বসে থাকতেই পারবে না। তবে সে জনসনস্ বেবি ক্রিম মাখছে কেন?"

পবিত্র ভুরু কুঁচকে তাকায়। তার মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট যে গোটাটাই স্যাটেলাইটের আওতা ফস্কে চলে গিয়েছে। অধিরাজ এবার চরম বিরক্ত হয়ে বলে, "সরি অর্ণব! পবিত্র'র মুখ দেখে আমারই ফ্রাস্ট্রেটেড লাগছে। ও নাকি আমায় হেল্প করবে! প্লিজ, একটা সিগারেট...!"

অর্ণব আধখানা চোখ করে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই লোকটার শুধু একটা ছুতো চাই সিগারেট খাওয়ার। এতদিন ধরে কী করে যে সামলাচ্ছে তা শুধু সে আর ভগবানই জানেন! তবে এবার হয়তো একটা স্টিক না দিয়েও উপায় নেই। বাবুর লাশটা দেখে যেরকম জোরদার ধাক্কা খেয়েছিলেন, সেই ট্রমা থেকে যে বেরিয়েছেন এই রক্ষে। সে চোখ সরু করে বলল, "একটা মানে কিন্তু একটাই।"

"ইয়েস বস্।" -

মুহূর্তের মধ্যেই এসে গেল ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট। অধিরাজকে একটা স্টিক দিয়ে বাকিটা নিজের পকেটে পুরে রাখল অর্ণব। ভরসা নেই। সামলে না রাখলে কয়েক ঘণ্টার

মধ্যেই গোটা প্যাকেট উড়ে যাবে।

নিজের অত্যন্ত প্রিয় ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ইন্ডাকশন লাইটারটা খুঁজে নিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে আস্তে সুখটান মারল অধিরাজ, "ওঃ! ফিলিং বেটার! কী বলছিলাম?"

"রাফ স্কিন, বেবি স্কিন, সেন্সিটিভ স্কিন।" পবিত্র'র গালে মৃদু হাসির সঙ্গে হাল্কা টোল পড়ে, "ডার্মাটোলজি?" -

-"ইয়েস। লোকটার না বেবি স্কিন, না সেন্সিটিভ স্কিন। কোনও অ্যাডাল্ট পুরুষের স্কিনে বেবি ক্রিম কাজ করে না। তবে সে জনসনস বেবি ক্রিম মাখে কেন? বেবি পাউডারই বা মাখছে কোন্ আনন্দে?" -

- "তাকেই জিজ্ঞাসা করো! আমি কী করে জানব!" সে বিরক্ত, "আমার সঙ্গে কনসাল্ট করে থোড়াই মাখে!"

অধিরাজ অবলীলায় একটা রিং ছেড়ে বলল, "কারোর সঙ্গে কনসাল্ট করেই মাখে না। লোকটা যে স্বাভাবিক নয় তা তো মানবে?"

"মানছি।" -

– "তবে এত কিছু থাকতে জনসনস বেবি ক্রিম, বেবি পাউডার কেন তার চোখ দুটোয় যেন অতলান্তিক গভীরতা, "বেবি ক্রিম, বেবি পাউডার মানে লোকটার মনের মধ্যে এখনও একটা শিশু জেগে আছে। কাল লোক যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল তখন ওর চোখে একটা শিশু অসহায়তা দেখেছি আমি। হি ওয়াজ ক্রাইং লাইক আ বেবি! ও যত নৃশংস খুনীই হোক না কেন, ওর মন শৈশবের কোথাও আটকে গিয়েছে যেখা থেকে বেরোতে পারছে না। হি ইজ ক্রুয়েল লাইক আ চাইল্ড!"

– "ক্রুয়েল লাইক আ চাইল্ড! ক্রুয়েল লাইক আ টাইগার শুনেছি রাজা - কিন্তু চাইল্ড!"

পবিত্র প্রায় হেঁচকি তোলে। অধিরাজ সযত্নে ইন্ডিয়া কিংসে আরেকট টান মারল, "তোমার কী ধারণা? শিশুরা শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ, সাধারণভাবে আমরাও শিশুদের মধ্যে নিষ্পাপ কোমল ঈশ্বরকেই দেখি কোনও শিশুই জন্ম থেকে ক্রুয়েল হয় না। কিন্তু যদি কোনওরকমভাবে মানসিক বিকৃতি শৈশবকে অভিশপ্ত করে তোলে; তবে নিষ্ঠুরতায় সে শয়তানকেও টেক্কা দেয়। শিশুর মতো নিষ্পাপ কেউ হয় না। শিশুর মতো নিষ্ঠুরও কেউ

হয় না। কারণ তুমি একটা বিড়ালকে শীতের মধ্যে ঠান্ডা জলে ফেলে দিতে পারবে না, একটা কুকুরের লেজে চীনেপটকা বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিতে পারবে না, একটা প্রজাপতিকে সূঁচের খোঁচা দিতে পারবে না কিংবা একটা ফড়িঙের দুটো ডানা পটাং করে ছিঁড়ে দিতে পারবে না। বাচ্চারা যেরকম অকারণে নিষ্ঠুর 'বুলিং' করে তাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একটা বাচ্চার পক্ষে সম্ভব! কেন?"

- "কেন?"

"মিস্ মুখার্জী।" অধিরাজ আহেলির দিকে তাকায়, "প্লিজ, বিজ্ঞানের পরিভাষায় একটু বলুন।"

আহেলি এতক্ষণ চুপ করে অধিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনছিল। এবার সুযোগ পেয়ে বলল – "কারণ অ্যাকর্ডিং টু সায়েন্স, হিউম্যান প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স, যেটা ইমপাল্স্ কন্ট্রোল, অ্যাটেনশন, লজিক্যাল আর অর্গানাইজড্ থিঙ্কিংকে রেগুলেট করে, সেটা শৈশবে ডেভলপ করে না। তার মানে শিশুদের যে ব্রেন অপারেট করে সেটা রিলেটিভলি প্রিমিটিভলি ইকুইপ্ড্ ব্রেইন, রেপটিলিয়ান ব্রেইন অথবা লিম্বিক ব্রেইন। যদি খটোমটো শব্দগুলোকে বাদ দিই তবে সহজ ভাষায় শিশুদের পরিচালিত করে বেসিক ইমপাল্স্, এবং বেসিক আইডিয়া অব সার্ভাইভাল। অর্থাৎ কেউ যদি তাকে ঘুঁষি মারে, সে ভাবতে বসবে না যে পালটা মারলে আমার জেল হবে কি না। হয় সে ব্যথায় কাঁদবে, নয়তো পালটা দুটো ঘুঁষি মারবে। ওদের লজিক আমাদের থেকে অনেক সহজ কারণ ওরা বেশি ভাবনা-চিন্তাই করে না। কেউ আমার ওপর টর্চার করছে; আমি তাকে মেরে ফেলব! বিড়ালটা আমায় আঁচড়ে দিয়েছে, ওকে জলে ফেলে চোবাবো। গোলাপটা পছন্দ; ওটার গাছের গোড়ায় জল ঢালতে বয়েই গেছে, স্রেফ ছিঁড়ে, মুচড়ে তুলে নেব এবং দশ মিনিট পরেই ফুলের দফারফা করে ছাড়ব। পুতুলটা যদি আমার বোন নিয়ে নিতে চায়, সেটার মুণ্ডু ভেঙে দেব; পুতুলটার যা খুশি হোক, কিন্তু আমারই তো রইল। ব্যস, ঝামেলা চুকে গেল। এটাই হল চাইল্ড সাইকোলজি। আর রিসার্চ বলছে বেশির ভাগ সাইকোপ্যাথেরই চাইল্ড সাইকোলজি আছে।"

"কিন্তু খুনী তো যথেষ্টই অর্গানাইজড! তোমরা বলতে চাও, একটা শিশুর মস্তিষ্ক নিয়ে সে ন'টা লোককে রেপ-মার্ডার করেছে! দশ, নয়, আট, সাত করে কাউন্টডাউন করছে! ইম্পসিবল!"

— "ওঃ!" অধিরাজ শান্তভঙ্গিতেই বিরক্তি প্রকাশ করে, "খুনীর মস্তিষ্কটা শিশুর মতো নয়। সে একজন পরিপূর্ণ মস্তিষ্কওয়ালা মানুষ। কিন্তু তার মধ্যে একটা শিশুর মন এখনও রয়েছে। মিস্ মুখার্জী এত সুন্দর এক্সপ্লেইন করলেন, তাও বুঝলে না? খুনী বুদ্ধিমান এবং নিষ্ঠুর হলেও 'শিশুসুলভ'। ওকে চাইল্ড সাইকোলজি ডমিনেট করে। নয়তো এত কিছু থাকতে সে এখনও জনসনস বেবি ক্রিম, বেবি পাউডার আঁকড়ে পড়ে থাকত না। ও এখনও নিজেকে একটা শিশুই ভাবে। এটুকু বুঝেছ?"

"বেবি ক্রিম যদি বা বুঝলাম; শিচ্যান্ ডোরেমন যে -অথৈ জলে।" - "শিনচ্যান্ বা ডোরেমন্ বলিনি আমি। বলেছি কার্টুন। বাচ্চারা কার্টুন দেখতে ভালোবাসে। আর আমাদের অপরাধীকে দেখো। তার প্যাটার্নটা সম্পূর্ণ আলাদা। সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে একদমই পছন্দ করে না। বরং রীতিমতো প্রকাশ্যে চোর-পুলিশ খেলে। পাঁচটা লোককে সে ভোগ করেছে; বুঝলাম। খুন করেছে; তাও বুঝি। কিন্তু ডাম্প করল কোথায় দেখো! একেবারে পুলিশ স্টেশনের সামনে! মাথায় হাঁড়ি চাপিয়ে আবার 'গেস হু' লিখেছে! এ তো রীতিমতো ওপেন চ্যালেঞ্জ। এবং তারপর একের পর এক ইনভেস্টিগেটিং অফিসারদের ফলো করা, কাউন্টডাউন করা ও খুন করা। তাদের ড্রাগ দিয়ে অবশ করে দেওয়া ও একের পর এক শিরা কেটে দেওয়া! মানেটা কী? একটা স্ট্যাব করলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু না, অত সহজ খুনে সে সন্তুষ্ট নয়। খুনীর অ্যাঙ্গেল থেকে দেখো। তার স্টাইল কিছুটা ভিকটিম জানতে পারছে তার সঙ্গে কী হতে চলেছে, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছে না। চ্যালেঞ্জ! তথাকথিত শক্তিশালী লোকগুলো দেখছে, বুঝছে যে তাদের ওপর কী টর্চার হচ্ছে। বাট্ হেল্পলেস! ঠেকানোর ক্ষমতা নেই।" অধিরাজ একটু থেমে সিগারেটের ছাইটা অ্যাশট্রেতে ঝাড়ল, "বত্রিশ বছর পরেও অ্যাটিটিউডটা দেখো। বাবুকে খুন করে 'দশ' লিখে ফেলে দিয়ে গেলেই তো হত। আমার সামনে আসার দরকারটা কী ছিল? কিন্তু সে জানান দিয়ে গেল; এই যে দেখো, আমি তোমার নাকের সামনে দিয়েই একটা খুন করে

পালিয়ে গেলাম, তুমি কী করতে পারলে? ও আমাকে ইরিটেট করতে চাইছে। খোঁচাচ্ছে। এরমধ্যে ছোটবেলার কোনওরকম খেলার প্যাটার্ন এরকম; পাচ্ছ না?"

— "কুমীর-ডাঙা!" অর্ণব অস্ফুটে বলল, "কুমীরকে এদিক ওদিক দৌড় করানো। - নাকের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া"।

– "ব্রিলিয়ান্ট অর্ণব।" অধিরাজ অর্ণবের পিঠ চাপড়ে দেয়, "কুমীর ডাঙাই বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্টুনে এই চেজিংটা কুমীরের মাধ্যমে দেখানো হয় না! পৃথিবীতে একটাই 'শো' যুগ যুগ ধরে এরকম উদ্ভট চেজিঙের জন্য বিখ্যাত যেখানে তথাকথিত শক্তিশালী বারবার দুর্বলের কাছে অসহায়ভাবে হেরে যায়। আমাদের খুনীর সেটা ফেভারিট শো হওয়া অস্বাভাবিক নয়; অ্যাট লিস্ট আমি তার জায়গায় থাকলে ওটাই দেখতাম।" এতক্ষণে মিস্ আত্রেয়ী দত্ত মুখ খুলল, "টম্ অ্যান্ড জেরি!"

"এজ্যাক্টলি মিস্ ঘোষ।"

অর্ণবের এবার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করে। সে কোনও মতে বলল "ঘোষ নন্ স্যার, মিস্ দত্ত!" -

"উনি মিস্. . . ." অধিরাজ একটু চিন্তিত হয়ে বলে, "কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে ওনার নাম মিস ঘোষই! আগের কেসেও তো ছিলেন। ইয়েস, আই ক্যান রিমেম্বার। মিস্ ঘোষই।"

"তবু ভালো অন্তত কোনও লেডি অফিসারের নাম তোমার মনে আছে রাজা।" পবিত্র হাসছে, "মিস্ ঘোষের বাঁধানো কপাল। কিন্তু ইনি মিস্ ঘোষ নন।" -

''মিস্ ঘোষ নন্?" অধিরাজ পুরো কনফিউজড, "তাহলে তিনি গেলেন কোথায়!"

অবস্থা শোচনীয় দেখে এবার অর্ণবই হাল ধরল, "স্যার, মিস্ ঘোষের ট্রান্সফার হয়ে গেছে। আপনার মনে নেই? ইনি মিস্ দত্ত। মিস্ আত্রেয়ী দত্ত। আমাদের ইনভেস্টিগেটিং টিমের নতুন সদস্যা!"

-"আরে, লেডি অফিসাররা এরকম কথা নেই বার্তা নেই, আচমকা পালটে যাচ্ছেন কেন! আগে গুপ্ত, বোস না কী যেন ছিলেন। তারপর ঘোষ এলেন, এখন আবার দত্ত!" অধিরাজ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়ে রেগে গেল, "কতজনের নাম মনে রাখব? কী আশ্চর্য! তুমি

পাল্টাও না, পবিত্র পালটায় না, দুর্বাসা, মিস্ মুখার্জী পাল্টান না, এমনকী মিস্ নরমুন্ডও পাল্টান না; -তবে লেডি অফিসাররা এভাবে পালটে যাবেন কেন? আমি কি কেসফাইল ছেড়ে প্রতি কেসে লেডি অফিসারের নাম মুখস্থ করব?”

অর্ণব কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। আত্রেয়ী ফিক্ করে হেসে ফেলল। অধিরাজ কিছুক্ষণ বিরক্তিতিক্ত মুখ করে বসে থেকে বলল, “অর্ণব, যেহেতু মিস দত্তর পোস্টিং তোমার আন্ডারে সুতরাং দয়া করে দেখো, যেন পরের কেসে ওনার বদলে আবার কোনও ঘোষ-বোস-গুহ-মিত্র না আসেন। আমার একটা কনস্ট্যান্ট টিম চাই।”

অর্ণব ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল, “ওকে স্যার।”

- ফাইন। লেট্স কনসেনট্রেট।” অধিরাজ ইন্ডিয়া কিংসের অবশিষ্টাংশ অ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, “বত্রিশ বছর আগে খুনীর স্টাইলের ব্যাপারে রথীন দাশগুপ্ত অনেকটাই আলোকপাত করেছিলেন। অন্তত তার কাউন্টডাউন করার অভ্যেস, ভিকটিমদের ফলো করার প্রবণতা আমরা জানি। এই মুহূর্তে আমরা জানি যে সে অলরেডি কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছে। এবং তার অভ্যেসমতোই সে আমাদের আশেপাশেই থাকবে। এবং খোঁচাবে, তথা ডিস্টার্ব করবে। লোকটার বেবি ক্রিম, বেবি পাউডার মাখার ব্যাপারটা অলরেডি প্রতিষ্ঠিত। তদন্ত চলাকালীন সতর্ক নজর রাখবে যাদের জেরা করছ তাদের বাড়িতে ও দুটি জিনিস আছে কিনা। সাসপেক্টদের বাড়িতে যদি ডিভিডি প্লেয়ার থাকে তবে লক্ষ্য করে দেখবে, সেখানে টম অ্যান্ড জেরির ডিভিডি আছে কি না।”

“ডিভিডি কেন?” অর্ণব বলে, “সে তো টিভিতে কার্টুন নেটওয়ার্কেও শো দেখতে পারে।”

“অবশ্যই পারত যদি না টম অ্যান্ড জেরির পরিস্থিতি পাল্টাত। যারা পুরনো টম অ্যান্ড জেরি দেখে অভ্যস্ত তারা কারেন্ট এপিসোডগুলো পছন্দ করে না। টম অ্যান্ড জেরির গুচ্ছ ভার্সন বেরিয়েছে, চ্যানেল পাল্টেছে; সর্বোপরি গল্পের ধরণও পাল্টেছে। সুতরাং যে টম অ্যান্ড জেরি শো ক্লাসিক, সেটা দেখতে হলে ডিভিডি রাখতে হবে। আমাদের খুনী পুরনো মানুষ। আধুনিক টম অ্যান্ড জেরির গল্প তার পছন্দ নাও হতে পারে। তাই ডিভিডি থাকার চান্স প্রবল।”

"ডিভিডি কেন? নেট থেকে নামিয়েও তো দেখতে পারে, কিংবা ওয়েব চ্যানেলে?" -

"যে লোক ১৯৮৭ তে ন'টা খুন করে বসে আছে, তার বয়েস তখন কম সে কম বাইশ থেকে পঁচিশ হবেই; এমনকী তার বেশিও হতে পারে। অর্থাৎ লোকটা ডঃ চ্যাটার্জীর সমবয়েসী কিংবা একটু এদিক ওদিক! মোদ্দা কথা, একই জেনারেশনে বিলং করেন। ডঃ চ্যাটার্জী এখনও পর্যন্ত একটা ফেসবুক প্রোফাইলও খুলে উঠতে পারেননি! আমার বাবাও ঐ একই জেনারেশনেরই। তাঁর ফেসবুক প্রোফাইল অবশ্য আছে। কিন্তু ঐ ফেসবুক করা অবধিই। ফিল্ম ডাউনলোড করতে বললে অজ্ঞান হয়ে যান! একে খুনী এমন একটা সময়ে অ্যাকটিভ ছিল, যে সময়ে ইন্টারনেটের' 'ই'-ও কেউ জানত না। তার ওপর সে আবার বেবি ক্রিম, বেবি পাউডার মাখে! তোমার মনে হয় এই লোকটি নেট থেকে ভিডিও নামাবে বা ওয়েব চ্যানেল দেখবে?" -

"পয়েন্ট ইজ ওয়েল টেকেন। আর কোনও বৈশিষ্ট্য?"

"সেভাবে বলা মুশকিল।" সে একটু চিন্তা করে, "তবে লোকটার বিহেভিয়ারের মধ্যে চাইল্ডিশ ভাব থাকার পসিবিলিটি আছে। যেমন চকোলেট, আইসক্রিমের ওপর মাত্রাতিরিক্ত লোভ থাকতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল মনে হতে পারে। একটাই পরামর্শ। কাউকে বিশ্বাস করবে না। সবসময়ই সতর্ক থাকবে। কাউকে শয়তান মনে হলে সন্দেহ করবে। দেবদূত মনে হলে আরও বেশি সন্দেহ করবে।" -

- "বুঝলাম।" পবিত্র বলে, "ফিল্ডিং কবে থেকে শুরু হবে?"

"আর এক ঘণ্টা পরেই। মানে আমাদের ব্রেকফাস্টের পরই।" অধিরাজ সামনের টেবিল থেকে জলের বোতল তুলে নিয়েছে, "আমি আর অর্ণব আজ সুকোমল পান্ডে, শিশির সেন এবং আরও কিছু মানুষকে ইন্টারোগেট করব। আর পবিত্র, তুমি মিস্ দত্তকে নিয়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে যাও। সঙ্গে বত্রিশ বছর আগে যে লোকগুলো মারা গিয়েছিলেন -তাদের মৃত্যুর ডেটগুলোও নিয়ে যাও।"

"কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন! যাব্বাবা! কেন!" অধিরাজের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে, "দেখা যাক যা ভাবছি তা কতটা ঠিক।"

"কী ভাবছ সেটা তো বলবে!" -

“তাহলে সেই প্রশ্নটাই আবার করতে হয়। গেস হোয়্যার? এরকম ব্লাডি মার্ডার এতটা ব্লাডলেস হয় কী করে? অত ব্লাড উবে গেল কোথায়?” অর্ণব মতামত পেশ করে, “এমনও তো হতে পারে যে সে কোনও পরিত্যক্ত কুয়োর ভেতরে বসে খুনগুলো করেছিল। যার ফলে ব্লাড জলের সঙ্গেই মিশে গিয়েছে। পরিত্যক্ত বলে কেউ দেখেওনি।”

“জিনিয়াস থিঙ্কিং অর্ণব!” সে সস্নেহে বলল, “কিন্তু একটা জিনিস মিস করলে। যখন ভিকটিমরা ব্লিড করছিলেন, তখনও তারা বেঁচেছিলেন। এবং তখনই তাদের সঙ্গে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে। তুমি বলতে চাও খুনী প্রথমে তাদের শিরা কেটে, তারপর তাদের কুয়োয় ফেলে, তারপর নিজেও কুয়োয় নেমে, কুয়োর মধ্যেই কচুরীপানা ভর্তি জলে ডুবে তাদের রেপ করে, জলের মধ্যে নিখুঁত সার্জিক্যাল স'য়ের এক কোপে মুণ্ডু কেটে, ফের নিজে কুয়ো বেয়ে ওপরে উঠে এসে, মৃতদেহগুলোকে টেনেটুনে জলের ওপরে এনে পুলিশ স্টেশনে ডাম্প করল, অথচ লাশগুলোয় জল পাওয়া গেল না, তাদের জামা-কাপড় ভিজল না, ইনফ্যাক্ট লোকগুলোরও সেক্ষেত্রে জলে ডুবে মৃত্যু হওয়ার কথা, কিন্তু তারা বেশ নিশ্চিন্তেই শুকনো ডাঙায় ধড়ফড় করে মরলেন; ফুসফুসে জল পাওয়া গেল না; এমন জিনিয়াস প্ল্যানিং তো বোধহয় স্বয়ং খুনীও করেনি।” অধিরাজ বলতে বলতেই হেসে ফেলল, “তুমিও ইদানীং মিস্ কাটামুণ্ডুর নভেল বেশি মাত্রায় পড়তে শুরু করেছ নাকি?”

- “কিন্তু স্যার, নদীর ধারে বা পুকুরপাড়েও তো খুন করতে-- পারে?”

“নিশ্চয়ই পারে অর্ণব। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভিকটিমের শার্টে, ট্রাউজারে কাদা-মাটি কিছু তো থাকবে। ফরেনসিক সেসব কিছুই পায়নি। ব্লিড করলে মাটি ভিজবেই। সেক্ষেত্রে মাটির ট্রেসও থাকার কথা। নদীর পাড়ের মাটিতে বা পুকুর পাড়ের মাটিতেও জমাট রক্ত থাকার কথা। নদীর জল না হলেও পুকুরের জল রক্তে লাল হবে।” সে হাসতে হাসতেই মাথা ঝাঁকাল, “এবার প্লিজ বোল না, খুনী ন'জনকে মহাকাশযানে বসে মেরেছে।”

অর্ণব গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে যায়। কিন্তু পবিত্র ভ্রূ ভঙ্গি করে বলে, “হয়তো খুনীর বাড়িতে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল আছে। কিংবা বাঙ্কার!”

“খুব ভালো। খুনী একা হাতে মাটি খুঁড়ে বাঙ্কার বানিয়েছে কি না, অথবা তার বাড়িতে গোপন টানেল আছে কি না এ খবরটা পরে জানবে।” অধিরাজ এবার সজোরে হেসে

ওঠে, "তার আগে কে এম সি থেকে খবর নাও— চিৎপুর, ট্যাংরা, পার্কসার্কাস; যেসব জায়গায় স্লটারহাউজ বা অ্যাবেট্‌ওয়া'র ছড়াছড়ি সেখানে বত্রিশ বছর আগে ঠিক ক'টা প্রমাণ সাইজের স্লটারহাউজ ছিল। এবং সেইসব স্পটে গিয়ে খোঁজ নাও, ঠিক অফিসার দাশগুপ্ত'র মৃত্যুর পর সেইরকম কোনও স্লটারহাউজের মালিক বেপাত্তা কিনা, বা সেই স্লটারহাউজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কি না। কাজটা কঠিন মানছি; তবে অসম্ভব নয়।"

— "স্লটারহাউজ!" বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত আত্রেয়ীর, "তাই তো! একমাত্র স্লটারহাউজই এমন জায়গা যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্ত বেরোনোই সবচেয়ে স্বাভাবিক। স্লটারহাউজের নিজস্ব ড্রেনেজ সিস্টেমও থাকে! যেখান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যায়। আর বড় বড় অ্যাবেট্‌ওয়ায় প্রচুর রক্তারক্তি কাণ্ড হয়। খুনীর রক্ত পরিষ্কার করারও দরকার নেই। ব্রিলিয়ান্ট ডিডাকশন স্যার!"

অধিরাজ মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে প্রশংসা গ্রহণ করল। পবিত্র আপনমনে বলে, "এটা তো মাথাতেই আসেনি।"

"মাথায় আসেনি কারণ এটাই সবচেয়ে সহজ পথ।" সে এবার সোফায় এলিয়ে পড়ে, "প্রবলেম হচ্ছে তোমরা সবই খুব জটিল ভাবে ভাবতে যাও।" - "কিন্তু এখন তো ব্লাড প্রসেসিং ফেসিলিটি আছে।" পবিত্র সন্দিগ্ধচিত্তে বলে, "যতদূর জানি স্লটারহাউজের ব্লাড রীতিমতো ল্যাবে যায়। সেখানে - ধরা পড়বে না যে পশুর রক্ত না মানুষের রক্ত?"

– "নিশ্চয়ই পড়বে। কিন্তু সেটা এখন।" অধিরাজ মৃদু হাসল, "বত্রিশ বছর আগে, ১৯৮৭ তে এই সুবিধেগুলো ছিল না। স্লটারহাউজের নিজস্ব ড্রেনেজ সিস্টেম থাকত, যেখান দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্ত বেরিয়ে যেত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো পড়ত বিশাল বালতিতে বা ড্রামে, যেগুলো নিয়ে পরদিন কর্মীরা গাছের গোড়ায় ঢেলে দিত। অর্থাৎ সার হিসাবে ইউজড হত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ড্রেনগুলো সি-ওয়্যারের মাধ্যমে কোনও জলাশয়ে খুলত। সেসব জলে রক্ত দেখলেও কেউ চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে না কারণ স্থানীয় লোকেরা সকলেই জানে যে এটা কসাইখানার সঙ্গে কানেক্টেড। সুতরাং জল যদি লালও হয় তবে সেটাই সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্য! আর সত্যিই

খুনীর রক্ত পরিষ্কার করার দরকারই নেই। শুধু স্লটারহাউজের মালিকটিকে হাতে রাখলেই হবে যার বত্রিশ বছর ধরে বেপাত্তা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।"

"খামোখা বেপাত্তা হবে কেন?"

"যদি অফিসার দাশগুপ্তের বলিদান সার্থক হয় ও শিশির সেন সঠিক লোককে ধরে থাকেন, তবে ধরা পড়ার ভয়ে নিজেই বেপাত্তা হবে। আর যদি সঠিক খুনী নাও ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রেও আসল খুনী এরকম জলজ্যান্ত প্রমাণ আদৌ রাখবে না। যে ন'টা খুন করতে পারে, সে আরেকটা এক্সট্রা খুনও করতে পিছ পা হবে বলে মনে হয় তোমার? সঠিক এটাই ঘটেছে, তা এখনও বলতে পারছি না। কিন্তু নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট চান্স রয়েছে। বাকি ওয়ান পার্সেন্ট তুমি কনফার্ম করবে। এবার ক্লিয়ার?"

"ক্রিস্টাল।"

পবিত্র মাথা ঝাঁকায়। অধিরাজের যুক্তি সে বুঝেছে। এবার অধিরাজ অর্ণব আর আত্রেয়ী দু'জনের দিকেই তাকায়, "আপনারা দু'জনেই খবরি নেটওয়ার্ককে অ্যাক্টিভেট করুন। সবাইকে বলুন তারা বত্রিশ বছর আগের এই কেসটার সঙ্গে জড়িত কোনও সুমঙ্গল পন্ডিতকে চেনে কিনা। যদি না চেনে তবে অর্ডার দিন বত্রিশ বছর পুরনো খবরিদের খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যে এই কেসটার সঙ্গে কোনও সুমঙ্গল পন্ডিতের লিঙ্ক ছিল কিনা। থাকলে সে এখন কোথায় আছে?"

"সুমঙ্গল পন্ডিত স্যার?" আত্রেয়ী কৌতুহলী, "কিন্তু ওটা তো সুকোমল নিজের নাম হিসাবে বলেছে। মে বি, পুরোটাই কাল্পনিক।"

"হতে পারে মিস্ দত্ত।" অধিরাজের কপালে চিন্তার ভাঁজ, "তবে -পান্ডে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাও হতে পারে। মানছি, যিনি বলেছেন তিনি যুধিষ্ঠিরের ছায়া দেখলেই পালিয়ে যান। প্যাথোলজিক্যাল লায়াররা খুব কনফিডেন্টলি মিথ্যে কথা বলে। ইনফ্যাক্ট, মিথ্যেটাকেই ওরা সত্যি বলে বিশ্বাস করে; যার জন্য পলিগ্রাফ টেস্টও ফেল করেছে। কিন্তু সব মিথ্যের পিছনেই একটা সত্যি লুকিয়ে থাকে। লক্ষ্য করে দেখুন, লোকটা কিন্তু নিজের নাম জালাল-উদ্দিন মহম্মদ আকবর বা ওয়ারেন হেস্টিংস বলেনি। যদি সেটাও বলত, তবে তাকেও লাই ডিটেক্টর 'ট্রু' বলেই চিহ্নিত করত। সে রাম, শ্যাম, যদু, মধু, অমর, আকবর,

অ্যান্টনি; যা খুশি বলতে পারত। কিন্তু বেছে বেছে সুমঙ্গল পন্ডিত কেন? এবং একবার নয়, কোর্টের শুনানির বর্ণনা অনুযায়ী সে বারবার এই নামটাই বলেছে। শুধু শুনতে অনেকটা একরকম বলে? না অন্য কিছু?" -

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে। তার চোখে স্পষ্ট চিন্তার ঘোর। "খবরি নেটওয়ার্ককে বলো আকাশ পাতাল এক করে দিতে। যত টাকা চায়, ঢালো। আই ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু আমি জানতে চাই যে সুমঙ্গল পন্ডিত নামটা কি শুধুই কল্পনা? না বাস্তবে লোকটা সত্যিই এক্সিস্ট করে?" অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করল, "সুমঙ্গল পন্ডিত কোনও মিসিং লিঙ্ক নয়তো?"

(৭)

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চাটা! পরনে একটা লাল রঙের ঘাগরা-চোলি। লাল রঙটা তার বড় পছন্দের। সাদা, কালো, ধূসর বা নীল তার একেবারেই পছন্দ নয়। বরং লালের ওপর সোনালি জরির কারুকার্য দেখলেই বড় লোভ হয়। ইচ্ছে করে তখনই একবার পরে নিজেকে আয়নায় দেখে। দুনিয়ার যত লাল, সব তাকে আকর্ষণ করে। দিদির লাল রঙের চুলের ফিতে, মায়ের লাল সিঁদুর, লাল রঙের জামা, লাল ফুল, লাল লিপস্টিক...! সব ভালো লাগে! স-ব! এমনকী পাশের বাড়ির মিনিদিদি গালে লাল লাল রঙ লাগায়। কী দারুণ লাগে। সেই রঙটাও গালে মাখতে ভীষণ ইচ্ছে করে ওর।

ভাবতেই মন খারাপ হয়ে গেল বেচারির। মিনিদিদি যখন রাণাদার সঙ্গে বেড়াতে যায় তখন কী সুন্দর লাল লিপস্টিক মেখে, গোলাপ ফুল দিয়ে খোঁপা সাজায় । রাণাদাকে দেখতে একদম অমিতাভ বচ্চনের মতো। কী লম্বা! আর চুলের কাটটাও অমিতাভ মার্কা! ধ্যুৎ ! তার ভালো লাগে না। মিনিদিদির মতো লম্বা চুল না হলে ফুল পরবে কী করে? এই ছোট করে ছাঁটা চুলে ফুল তো দূর, দিদির মতো ক্লিপও আটকানো যায় না। এমন চুল থেকে কী লাভ যদি সুন্দর করে সাজানোই না যায়! তার অমন লম্বা চুল কবে হবে? এমনিতেই কুড়কুড়ি নাপিতের ওপর রাগ আছে তার। প্রতি বছর লোকটা এসে ওর মাথার সুন্দর একরাশ চুল নিষ্ঠুরভাবে উড়িয়ে দেয়। নরম, ঢেউ খেলানো, কাজল কালো ঘন চুলের গোছা মাটির ওপরে খসে খসে পড়ে। কুড়কুড়ি নিষ্ঠুর হাতে ক্ষুর চালায় আর বাচ্চাটা ব্যথাতুর জলভরা দৃষ্টিতে দেখে তার সব সৌন্দর্য কেউ নিষ্ঠুর হাতে ছিন্নভিন্ন করছে!

ঘাঘরা-চোলি পরে প্রথমে বড় আনন্দ হয়েছিল তার। পরক্ষণেই নিজের ন্যাড়া মাথার দিকে নজর যেতেই সমস্ত আলো ধুক করে নিভে গেল! এই ন্যাড়ামুন্ডি মাথায় আদৌ কিছু মানায়? কেউ কি দেখে না যে দিদির চুলের থেকে তার চুল অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি ঘন? বড় চুল রাখলে দিদির থেকেও বেশি সুন্দর লাগবে তাকে। নরম চেহারায় আরও বেশি পুতুল পুতুল লাগবে। বেশ রূপকথার রাজকুমারী মনে হবে। রাজকন্যে

রাপুনজেল, বা স্নো-হোয়াইট। মা-বাবার কাছে এ নিয়ে অনেক দরবার করেছে। কিন্তু বাবাকে বললে তিনি পেল্লায় ভ্রূকুটি করে তাকান, যেন ও সাঙ্ঘাতিক কোনও অপরাধ করে ফেলেছে। আর মাকে বললেই তিনি হেসে মরেন। বলেন, "রাজকন্যে সেজে কাজ নেই বাবা! বরং তুমি ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমার সেজো।"

ভাবতেই ঠোঁট ফোলাল বাচ্চাটা। রাজকুমার সাজতে তার বয়েই গেছে। রাজকুমারেরা কি অমন সুন্দর ঝলমলে কাপড় পরে না রঙ মাখে? তার ওপর যত রাজা রাজড়ার ছবি দেখেছে, সবারই নাকের নীচে একখানা পেল্লায় গোঁফ! অমন ঝাঁটার মতো গোঁফ ওর মোটেই পছন্দ নয়। তার ওপর দাড়ি তো আরও অপছন্দ। এই যে জ্যেঠু একমুখ দাড়ি নিয়ে ঘোরে, কুটকুট করে না? নির্ঘাৎ করে। সর্বক্ষণই খুচুর খুচুর করে দাড়ি চুলকোচ্ছে। নির্ঘাৎ জ্যেঠুর দাড়িতে উকুন আছে! সেই ভয়ে ও জ্যেঠুর ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

আপনমনেই সে নিজের প্রতিবিম্বকে ভেংচি কাটল। স্কুলের দিদিমণিরাও যেন কী! তার কত শখ ছিল স্কুলের ফাংশনে সে লালপরী সাজবে। কী সুন্দর ঝালর দেওয়া ভেলভেটের লাল টুকটুকে রেশমী ফ্রক। লাল ডানায় আবার সোনালি জরির বর্ডার! আহা! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু দিদিমণিরা বললেন, "পরী সাজা চলবে না, বরং গাছ বা ভালুক সাজতে পারো।"

কোথায় লাল টুকটুকে পরী! আর কোথায় গাছ আর ভালুক! বাচ্চা মানুষটা মনের দুঃখে সেদিন টিফিন খেতেই ভুলে গিয়েছিল। মায়ের হাতের লুচিও গলা দিয়ে নামেনি তার। মন ভার হয়েছিল এক অব্যক্ত কষ্টে। এই পৃথিবীতে কি কেউ জানতে চাইবে না যে সে ঠিক কী করতে চায়? সবাই খালি বলে, 'এটা উচিৎ', 'ওটা উচিৎ নয়'। একবারও কেউ বলে না, 'তোর কোনটা ভালো লাগে?' কেউ জানতেই চায় না; এই ছোট্ট মানুষটার মনে কী আছে, সে নিজে কী চায়! বাবা তাকে নিজের মতোই পুলিশ অফিসার বানাতে চান, কুড়কুড়ি তাকে ন্যাড়া বানাতে চায়, মায়ের দাবি ডাক্তার, দিদিমণিরা ভালুক কিংবা গাছ বানিয়েই খুশি, স্পোর্টস স্যার রাঙা চোখ করে বলেন, 'বি আ ম্যান, বি ব্রেভ!' কিন্তু ঐ বাচ্চাটা যে শুধু রাজকুমারী হতে চায়, পরী হতে চায় সে। তার খবর কে রাখে?

একরাশ বিষণ্নতা নিয়ে সে ফের নিজের প্রতিবিম্বের দিকে মনোনিবেশ করে। এ রাম! এই ন্যাড়া মাথায় লাল ঘাঘরা একটুও মানাচ্ছে না। তবে? কী করবে? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যদি লম্বা চুল গজানোর কোনও উপায় জানা থাকত! সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে মাথাটা ঢাকার মতো কিছু আছে কি না! বাড়িতে বাবা-মা বা দিদি থাকলে এতক্ষণে নির্ঘাৎ হাঁই হাঁই করে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একসা করত। ভাগ্যিস কেউ নেই! সবাই বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে। ওকেও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ও এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায়নি। রীতিমতো নাকে কান্না কেঁদে, পেটে ব্যথার মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে নিস্তার পেয়েছে। বাবা যথারীতি পুলিশি ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "এরকম মেয়েছেলের মতো কথায় কথায় প্যানপ্যান করিস কেন!" মা-ই শেষপর্যন্ত উদ্ধার করলেন। বললেন, "আহা থাক, ও যখন যেতে চাইছে না তখন কাজ নেই। আমিই বরং বাড়িতে ডাল-ভাত রান্না করে খাইয়ে দিচ্ছি।"

অগত্যা তাকে খাইয়ে দাইয়ে, পেট ব্যথার ওষুধ দিয়ে মা, বাবা আর দিদিকে নিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়েছেন। আর তারা যাওয়া মাত্রই সে নিজের কাজে লেগে পড়েছে। জানে, কোথায় আছে তার গুপ্তধন। দিদির সুন্দর সুন্দর জামা, চুড়িদার, চুলের ফিতে, চুড়ি, গলার হার, মায়ের লিপস্টিক, কাজল— পুরো চল্লিশ চোরের খাজানা! সব ঘেঁটেঘুঁটে বের করছে আর পরে পরে দেখছে।

কিন্তু মাথাটা ঢাকবে কী করে? বাচ্চা মানুষটা জামাকাপড়ের রাশ ঘাঁটতে ঘাঁটতেই দিদির একখানা কালো ওড়না পেল। আইডিয়া! এই ওড়নাটা দিয়ে মাথা ঢাকলে মনে হবে মাথায় একরাশ লম্বা কালো চুল! সে চটপট ওড়নাটা মাথায় পরে ফেলল। এই তো, বেশ দেখাচ্ছে! নিজের কৃতিত্বে নিজেকেই জড়িয়ে ধরে হামি খেতে ইচ্ছে করল তার। এর সঙ্গে দিদির লাল রঙের কাচের চুড়ি, আর লাল পুঁতির হার পরলে কেমন হয়?

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। মহা খুশি হয়ে কাচের চুড়ি আর হার পরে ফেলল। এবার লিপস্টিকের পালা। খুব মনোযোগ দিয়ে মা যেমন মুখভঙ্গি করে লিপস্টিক লাগান, অবিকল সেই ভঙ্গিতেই লিপস্টিক লাগাতে গেল শিশু। কিন্তু যথারীতি লিপস্টিক ধেবড়ে গিয়ে ঠোঁটের চতুর্পাশে লেগে একসা! তা হোক। তবু বেশ লাগছে!

সে নিজের নতুন রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আয়নার দিকে। কতক্ষণ তাকিয়েছিল খেয়াল নেই। সম্বিত ফিরল বাইরে থেকে তালা খোলার শব্দে। শিশু কেঁপে ওঠে। কে এল! বাবা-মায়ের তো এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয়! তবে?

"গুড্ডু? আছিস?" -

জ্যেঠুর কণ্ঠস্বর! বাচ্চাটা ভয় পায়। এই রে! জ্যেঠু আবার বলে দেবে না তো! এর আগের বারের শিক্ষাটা এখনও মনে আছে। দিদির ফ্রক একটু পরে ছিল বলে বাবা কান টেনে লম্বা করে দিয়েছিলেন। এবার তো একেবারে ঘাঘরা, হার, চুড়ি, লিপস্টিক সব একসঙ্গে! কী হবে!

ছোট্ট শিশু ভয়ের চোটে কোথায় লুকোবে ভেবে পায়নি। তার আগেই দরজা খুলে জ্যেঠু বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। সে দিশেহারা। জ্যেঠু তাকে এই অবস্থায় দেখতে পেলে কী করবেন! মারবেন না তো!

"নাড়ু বলে গেল তুই নাকি বাড়িতে একাই আছিস। পেট ব্যথা। তাই দেখতে এলাম ঠিকঠাক...!" বলতে বলতেই থমকে গেলেন তিনি। বলাই বাহুল্য, চোখ পড়েছে মূর্তিমানের সাজগোজের ওপর। তার এই উদ্ভট সাজ দেখে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এ কী! তুই মেয়েদের মতো সেজে কী করছিস।" -

শিশুরা কথায় কথায় চট করে মিথ্যে বলতে পারে না। সে ঢোঁক গিলল। কী বলবে বোঝার আগেই জ্যেঠু একটু ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে দেখলেন তাকে। অদ্ভুত একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি তাঁর মুখে ভেসে ওঠে। সে হাসির অর্থ ছোট্ট মানুষটার মাথায় ঢুকল না। জ্যেঠুর চোখদুটো কেমন যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে। সে শুধু এইটুকু বুঝল, জ্যেঠু হয়তো রাগ করেননি।

- "লাল লিপস্টিক মেখেছিস?" তিনি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করতে - করতে বললেন, "ভালোই লাগছে।"

এবার বাচ্চা মানুষটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সত্যিই তবে জ্যেঠু রাগ করেননি। কিন্তু ওঁর হাসিটা এমন অচেনা লাগছে কেন? তাঁর চোখের ভাষা পড়তে পারল না সে! কীরকম অপলকে তাকিয়ে আছেন। এ যেন তার বহুপরিচিত মানুষটা নয়। অন্য কেউ। চেহারা

একই; কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত, জ্যেঠু আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন তার দিকে। জোরালো একটা উৎকট গন্ধ ঝাপটা মারল তার নাকে। তিনি তার সামনে এসে নরম গাল স্পর্শ করে বললেন, “মেয়েদের মতো সাজলে তোকে তো গরম মাল লাগে রে!” শিশু বুঝল না ‘গরম মাল’ কী জিনিস! শুধু এইটুকু অনুভব করল সামনের মানুষটার আঙুল তার গাল থেকে আস্তে আস্তে ঠোঁটের দিকে নামছে। তাঁর নিঃশ্বাস প্রচণ্ড গরম। নরম, কোমল শিশুর গালের ওপর একটা দাড়িওয়ালা রুক্ষ গালের ঘষা! ও কাতরোক্তি করে ওঠে।

“চুপ! চুপ!” জ্যেঠুর হাত ক্রমশই নামছে। গলায়, ঘাড়ে... তারপর জামার মধ্যে! সরীসৃপের মতো কিলবিলিয়ে উঠল আঙুলগুলো। তারপর আরও নীচে! সে হতবাক! অসহ্য দাড়ির ঘষায় তার অতিষ্ঠ লাগছিল। কোনওমতে বলল; “জ্যেঠুমণি, কী করছ!” -

“আদর করছি।” তিনি গাঢ়স্বরে বলেন, “তোকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। তাই আদর করছি।” -

শিশুটা বুঝতে পারল না একজোড়া বুভুক্ষু চোখ তার নরম, পেলব শরীরটাকে মেপে নিচ্ছে। জানত না তার গোলগাল কচি নধর দেহটা ‘গরম'। নিজের সুগোল উরু, নিতম্ব যে নিজেরই শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তা তার জানা ছিল না। জানত না ‘আদর’ বলতে ও যা বোঝে, এ আদর সে আদর নয়! তাই যখন আসল আদর শুরু হল তখন চিৎকার করে উঠেছিল, ‘জ্যেঠুমণি, ব্যথা লাগছে...!

জ্যেঠু তাঁর রুক্ষ, সবল হাতে শিশুর নরম চোয়াল চেপে ধরে হিংস্র জন্তুর মতো হিসহিসিয়ে উঠে বলেছিলেন, ‘চুপ! একদম চুপ! টু শব্দটিও করবি তো কেটে ফেলব!’ ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিশুটি দেখেছিল জ্যেঠুর মুখটা অবিকল বইয়ে আঁকা ধূর্ত শেয়ালের মতো লাগছে। তার নিষ্পাপ শরীর বেয়ে সেদিন অক্টোপাসের মতো যন্ত্রণা উঠে এসেছিল। কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। সাধের লাল ঘাঘরা মাটিতেই লুটোচ্ছে। মাথার ওড়না খুলে গিয়েছে। বিছানার ওপরে বীভৎস পাশবিক শক্তিতে এক পুরুষের উদ্ধত পৌরুষ নগ্ন শিশুদেহকে বার বার আহত, রক্তাক্ত করতে লাগল। বাচ্চা মানুষটার আর্ত চিৎকার, করুণ কান্না কিংবা যন্ত্রণাকাতর গোঙানি কেউ শোনেনি! অসম্ভব শক্তিশালী পুরুষ তাকে উপুড়

করে একেকটা প্রাণান্তকর ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শিশুর কোমল গোপনাঙ্গে শক্ত লোহার রড যেন ঢুকিয়ে দিল কেউ! কী ব্যথা! মরে যাবে, এবার মরেই যাবে! উঃ...!

...আচমকা যেন সেরকমই একটা জোরদার ধাক্কা খেয়ে বিছানায় ধড়ফড় করে উঠে বসল লোকটা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। অন্ধকার ঘরের ঘুলঘুলি বেয়ে সরলরেখায় একঝলক সূর্যরশ্মি এসে পড়েছিল তার চোখে। সেই চোখে কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৃষ্টি নেই! অবিকল সেই শিশুর ভয়ার্ত যন্ত্রণাকাতর চোখে চেয়ে রইল সে। কোনও পুরুষ নয়; সেই অসহায় বাচ্চা মানুষটাই যেন অসম্ভব ব্যথায় তাকিয়ে আছে। অজান্তেই তার মুখ বেয়ে কাতর গোঙানি বেরিয়ে এল। তার হাতটা অজান্তেই নিতম্ব স্পর্শ করে বুঝতে চাইল; আজও সেই চটচটে জিনিসটা লেগে আছে কি না!

সেদিন এক শক্তিশালী মানুষ হারিয়ে দিয়েছিল তাকে। লাল রঙ বড় প্রিয় ছিল তার। লাল জামা, লাল টিপ, লাল রিবন, লাল লিপস্টিক...! তখন সে জানত না যন্ত্রণার আরেক নাম রক্ত; আর তারও রঙ লাল!

(৮)

"কেমন মনে হল জাস্টিস গাঙ্গুলিকে?"

অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে অর্ণব ধীর স্বরে বলল, "হ-রি বৌ-ল।"

"ইউ মিন; হরিবল্?" সে ফিক করে হেসে ফেলেছে, "কেন?" অর্ণব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "এতদিনে বুঝতে পারছি যে কোর্ট কেসগুলোর ভার্ডিক্ট আসতে এত দেরি হয় কেন! কারণ যিনি ভার্ডিক্ট দেবেন তাঁর একেকটা শব্দ উচ্চারণ করতেই কয়েক মাস লেগে যায়!" অধিরাজ -সজোরে হেসে উঠল, "রিয়েলি গুড ওয়ান'অর্ণব।" বাস্তবেই অর্ণবের কথা বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নয়। বত্রিশ বছর আগে জাস্টিস মৌলিনাথ গাঙ্গুলি সুকোমল পাণ্ডেকে আজীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছিলেন। এখন তাঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। উপরন্তু কানে কম শোনেন। অধিরাজরা ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই দেখা করতে গিয়েছিল। অর্ণবের মনে যে প্রশ্নটা উঠেছিল, সেটা অধিরাজকেও হন্ট করছে। ওরকম একটা মারাত্মক সাইকো কিলারকে উনি ফাঁসির সাজা না দিয়ে আজীবন কারাদণ্ড কেন দিয়েছিলেন, সেটাই জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা করতেই জাস্টিস গাঙ্গুলি কথা নেই বার্তা নেই সটান উর্ধ্বমুখী হয়ে বসে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি মাথার ওপরের সিলিং ফ্যানটার দিকেই নিবদ্ধ।

দুই অফিসার আর কী করে! অগত্যা তারাও মুণ্ডু উঁচিয়ে কয়েক মিনিট সেই ফ্যানটার দিকেই তাকিয়ে বসে রইল। ওদিকে জাস্টিস গাঙ্গুলির কোনও সাড়া শব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরেই অর্ণব মহা বিরক্ত হয়ে বলল, "স্যার, ঘাড় যে ব্যথা হয়ে গেল! আপনি শিওর যে উনি আজকেই প্রশ্নটার উত্তর দেবেন? কে জানে, হয়তো ওনার সঙ্গে কথাবার্তা যখন শেষ হবে, ততক্ষণে দু'হাজার একুশ সাল পার হয়ে গেল!"

"গুড ওয়ান অর্ণব।" অধিরাজ ফিসফিস্ করে বলে, "আমিও বুঝতে পারছি না উনি ফ্যানের দিকে তাকিয়ে এত কী ভাবছেন? ফ্যানটার ওপর আবার আই পি সি সেকশল্ লেখা নেই তো!" -

ঈশ্বরকে অসীম ধন্যবাদ। জাস্টিস গাঙ্গুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বললেন, “হ্যাঁ, প্রশ্নটা যেন কী ছিল?”

অর্ণব অধিরাজের মুখের দিকে আড়চোখে তাকায়। ভদ্রলোক প্রশ্নটা শোনেনইনি! এতক্ষণ তবে ছাদের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিলেন! ওঃ, ঈশ্বর! অধিরাজ তার স্বভাবগত স্থৈর্যে গম্ভীর ও নীচু স্বরে প্রশ্নটা রিপিট করল। জাস্টিস গাঙ্গুলির চোখ ফের ফ্যানের দিকে ফিরে গিয়েছে। দুই অফিসারের অবস্থা ‘ন যযৌ, ন তস্থৌ’। থেকে থেকে ফ্যানের দিকে তাকানোর অর্থটা কী?

“স্যার, চলুন কেটে পড়ি।” অর্ণব ফের ফিসফিসায়, “ওনার উত্তরটা মনে হয় ব্ল্যাক হোলে ঢুকে পড়েছে!”

অধিরাজ হেসে ফেলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অত্যন্ত মন্থর ভঙ্গিতে মুখ খুললেন জাস্টিস গাঙ্গুলি, “বত্রিশ বছর আগের কথা মনে করা খুব মুশকিল। এত লোককে ভার্ডিক্ট দিয়েছি, ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি, জেলে পচিয়েছি যে প্রত্যেকটা কেস আলাদা আলাদা মনে করা মুশকিল। অন্তত সব সঠিকভাবে মনে পড়ে না। এখন বয়েসও হয়েছে...!”

দুই অফিসারের চার চোখের মিলন হল। যাঃ কলা, এত কাঠখড় পোড়ানোর পর শেষে জজসাহেবকে অ্যামনেশিয়ায় ধরল! অধিরাজ ওঠার তাল করতেই যাচ্ছিল, তার আগেই আবার মন্থরতর ভঙ্গিতে বললেন তিনি, “তবে এই কেসটার কথা মনে আছে। আমিই ভার্ডিক্ট দিয়েছিলাম!”

– “একটু বেশিই তাড়াতাড়ি মনে পড়ল না?” অর্ণব অধিরাজের কানের কাছে ফুসফুস্ করে, “আমরা জানতে এসেছি যে উনি সুকোমল পান্ডেকে কেন আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন; আর এত কথা শোনার পর উনি কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করলেন যে উনিই এ কেসের ভার্ডিক্ট দিয়েছিলেন! আমার যে লাফিং বুদ্ধের অবস্থা হচ্ছে স্যার!”

অধিরাজ তার দিকে না তাকিয়েই চাপাস্বরে বলল, “লাফিং বুদ্ধের অপোজিট কী অর্ণব?”

অর্ণব প্রশ্নটা শুনে হকচকিয়ে যায়, “কী?”

অধিরাজ আরও গম্ভীর হয়ে জানায়, "গৌতম গম্ভীর।" উত্তরটা শুনে বেদম হাসি পাচ্ছিল অর্ণবের। কিন্তু বসের কথার মূল ইঙ্গিতটাও ধরতে পেরেছে। অগত্যা সে উৎকট ধরনের মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। "আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার কেসটার কথা মনে পড়েছে।" অধিরাজ পুলিশি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই - জাস্টিস গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞাসা করে, "সুকোমল পান্ডের বিরুদ্ধে সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স ছিল । অথচ ওরকম একটা মারাত্মক খুনীকে আপনি ফাঁসি দিলেন না কেন?" জাস্টিস গাঙ্গুলি ফের উদাস দৃষ্টিতে পাখার দিকে তাকালেন। অধিরাজের মুখ দেখে মনের কথা বোঝা মুশকিল। কিন্তু খুব ধীরস্বরে বলল, "লে পাখা! উনি কবি হয়ে গেছেন।"

অর্ণব যে কী কষ্টে হাসি চেপেছিল শুধু সে-ই জানে। যাই হোক, রীতিমতো সাসপেন্সের পর অনেক কষ্টে, অনেক সময় নিয়ে শেষপর্যন্ত জাস্টিস গাঙ্গুলি জানালেন, "লোকটাকে আমার খুনী বলে মনে হয়নি। অসম্ভব নিরীহ টাইপের লোক। যদিও এরকম মিথ্যেবাদী আমি পুরো কেরিয়ারে কখনও দেখিনি। সব প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু অনেক ক্রিমিনাল দেখেছি জীবনে। সুকোমল পান্ডের হাবভাব দেখে একবারের জন্যও আমার মনে হয়নি যে সে ওরকম ঠান্ডা মাথার নৃশংস খুনী হতে পারে। ইন্ফ্যাক্ট, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল- হতেই পারে না। ওদিকে 'গিলটি' প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। বেকসুর খালাস দিতে পারতাম না। হাত বাঁধা। তাই ফাঁসি দিইনি।"

- "অনেক অপরাধী আছে যারা কোর্টে চমৎকার অভিনয় করতে পারে। সুকোমলও তাদের মধ্যে অন্যতম হতে পারতেন, আপনার সে সন্দেহ হয়নি?" – "না অফিসার।" এতক্ষণে জাস্টিস গাঙ্গুলির মুখে সামান্য ব্যঙ্গবঙ্কিম হাসি ফুটে উঠল, "আপনি সুকোমল পান্ডেকে জেরা করেছেন?"

"এখনও করিনি।"

"করে দেখুন।" তাঁর মন্থর জবাব, "নিজেই বুঝে যাবেন ও লোকটা খুনী হতে পারে না। হি ইজ আ ড্যাম লায়ার। কিন্তু মার্ডারার নয়।"

জাস্টিস গাঙ্গুলির ইন্টারোগেশন শেষ করে ওরা দু'জনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ভদ্রলোক পুরো লোকাল ট্রেনের মতো স্টপ দিয়ে দিয়ে কথা বলেন। অধিরাজ ড্রাইভ

করতে করতেই হাসল, “জজসাহেবকে জেরা করা আর একটা কচ্ছপকে ম্যারাথন দৌড়তে বলা প্রায় একই। দু'জনেই নিঃসন্দেহে ফিনিশিং লাইনে গিয়ে থামবেন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কখন?”

“রীতিমতো পানিশমেন্ট স্যার!”

“দেখা যাক, বাকিরা কী বলেন।”

“বাকিরা” শব্দটা অবশ্য বাহুল্যমাত্র। বত্রিশ বছর আগে যারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, বর্তমানে তাদের অনেকেই নেই। মৃত ডাক্তারের স্ত্রী একবছর আগেই মারা গিয়েছেন। আর একমাত্র মেয়ে ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনাটাকে মনেই আনতে চান না। যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখন তাঁর বয়েসও কম। সুতরাং অর্ধেক কথাই মনে নেই। শুধু কোনওমতে অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, “মা আমাকে বেশি কিছু বলেননি। তবে বাবার অস্বস্তির কথাটা একবার বলেছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার আগে একটু অদ্ভুত ব্যবহার করতেন। ওঁর মনে হত আশেপাশে কেউ আছে, কেউ ওকে ফলো করছে, যাকে উনি দেখতে পাচ্ছেন না। যাকে বলে আনক্যানি ফিলিংস।” -

বার বাউন্সার রকি আর গুন্ডা রফিকের তিন কূলে কেউ ছিল না। তবে তারা যখন হাপিশ হয়ে যায়, তখন তাদের কিছু বন্ধু বান্ধব থানায় গিয়ে মিসিং কমপ্লেন্ট করে। সেই বন্ধু-বান্ধবরাও আদৌ ধোয়া তুলসীপাতা নয়! বাউন্সারের প্রাণের বন্ধু বেবো ব্রিগ্যান্জা বর্তমানে ড্রাগস স্মাগলার হিসাবে খ্যাত। আর রফিকের ‘জিগরি দোস্ত’ সুলেমান নামকরা সুপারি কিলার। বত্রিশ বছর আগে তারা ছোটখাটো হিস্টিশিটার ছিল। কিন্তু এখন তাদেরই হুলিয়া জারি হয়েছে! পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড। অতএব এই দু’জন সাসপেক্ট লিস্টে থাকলেও তাদের জবানবন্দি পাওয়া মুশকিল।

এক্স আর্মি অফিসারের স্ত্রী ও ছেলে অবশ্য এখনও আছেন। কিন্তু বলাইবাহুল্য, ছেলে তখন মাত্র তিন বছরের শিশু। সে ঠিকমতো কিছু বোঝেইনি, আর স্ত্রী অর্ধেক কথাই মনে করতে পারলেন না! এক্স আর্মি অফিসার অত্যন্ত দুর্দান্ত টাইপের ছিলেন এবং তিনি মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে যে ভদ্রমহিলা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছেন তা তার হাবেভাবেই প্রকাশ পেল। ভদ্রমহিলা সাসপেক্ট লিস্টে থাকলেও তার বয়ানে কোনও লিড

বা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। উদীয়মান কুস্তিগীরের শুধু তার বাবা-মা ছিলেন। এখন দুজনের পরিবারে কেউই এ ধরাধামে নেই। মৃত ইনভেস্টিগেটিং অফিসারদের মধ্যে দু'জনের পরিবারের খোঁজ পাওয়া গেল। ওঁরাও সাসপেক্ট লিস্টে আছেন। দু'জনের স্ত্রী-ই স্পষ্টভাবে জানালেন যে বাড়ির বাইরে, দরজার ওপরে, 'দশ', 'নয়', 'আট' লেখা কাউন্টডাউন অফিসাররা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তখন অস্বাভাবিক কিছু বা কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি তাদের চোখে পড়েছিল কিনা, তা কেউই মনে করতে পারলেন না। কিন্তু দু'জনেই জানালেন যে তাদের স্বামীরাও সেই অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। এমনকী একজন তো এও জানালেন যে তাঁর স্বামী রীতিমতো তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। এই অনভিপ্রেত অস্তিত্বে তিনি এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে কোনও এক বাবার শরণাপন্ন হন! অধিরাজ কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়, "সেই বাবার নাম কী ছিল মনে আছে?"

ভদ্রমহিলা বিষণ্নভাবে মাথা নাড়েন, "নাঃ!"

তৃতীয় অফিসারের পরিবারের খোঁজ কেউ জানে না। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় স্ত্রী কোথায় গিয়েছেন, কেউ কোনও খবর রাখেন না। আর রথীন দাশগুপ্ত অবিবাহিত মানুষ ছিলেন। তাঁর মা-বাবা বেঁচে নেই। আর কোনও আত্মীয় স্বজনের খবরও পাওয়া গেল না।

– "স্যার! এ পুরো ব্লাইন্ড কেস।" অর্ণব রীতিমতো হতাশ, "বত্রিশ বছর পর অর্ধেক লোকই নেই! যারা আছেন, তারা কিছুই মনে করতে পারছেন না! সাসপেক্ট লিস্টে সাতজন। দু'জন ফেরার। বাকিদের ইন্টারোগেশনে কিস্যু পাওয়া গেল না। এভাবে তো আমরা কোনওদিকেই এগোতে পারব না।"

– "একদমই কিছু পাওয়া যায়নি তা বলতে পারি না অর্ণব। দু'জন সাসপেক্ট এখনও বাকি। সুকোমল পান্ডে ও শিশির সেন। আর বেবো ব্রিগ্যানজা এবং সুলেমানের কোনও খবর নেই।" অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, "একটা ব্যাপার তো নিশ্চিত। ভিকটিমরা প্রত্যেকেই কোনও মানুষের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করেছেন। অর্থাৎ অফিসার দাশগুপ্তের থিওরি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। মার্ডারার তার ভিকটিমদের ফলো করে।"

অর্ণব কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে ভীত কণ্ঠে বলে, "তার মানে...!" সে আপনাকেও "ফলো করবে।" সে মৃদু হাসল, "আর এবার তার মোডাস অপারেন্ডি

আমাদের কিঞ্চিৎ জানা আছে। থ্যাঙ্কস টু অফিসার দাশগুপ্ত। তিনি অনেকটাই জানাতে পেরেছিলেন। খুনীর ফলো করার স্বভাব, কাউন্টডাউন করা, হয়তো আরও অনেক কিছুই জানতেন ভদ্রলোক। আফসোস, নিজেই বেঘোরে মারা গেলেন। আরও কী কী জানতেন তা এখন খুঁজে বের করা মুশকিল, যদি না উনি শিশির সেনকে নিজের তদন্তের কথা বলে থাকেন।"

"তাহলে এখন কি শিশির সেনকে ইন্টারোগেট করব?"

"হ্যাঁ।" অধিরাজ একটা লেফট্ টার্ন নিয়ে জানায়, "তবে তার আগে আমাদের মিথ্যেবাদী যুধিষ্ঠির আছেন। মিস্টার সুকোমল পান্ডে। এখন আমরা তাঁরই বাড়ি যাচ্ছি। খুব সাবধান অর্ণব। চতুর্দিক লক্ষ্য করবে। দরকার হলে মোবাইলে ফটো তুলে নেবে।" -

"ওকে স্যার।"

সুকোমল পান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা কোর্ট কেস চলাকালীন আদৌ খুব সুবিধাজনক ছিল না। কেস ফাইল অনুযায়ী তাকে নিম্নবিত্তই মনে হয়েছে। কিন্তু তার সুপুত্রটি উচ্চশিক্ষিত এবং ফ্যাশন ডিজাইনার। তাই সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। বর্তমানে সে বেকবাগানে একটি সুন্দর ছিমছাম টু বি.এইচ.কে ফ্ল্যাটে ছেলের সঙ্গেই থাকে।

ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজানোর আগে একটা সজোরে শ্বাস টানল অধিরাজ। এই প্রথম কোনও তদন্ত করতে গিয়ে সে নিজেই একটু নার্ভাস ফিল করছে।

আপাতদৃষ্টিতে নির্বিকার মনে হলেও ভেতরে ভেতরে বিচলিত। কারণ এইবার সে এমন কেস হ্যান্ডল করছে যেখানে সাসপেক্ট এবং মার্ডারারের প্রোফাইলে সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এবং সুকোমল পান্ডে যে কিছু কম যায় না, তা কেস ফাইলেই স্পষ্ট।

অধিরাজ একটু বিপন্ন দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়। অর্ণব চোখের ইশারায় তাকে ভরসা জোগাল। এই খণ্ডমুহূর্তের বিপন্নতা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে প্রশান্তভাবে চোখের পাতা ফেলে। ভঙ্গিটা অনেকটা এমন যেন বলছে, আমি তো আছি।

ডোরবেল বাজার পরেই কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরই যিনি দরজা খুললেন তাকে দেখে দুই অফিসারেরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া! এ কে! ইনি মহিলা, না পুরুষ?

পরনে একটা টকটকে লাল সিল্কের কিমোনো! একরাশ মেহেন্দি করা লম্বা চুল অবিন্যস্তভাবে পিঠের ওপর ছড়ানো। সম্ভবত সদ্য স্নান করে এসেছেন! কানে দুটো রিং! অবশ্য আজকাল পুরুষেরাও রিং পরে ঠিকই, কিন্তু এনার রিংটি পুরুষের কানের দুলের তুলনায় একটু বেশিই লম্বা। গায়ের রঙ দারুণ ফর্সা। ক্লিন শেভড হলেও দাড়ি-গোঁফের নীলাভ রেখা দেখা যাচ্ছে; অথচ দেহের গড়নটি মেয়েদের মতোই কমনীয়, যথেষ্টই চড়াই-উৎরাই ও বাঁকবিশিষ্ট! ঠোঁটটা একটু বেশিই গোলাপি! লিপস্টিক না লিপবাম!

সুকোমল পান্ডের মতোই চেহারা, কিন্তু সুকোমল পান্ডে নয়। কারণ এই মানুষটির বয়েস অনেক কম। টেনেটুনে বত্রিশ কী তেত্রিশ বছর হবে। তার চোখদুটি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দুই মূর্তিকে খুব ভালো করে আপাদমস্তক মেপে নিল। পরক্ষণেই কাজল কালো কুহকময়ী দৃষ্টি স্থির হল অধিরাজের ওপর। প্রশংসায় চোখ বিস্ফারিত হল তার, "মা-ই গুডনেস! রবিন তোমাদের পাঠিয়েছে? প্লিজ, কাম্... কাম্!"

এই রবিনটি আবার কে? আর প্রথম আলাপেই সরাসরি, 'তুমি!' গলার স্বরটিও বাজখাঁই। যেন মহিলার দেহে কোনও পুরুষের আত্মা ঢুকে পড়েছে। অধিরাজ আর অর্ণব দু'জনেই এরকম উদ্ভট আতিথেয়তার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

ঘরে কোনওমতে ঢুকতে না ঢুকতেই মানুষটি এসে অধিরাজের বুকের ওপর ফটাং করে দুটো হাত রেখেছে।

"ওকে বেবি। লেট মি ফিল্ ইউ!" বে-বি! ফিল্ মানে! বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে দু'জনেই হতবাক। অধিরাজ কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সে প্রায় আঁতকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছিল। অর্ণব দেখল কিমোনোধারী একটান মেরে ফের তাকে নিজের কাছে এনে ফেলেছে। হাত জোড়া একদম মসৃণভাবে মেপে নিচ্ছে অধিরাজের দেহ সৌষ্ঠব! বুক, ঘাড়, গলা, পেট সব ইতস্তত স্পর্শ করে শেষমেষ স্থির হল কোমরে। মানুষটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে জানায়, "হে-ল্ গ-ড্! আ পারফেক্ট ভি! ফুল অব এক্স ফ্যাক্টর! ওয়াও! ইউ আর সো-ও-ও পারফেক্ট ডার্লিং!"

এতক্ষণে অধিরাজের হুঁশ ফিরল। সে রীতিমতো ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, পারফেক্ট ফর হোয়াট?"

“অফকোর্স মডেলিং! অ্যান্ড ইওর স্মেল্‌...!” অধিরাজের বুকে প্রায় মুখ ডুবিয়েই তার গন্ধ শুঁকল কিমোনোধারী, “মমমম! জর্জিও আরমানি। ডি জিও। ডেলিশিয়াস্‌!” -

অ্যাকোয়া মানুষটির বোধহয় আরও কিছু বলার বা করার ইচ্ছে ছিল। তার আগেই অর্ণব বিদ্যুৎগতিতে অসভ্যের মতো তাকে অধিরাজের সামনে থেকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে নাকের সামনে আই ডি কার্ড মেলে ধরল, “সি আই ডি, হোমিসাইড।”

“সি আই ডি!” অর্ণবের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেও মানুষটির মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল, “আপনারা মডেল নন্‌?”

অর্ণব রেগেমেগে লাল, “আজ্ঞে না। আমরা সি আই ডি হোমিসাইড থেকে আসছি। মিঃ সুকোমল পান্ডে আছেন?”

“উপস্‌ সরি!” সে একহাত জিভ কাটে, “এক্সট্রিমলি সরি, আসলে আজই মডেল কো-অর্ডিনেটরের মেল মডেলস্‌ পাঠানোর কথা ছিল। ফর মাই নেক্সট শো। আমি ভাবলাম, আপনারাই বুঝি! মাই ফল্ট। বাবা হলে বসে আছেন। পেপার পড়ছেন। প্লিজ্‌ আসুন।”

এইবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। ইনি সুকোমল পান্ডের সুযোগ্য পুত্র সুদর্শন পান্ডে! ফ্যাশন ডিজাইনার। সুদর্শন একটু থেমে যোগ করল, “যদিও শুনেছি আজকাল কপরাও হ্যান্ডসাম হন, বাট্‌ ইউ আর টু মাচ্‌। আপনার অবশ্যই মডেলিং করা উচিত। নাইস টু মিট ইউ অফিসার...?” প্রশ্নটা অধিরাজের উদ্দেশ্যেই ছিল। কিন্তু অর্ণব রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে উত্তর দেয়, “সরকার।”

– “আপনি নন্‌... উনি।”

সে প্রায় খ্যাঁক করে উঠেছে, “সরি, এক্ষেত্রেও আপনি নন্‌। আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য উনি। আপনার বাবা। আর এই অফিসার পুলিস হয়ে বেশ সুখে আছেন। মডেল হয়ে কাজ নেই।”

সুদর্শন নিরূপায়ভাবে শ্রাগ করে। তারপর গলা নামিয়ে বলে, “দেখুন, পুলিসের সঙ্গে আমার কোনও পার্সোনাল শত্রুতা নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন, আমার বাবা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আমি চাই না তার ওপর আবার পুলিশি অত্যাচার হোক। জানি, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে কেস্‌ রি-ওপেন্ড্‌ হয়েছে। আর এবার যদি আসল খুনী ধরা পড়ে তাহলে

আমার বাবাও ইনোসেন্ট প্রমাণিত হবেন। আমরা কো-অপারেট করব। কিন্তু আপনারাও প্লিজ আমার বাবাকে রুলি ইন্টারোগেট করবেন না! ইন দ্যাট কেস, আমি ফের কোর্টে যাব ফর হ্যারাসমেন্ট! অফকোর্স তার সঙ্গে মেন্টাল টর্চারের অ্যালিগেশানও থাকবে!"

বাপ্ রে! এ তো সরাসরি হুমকি! অর্ণব অধিরাজের দিকে একঝলক তাকাল। তার মুখে স্পষ্ট সম্মতি। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিল, গো অ্যাহেড। অর্ণব একদম ঠান্ডা পুলিশি টোনে বলে, "ফাইন। আমাদের আপত্তি নেই।" "বেশ। আসুন।" -

সুদর্শন ক্যাট ওয়াক করতে করতে এগিয়ে গেল। অধিরাজ এতক্ষণ বোধহয় দম বন্ধ করে ছিল। এবার সাহস পেয়ে মুখ খোলে, "বড়ে মিঞাঁ তো বড়ে মিঞাঁ; ছোটে মিঞা সুভানাল্লাহ্!"

তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করে অর্ণব, "আপনি ঠিক আছেন?"

"বেঁচে আছি।" সে আস্তে আস্তে বলে, "সুকোমলবাবুকে তুমি ইন্টারোগেট করো।"

"ওকে স্যার।" রাগে একরকম গরগর করতে করতেই বলল অর্ণব, "আর সে-ও যদি আপনাকে ফিল্ করতে চায় তবে আমি তাকে কিল করেই ছাড়ব এই বলে দিলাম।"

অধিরাজের চোখে দুষ্টুমি আর কৌতুক, "মাই ডিয়ার স্পেশ্যাল ওয়ান, তুমি বড্ড পজেসিভ!"

এই রে! অর্ণব লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে একটু মাথা চুলকে নেয়। কথাটা যে কী কুক্ষণে বলেছিল! এখন বুমেরাং খেতে খেতে অতিষ্ঠ হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

সুকোমল পান্ডে'র এখন অনেকটাই বয়েস হয়েছে। তবে রেকর্ড অনুযায়ী ষাটের বেশি বয়স নয়। কিন্তু দেখলে সত্তর-পঁচাত্তর বলেই মনে হয়। সম্ভবত কারাদণ্ডের পরিশ্রম ও মানসিক যন্ত্রণা তার অকাল বার্ধক্যের মূল কারণ। চেহারার কাঠামো ভগ্ন, শীর্ণ। মুখটা অনেকখানি ভেঙেচুরে গিয়েছে। গায়ের রঙ আগে হয়তো ফর্সাই ছিল, বর্তমানে গাঢ় তামাটে। একমাথা সাদা ফকফকে চুল, ছোট্ট কপাল, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। যখন সুদর্শন ওদের পরিচয় জানাল, তখন সেই চোখদুটোয় অনাবিল বিস্ময় ফুটে উঠল। একটু অস্থিরভাবেই বলল, "সি আই ডি! আবার কেন?"

সুদর্শন কারণটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। অর্ণব তার মুখোমুখি একটা সোফায় স্মার্টলি বসে পড়ে। অধিরাজ কিন্তু বসল না। বরং একটু নিরাপদ দূরত্বে বুকের ওপর হাত জড়ো করে চুপচাপ দাঁড়াল। তার তীক্ষ্ণ চোখদুটো ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটা জিনিস সূক্ষ্মভাবে জরিপ করছে।

"কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল মিঃ সুকোমল পান্ডে।" অর্ণবের কণ্ঠস্বর এবার নরম, "আপনি তো শুনলেনই বত্রিশ বছর আগের 'সার্জিক্যাল স' কিলারের কেসটা রি-ওপেনড্ হয়েছে...।" -

– "কে বলেছে আমার নাম সুকোমল পান্ডে?" সুকোমলের চোখে ত্রাস। সে নিজের দু'হাত ঘষতে ঘষতে বলল, "আমার নাম সুমঙ্গল পন্ডিত -

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুকোমলকে দেখছে। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে যে সুমঙ্গল পন্ডিতের ব্যাপারটা ঠিক কী! অর্ণব ঘাড় ঘুরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পিছনে অধিরাজের দিকে তাকায়। অর্ণব একটু চুপ করে থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যায়, "উনিশশো সাতাশি সালের একুশে অক্টোবর ঠিক কী হয়েছিল?"

"আমি ওখানে ছিলাম না।" অত্যন্ত দ্রুত উত্তর এল, "আমি লালবাজারের সামনে কখনও যাইনি! আমি কাউকে খুনই করিনি।" অধিরাজ চোখ কুঁচকে দেখল লোকটা নির্বিবাদে নিজের হাত দুটো ঘষছে। শীতকালে মানুষ যেমন করে ঠান্ডা হাতের পাতায় উষ্ণতা সঞ্চার করে, ভঙ্গিটা অবিকল তেমনই।

"আচ্ছা? তবে সে রাতে কোথায় ছিলেন আপনি?"

- "আমি ওর সঙ্গে ছিলাম!"

সুকোমলের তর্জনী বিদ্যুৎবেগে অর্ণবের পিছনদিকে কাউকে নির্দেশ করে। অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল, সে অধিরাজকে দেখাচ্ছে! ছড়িয়ে ছশো ছিয়াশি। অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনল অর্ণব। সামলে নিয়ে বলল—"আপনি উনিশশো সাতাশি সালের একুশে অক্টোবর রাত্রে ওঁর সঙ্গে ছিলেন?"

— "একদম।" সুকোমল পান্ডের মুখে দৃঢ় বিশ্বাসের ছাপ। সে আবার হাতে হাত ঘষল, "আমি ওকে ভালোবাসি। বিশ্বাস না হয়, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। ওর সঙ্গেই রাত কাটিয়েছি।"

অর্ণব ফের অধিরাজের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মনোযোগ এবার ডিভিডি প্লেয়ারের ওপর পড়েছে। মুখ যথারীতি নিরুত্তাপ। এদিকে যে তার আগের জন্মের প্রেমিক ভুলভাল বকে চলেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই! বেচারি উনিশশো সাতাশি সালে হামাগুড়ি দেওয়া তো দূর, জন্মায়ইনি। অথচ সুকোমল পান্ডে দাবি করছে যে গোটা একটা রাত তার সঙ্গে কাটিয়ে ফেলেছে! মিথ্যের কোনও মা-বাপ নেই!

অর্ণব বুঝে পেল না যে এই লোকটাকে কী প্রশ্ন করা যায়। বাপ ছেলে দু'জনেই মিলে অধিরাজকে নিয়ে যেরকম নির্লজ্জ রকমের টানাটানি শুরু করেছে তাতে এই মুহূর্তেই তার 'সার্জিক্যাল স' কিলারের অস্ত্রটা নিয়ে। দু'জনেরই গলায় বসিয়ে দেওয়ার একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হতে শুরু করল। সে কোনওমতে সাবধানে পরের প্রশ্নটা করে, "আপনি অফিসার দাশগুপ্তকে বা শিশির সেনকে চিনতেন?"

"না! আমি ওসব নাম জীবনে কখনও শুনিনি।" লোকটা বিন্দুমাত্রও না ভেবে উত্তর দিল। ভাবভঙ্গিতেই স্পষ্ট, অর্ণবের জেরা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। তার চোখ যথারীতি অধিরাজের ওপরই আটকাল। অধিরাজ তখন ডিভিডিগুলো খুব মন দিয়ে ঘেঁটে দেখছে। সুকোমল সপ্রেমে বলল, "ওখানে তোমার ফেভারিট ফিল্মগুলো আছে। আমি ভুলিনি!" -

এবার অধিরাজের মুখে যে মারকাটারি হাসিটা ঝলসে উঠল, তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ অর্ণবের! এই হাসি দেখলে সুকোমল পান্ডে এমনিই হাসতে হাসতে ফাঁসিতে চড়ে যাবে; কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করার দরকার নেই। সে অদ্ভুত পুরুষালি অথচ উদ্ধত-সুন্দর ছন্দে হেঁটে আসে সুকোমলের কাছে। আর বসল তো বসল, একেবারে সুকোমলের গা ঘেঁষে। খুব স্নিগ্ধ আর গভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "আমার নামটা মনে আছে?"

অর্ণব দেখল সুকোমল পান্ডের দু চোখ একেবারে উদ্ভাসিত। আহ্লাদিত হয়ে হাতে হাত ঘষে বলল, "তোমায় ভুলতে পারি? খুব মনে আছে! তোমার নাম বেবো ব্রিগ্যান্জা।"

ওটাই বাকি আছে! অধিরাজ ব্যানার্জী এখন বেবো ব্রিগ্যান্জা হল! আরও যে কী কী দেখতে হবে কে জানে। অর্ণব চটে মটে কিছু বলতে গিয়েও থম্‌কে গেল। অধিরাজের বাঁ হাতের তর্জনী খুব আস্তে হলেও নেতিবাচক ভঙ্গিতে নড়ছে। ইঙ্গিত স্পষ্ট; চুপ থাকো।

"শিশির সেনকে তুমি চেনো না?" অধিরাজের হাসিটা এবার একরাশ মধু ঢেলে দিল সুকোমলের চোখে। তার দু'চোখের উষ্ণ দৃষ্টি সুকোমলকে - উত্তপ্ত করছে। সে জিজ্ঞাসা করে, "তবে উনি কেন বলছেন যে তুমি খুন করেছ?"

ম্যাজিক দুরন্ত কাজ করল! তার হাসির উষ্ণতায়, সুগন্ধের আবেশে সুকোমলের চোখ প্রায় খুঁজে এসেছে। সে অধিরাজের হাতটা খপ্ করে ধরে স্খলিত স্বরে বলল, "আমি খুন করিনি! আমি খুনী নই। আমি শুধু সার্জিক্যাল স'টা চুরি করেছিলাম হাসপাতাল থেকে।"

"ধুস্।" অধিরাজের ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গি মানিনী রাধাকেও বোধহয় হার মানাবে। সে হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তুমি ভীষণ মিথ্যে কথা বলো। ইউ লায়ার! বিশ্বাস নেই।"

সে আবার খপ্ করে প্রেমিকের হাত জড়িয়ে ধরেছে, "আমি মিথ্যে বলছি না। সার্জিক্যাল স' দিয়ে আমি কাউকে মারিনি। শুধু চুরি করেছিলাম।" অর্ণব ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল অধিরাজের ডান ভুরুটা কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গিয়েছে। কিলার অ্যাটিটিউড! সে স্তম্ভিত! এরকম অস্কারজয়ী অ্যাকটিং কবে শিখল লোকটা! সুকোমল পান্ডের কপালে দুঃখ আছে!

"কার কথায় চুরি করেছিলে 'সার্জিক্যাল স'টা? এমন কে স্পেশ্যাল আছে যার জন্য চুরিও করতে হল? আমি তো বলিনি! নাকি বলেছিলাম?" ফের খুনী অ্যাটিটিউড! সুকোমল তার হাত নিয়ে আদর করতে করতে বলল, "না তুমি বলোনি। আমি লোকটাকে চিনি না। জীবনেও দেখিনি। মুখটা লাল কাপড়ে ঢাকা ছিল। ও টাকা দিয়েছিল...! অনেক টাকা।"

"মুখ না দেখলেও অন্য কিছু দেখেছ নিশ্চয়ই?" এবার প্রশ্নের ভঙ্গি তীর্যক, "কিছু মনে নেই?"

সুকোমল যেন কিছু চিন্তা করছে। তার দৃষ্টি একটু উদভ্রান্ত হয়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। যেন বহুবছর আগের ধুলো পড়া অতীতকে খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে আপ্রাণ। কিন্তু অনেক

হাতড়েও ইঙ্গিত জিনিস পাওয়া গেল না। সে হতাশ ভঙ্গিতে বলে, "নাঃ! লোকটা একটা স্কুটারে চেপে এসেছিল; শুধু এইটুকু মনে আছে!"

"স্কুটারের নম্বর?"

ফের ব্যর্থ হয়ে মাথা নাড়ল সুকোমল, "নাঃ। দেখিনি।"

এইবার যেন কিছু মনে পড়ল তার। চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "হ্যাঁ। স্কুটারটার রঙ তিন রকম ছিল।"

"তিনরকম মানে? তিনটে কালার একসঙ্গে?" "হ্যাঁ।" সুকোমল একটু ভেবে নিয়ে বলল, "লাল, হলুদ, কালো!" লাল, হলুদ, কালো! এ কী উদ্ভট কম্বিনেশন! অর্ণব সরুদৃষ্টিতে একবার লোকটাকে মেপে নিল। এরকম স্কুটারের রঙ কখনও হয়। নির্ঘাৎ মিথ্যে বলছে। তাছাড়া গোটা ইন্টারোগেশনে তো এই সব কথা একবারও বলেনি সুকোমল পান্ডে! এমনকি কোর্টেও টু শব্দটিও করেনি। বরং একের পর এক মিথ্যে কথা বলে গিয়েছে। এখন যে একেবারে পাঁচালি পড়ার মতো গড়গড়িয়ে সব বলে যাচ্ছে! সত্যি না মিথ্যে? -

অধিরাজ কিন্তু আর কথা বাড়াল না। সে অর্ণবের দিকে ইশারা করে উঠে দাঁড়ায়। চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে ঘাড় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল সুকোমল পান্ডের দিকে। এককথায় সে দৃষ্টি অপ্রতিরোধ্য! মৃদু হেসে বলল, "তোমার নামটা যেন কী?"

পান্ডেজি হাতে হাত ঘষে বলল, "সুমঙ্গল পন্ডিত। তোমার নাম?" অধিরাজের মুখে দুষ্টুমি মাখা হাসিটা উঠে এসেছে, "বেবো ব্রিগ্যান্জা। বাই।"

(৯)

সুকোমল পান্ডের ফ্ল্যাটের বাইরে আসতে না আসতেই অধিরাজের মুখের প্রত্যেকটি রেখা বদলে গেল। রহস্যময় বা চিরপরিচিত হাসিটা একদম মুছে গিয়েছে। এখন তার মুখ একদম আসন্ন কালবৈশাখীর আগের কালো আকাশের মতো থমথমে। একটি কথাও না বলে, কোনওরকম মন্তব্য না করে গটগট করে লিফটে উঠে গেল। এটা সম্পূর্ণ তার স্বভাববিরুদ্ধ। চিরকালই লিফটের চেয়ে সিঁড়ি বেশি পছন্দ করে। সিঁড়ি ভাঙতে তার জুড়ি নেই। অথচ আজ চিরাচরিত ফেভারিট সিঁড়ি ছেড়ে লিফ্ট! অর্ণব লক্ষ্য করল, সে প্রায় বাতিকগ্রস্তের মতো বারবার ওয়েট টিস্যু দিয়ে দু'হাত মুছছে। এত জোরে টিস্যু ঘষছে যে ভয় হয়, হাতের চামড়াই না উঠে যায়! তার হাত দুটো যে অল্প অল্প কাঁপছে সেটাও নজর এড়ালো না। অর্ণব কোনও মন্তব্য না করে পকেট থেকে একটা নয় মিলিলিটারের ছোট্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার তাকে দিয়ে দিল।

অন্যান্যবারের মতো এবার কিন্তু আর ড্রাইভিং সিটে বসল না অধিরাজ। বরং পাশের সিটে বসে ক্লান্তভাবে দেহটাকে এলিয়ে দিল। অর্ণব একটিও প্রশ্ন না করে চুপচাপ ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই একঝলক দেখল, সে রীতিমতো দরদর করে ঘামছে।

"স্যার?"

-"রঙ?"

"উঁ?" অধিরাজের অন্যমনস্ক উত্তর।

"নিন।"

- অধিরাজের দিকে নিজের রুমালটা এগিয়ে দিয়েছে অর্ণব। সে রুমালে মুখ মুছে নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস ।"

অর্ণবেরও ভালো লাগছিল না। এটা কেস নয়; রীতিমতো মেন্টাল টর্চার। বত্রিশ বছর আগে শিশির সেন এ পাবলিককেই ধরেছিলেন! দুনিয়ায় কি আর কেউ ছিল না গ্রেফতার করার মতন? কী পিকিউলিয়ার ক্যারেক্টার। বাবা ও ছেলে; দু'জনেই সমান। গে, বা

ট্রান্সজেন্ডার সম্পর্কে কোনওরকম সোশ্যাল ট্যাবু নেই অর্ণবের। কিন্তু নিজেকে বা অধিরাজকে এমন কারোর বয়ফ্রেন্ড ভাবতে তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। এটা উদারতার প্রশ্ন নয়। নিজের নিজের পছন্দের ব্যাপার। যে পুরুষ নিজের সঙ্গী হিসেবে পুরুষকেই পছন্দ করে তারও অধিকার আছে নিজের মতোই কাউকে বেছে নেওয়ার। নিজের মতো নিজে থাকুক, সুখী থাকুক! কিন্তু যে অন্য কিছু পছন্দ করে, তাকে ধরে টানাটানি কেন বাপু!

অন্যদিকে অধিরাজের ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। সে সুকোমল পান্ডে বা সুদর্শন পান্ডেকে ঘৃণা করে না। কিন্তু আজ তার নিজের ওপরই ঘৃণা হচ্ছে! সুকোমল বা সুদর্শনকে ঈশ্বর যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনই হয়েছে তারা। তাদের ভালোবাসা, পছন্দ বা কামনার ওপর নিজেদের হাত নেই। কিন্তু সে নিজে কী করে এল! পেটের কথা বের করার জন্য অল্পবিস্তর নিজের রূপকে ব্যবহার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেই মানুষটির সঙ্গেও এখন তাকে জবরদস্তি নাটক করতে হচ্ছে, যে নিজেই বড় হতভাগা! যে লোকটি ভালোবাসার মানুষের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত, তাকে ঠকিয়ে এল। একটা অসহায়, নিপীড়িত মানুষকে লোভ দেখানোর মতো পাপ আর নেই। তার ইচ্ছে করছিল, নিজেকেই ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটা চড় কষায়। সেই ভালোবাসা, সেই বিশ্বাসের উষ্ণতা এখনও নিজের হাতে অনুভব করছে। সেই স্পর্শকেই মোছার এক অক্ষম প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। ভীষণ একটা আত্মঅবমাননায়, অপরাধবোধ ও আত্মগ্লানিতে ডুবে যাচ্ছিল সে। সুকোমল পান্ডের গে' হওয়া নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু যেমনই হোক্, ও মানুষটারও অনুভূতি আছে, প্রেম আছে, বিশ্বাস আছে। সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যাপার যে লোকটার অনুভূতিকে একরকম এক্সপ্লয়েটই করে এল অধিরাজ। সচরাচর সমকামীরা প্রেমের বিষয়ে অসম্ভব দুর্বল আর সরল হয়। তারা তাদের প্রেমিককে একরকম অন্ধবিশ্বাসই করে। অথচ সেই বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এল। এর থেকে ঘৃণ্য আর কোনও কাজ আছে কি?

"জল আছে?" অর্ণব কোনও কথা না বলে ড্যাশবোর্ডের ওপরে রাখা জলের বোতলটাও এক হাতে বাড়িয়ে দিল। অধিরাজ ঢকঢক করে পুরো বোতলটাই গলায় ঢেলে দেয়। তার নার্ভের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে তা বডি ল্যাঙ্গোয়েজেই স্পষ্ট।

"একপাশে সাইড করো তো।"

– "নো স্মোকিং স্যার।" ড্রাইভ করতে করতে মাথা নাড়ে অর্ণব, "অলরেডি একটা আস্ত সিগারেট আপনি সকালেই খেয়ে ফেলেছেন।"

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে! এতক্ষণে হাসল অধিরাজ। শিশুসুলভ হাসিটা অনেকক্ষণ পরে তার মুখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে, "নোটেড। কিন্তু কফি তো চলবে। নাকি সেটাও বারণ?"

অর্ণব মৃদু হেসে একটা কফিশপের সামনে গাড়ি সাইড করল। কফিশপটা খুব বড় নয় — তবে বেশ সাজানো গোছানো। ভেতরে মৃদু আলো। মিউজিক সিস্টেমে এফ এমে হিন্দি গান বাজছে। এখন খুব বেশি কাস্টমার নেই। তবে দু'চারজন কলেজ পড়ুয়া টেবিলে বসে কফি খেতে খেতে গজল্লা করছে। আর একজন বৃদ্ধ একখানা গোদা বই পড়তে পড়তে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন।

অধিরাজ পাঁচ মিনিট ধরে মেনুকার্ড খুব মন দিয়ে দেখল। কী অর্ডার করবে বুঝতে পারছে না। সে বয়কে দু-তিনবার কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বেচারি ছেলেটিকে আরও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত কে জানে। তার আগেই অর্ণব বলে উঠল, "একটা ব্ল্যাক এসপ্রেসো রোমানো, একটা ব্ল্যাক কফি আর দু'প্লেট স্যান্ডউইচ। একটা চিকেন ক্লাব, অন্যটা নর্মাল হলেই চলবে।"

বয় অর্ডার নিয়ে চলে গেল। অধিরাজ বিস্মিত, "বুঝলে কী করে যে আমি এসপ্রেসো রোমানো আর চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচই অর্ডার করব।"

"যেমন করে আপনি বোঝেন যে আমি চাউমিন বা মোমোই খাবো।" অর্ণব ফিক্ করে হেসে ফেলে, "আমার গোটা কেরিয়ারে আপনি যতবার কোনও ক্যাফেতে ঢুকে কফি খেয়েছেন- প্রত্যেকবারই পুরো পাঁচ মিনিট মেনুকার্ড দেখে, তিনবার স্পেশ্যাল কী আছে জিজ্ঞাসা করে, শেষপর্যন্ত এসপ্রেসো রোমানো আর চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচই অর্ডার করেছেন স্যার।" "মাই গড!" অধিরাজ ভ্রূ ভঙ্গি করেছে, "তুমি কি আমার মাউথ ফ্রেশনারের ব্র্যান্ডটাও জানো!" -

"ব্র্যান্ডটা জানি না। তবে আপনি মিন্ট পছন্দ করেন।" অর্ণব মুচকি মুচকি হাসছে, "কারণ ঐ গন্ধটাই সবচেয়ে বেশি পাই। এখনও পাচ্ছি।"

-"আপকা ক্যায়া হোগা জনাব-এ-আলি!" অধিরাজ হেসে উঠল, "তুমি তো আমার জীবন্ত বায়োগ্রাফি দেখছি। এখন বলো কেসের ব্যাপারে কী বুঝলে?"

"কিছুই বুঝলাম না স্যার।" অর্ণব চিন্তিত, "যে পাবলিক গত বত্রিশ বছর ধরে মিউট মোডে ছিল, সে হঠাৎ গড়গড়িয়ে আস্ত গান গেয়ে ফেলল কী করে। সত্যি বলছে না মিথ্যে।"

"কিছু কথা সম্ভবত সত্যিই বলেছে।" অধিরাজ বলল, "নিজের নামটা অবশ্য মিথ্যে বলেছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে, আজ 'বেবো ব্রিগ্যান্জা' নামটা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হল?"

"হ্যাঁ। বেবো ব্রিগ্যান্জা। বার বাউন্সার রকির প্রাণের বন্ধু কাম ড্রাগ - স্মাগলার!" অর্ণবের চোখে জিজ্ঞাসা, "এই কেসে তার লিঙ্ক আছে?"

- "অবশ্যই আছে। সাসপেক্ট লিস্টে তার নাম আছে। ভিকটিম্ রকি তাকে চিনত এবং সাসপেক্ট সুকোমল পান্ডে তার নাম জানে। হয়তো নামের থেকেও জানাশোনাটা আরও গভীরে। 'বেবো' নামটা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক কি? তার স্বভাব চরিত্রের খবর এখনও জানি না। তবে আমি আশ্চর্য হব না, যদি সেও একজন গে' হয়। লিঙ্ক তো বন্তা হ্যায় অর্ণব। সুকোমল পান্ডে এতদিন ইন্টারোগেশনে এসব বলেনি কারণ সে সত্যিই একজন প্যাথোলজিক্যাল লায়ার। কিন্তু বত্রিশ বছর আগে সেটা ইনভেস্টিগেটিং অফিসাররা জানতেন না।"

ক্যাফের বয় ধূমায়িত কফির কাপ আর স্যান্ডউইচের প্লেট টেবিলে রেখে গেল। এসপ্রেসো রোমানো'র লম্বা কাপে আলতো চুমুক মারল অধিরাজ, "একজন প্যাথোলজিক্যাল লায়ারের নিয়মই হচ্ছে যখনই সে বিপন্ন বোধ করে, তখনই ছড়বেছড় মিথ্যে বলতে শুরু করে। এবং ফুল কনফিডেন্সে মিথ্যে বলে। আর তার মিথ্যে বলারও একটা বিশেষ লক্ষণ আছে, যেটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়। কেউ প্রচণ্ড ঘামে, কেউ নাক চুলকোয়, কেউ বা একটা পায়ের পাতার ওপর আরেকটা পাতা তুলে দেয়। মানে, প্রত্যেক প্যাথোলজিক্যাল লায়ারেরই কোনও না কোনও ম্যানারিজম্ম আছে। সুকোমলের অভ্যাস হচ্ছে ভুলভাল বলার সময়েই সে দু'হাত ঘষতে থাকে।

বত্রিশ বছর আগে তাকে কড়া পুলিশি ইন্টারোগেশনে পড়তে হয়েছিল। কোর্টে, থানায়, জেলে— সবসময়ই সে বিপন্ন বোধ করেছিল। আজও যদি তাকে তুমি সরাসরি ইন্টারোগেট করতে তাহলেও সে এম্ব্যারাসিং উত্তরই দিত। অন্তত শুরুতেই বেশ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর নির্ভেজাল মিথ্যে দিয়েছিল। কিন্তু আমি লোকটাকে পুরো ঘেঁটে ঘ করে দিলাম। আজ সে পুলিশি প্রশ্নের সামনে পড়েনি। প্রেমিকের আন্তরিক প্রশ্নের সামনে পড়েছিল যেখানে বিপন্নবোধ করার প্রশ্নই নেই। কোনও থ্রেট নেই।" তার মুখে সামান্য বিষণ্নতা ছাপ ফেলল, "যদিও অভিজ্ঞতাটা আমার পক্ষে একেবারেই সুখকর নয়। তবু বাধ্য হয়ে লোকটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হল যেখানে সে দুর্বল। ওকে শুধু একটু ডাইভার্ট করে দিয়েছিলাম। তখন তার মধ্যে রোম্যান্টিসিজম্ কাজ করলেও কোনওরকম ভয় ছিল না। তাই তখন সে সত্যি কথাই বলেছে।"

এবার গোটা ব্যাপারটাই অর্ণবের মাথায় ঢুকল, "তার মানে সত্যিই কারোর কথায় সুকোমল সার্জিক্যাল স চুরি করেছিল।"

"একদম।" অধিরাজ স্যান্ডউইচ তুলে নেয়, "তুমি লক্ষ্য করোনি যতবার ও মিথ্যে বলছিল ততবারই হাতে হাত ঘষছিল, কিন্তু যখন বলল "আমি খুন করিনি," তখন আমার হাত ধরেছিল। এরপর একবারও কিন্তু হাতে হাত ঘষেনি। আবার শেষে যখন বলল ওর নাম সুমঙ্গল পণ্ডিত, তখন আবার ফের হাত ঘষার ম্যানারিজমটা দেখা গেল। ঐ স্টেটমেন্টটা মিথ্যে। এইটুকু আন্দাজ করা যায়, তার মাঝখানে কোনও মিথ্যে সে বলেনি। কেউ টাকার বিনিময়ে ওকে দিয়ে সার্জিক্যাল স'টা চুরি করিয়েছিল, লোকটার স্কুটারের রঙ লাল, হলুদ, কালো- এগুলো সব সঠিক স্টেটমেন্ট। অন্তত তেমনই আশা করছি।"

- "কিন্তু ও বুঝল না যে আপনি বেবো ব্রিগ্যান্জা নন?"

"খুব বুঝেছে।" অধিরাজ একটু বিষণ্নভাবেই বলে, "মুশকিল হল যে কোনও সমকামী মানুষ ভেতরে ভেতরে ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়। তাই সবসময়ই তার মধ্যে সঙ্গী খোঁজার প্রবণতা থাকে। ওর মধ্যেও আছে। ও খুব ভালোভাবেই জানে যে আমি বেবো ব্রিগ্যানজা নই। গোটাটাই মিথ্যে বলেছে, ইনক্লুডিং একুশে অক্টোবরের রাতে আমার সঙ্গে থাকার ব্যাপারটা। টেকনিক্যালি গোটাটাই ইম্পসিবল! কিন্তু যে মুহূর্তে আমি ওকে প্রশ্রয় দিলাম,

সেই মুহূর্তেই মিথ্যেটাকেই আঁকড়ে ধরল। কিচ্ছু করার নেই। লোকটার মনস্তত্ত্বটাই এমন। একেই সমকামী, তার ওপর আবার প্যাথোলজিকাল লায়ার!"

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অর্ণব একটু থেমে জানতে চায়, "তবে ওকে আরও ইন্টারোগেট করলেন না কেন স্যার? জিজ্ঞাসা করতে পারতেন যে একুশে অক্টোবরের রাতে লালবাজারের সামনে ও কী করছিল?"

"পন্ডশ্রম। কারণ ঐ প্রশ্নটা ওকে পুলিস এতবার জিজ্ঞাসা করেছে যে আবার জিজ্ঞাসা করলেই ফের ওর মাথায়, 'ডেঞ্জার ডেঞ্জার' করে সাইরেন বাজত। ও সতর্ক হয়ে যেত। আর ডেফিনিটলি মিথ্যেই বলত। দেখোনি? ওকে যে ক'টা প্রশ্ন করেছি সব পুলিসের সিলেবাসের বাইরে। আর লোকটা আমায় অন্ধের মতো বিশ্বাস করে সঠিক উত্তর দিয়েছে।" সে একটু অন্যমনস্ক, "জাস্টিস গাঙ্গুলি সম্ভবত ঠিকই বলেছেন। সুকোমল খুনী নয়। কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্স আছে, ও আরও কিছু জানে। ভয়ের চোটে বলছে না। ওকে আরও এক্সপ্লোর করতে হবে। তবে খুব ধীরে সুস্থে।"

সুকোমল পান্ডেকে এক্সপ্লোর করতে হবে! শুনেই অর্ণবের হাত পা পেটে সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়! কোনওমতে বলল, "স্যার, ওকে আরও জেরা করা জরুরি? এমনিতেই 'সর্বনাশিনী' কেসের মানসী জয়সওয়াল এখনও আমার মাথায় হরর ফিল্মের নায়িকার মতো ঘুরছে। আপনি আবার সুকোমল পান্ডেকে এক্সপ্লোর করার কথা ভাবছেন!"

— "মানসী জয়সওয়ালের কেসটার চেয়ে এই কেসটা আরও কঠিন অর্ণব।" অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "অ্যাট লিস্ট মানসী জানতেন কতটা এক্সপেক্ট করা যায়। কিন্তু এই মানুষটা জানে না। নিজেকে এবার সত্যিই ভীষণ নীচ মনে হচ্ছে!"

অর্ণব কোনও কথা না বলে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বসের দিকে। আলটপকা কথাটা বলে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি অধিরাজের মানসিক অবস্থা এই মুহূর্তে ঠিক কী! ওদিকে খুনী কাউন্টডাউন শুরু করেছে। এদিকে আবার সুকোমল পান্ডের মতো সাসপেক্ট! তদন্তে দ্রুত অগ্রসরও হওয়াও যাচ্ছে না। তার ওপর এখন আবার স্বয়ং এডিজি শিশির সেনকে জেরা করতে হবে!

"তবে সুকোমল পান্ডে বেবি ক্রিম মাখে না, বেবি পাউডারও নয়। আমি ওর গা ঘেঁষেই বসেছিলাম। একটারও গন্ধ পাইনি। সে টম্ অ্যান্ড জেরিও দেখে না। অন্তত তার ঘরে 'টম অ্যান্ড জেরির' ডিভিডি নেই।" "ফেভারিট ফিল্মের কথা কী বলছিল?"

অধিরাজ হেসে ফেলল, "ব্লু ফিল্ম। লোকটার অ্যাডাল্ট ছবি দেখার খুব শখ। বাদ দাও।"

-"কিন্তু ওকে এক্সপ্লোর করতে গেলে যদি অ্যাডাল্ট ফিল্মের শখ ফের চাগাড় দিয়ে ওঠে?"

অর্ণবের অবস্থা দেখে হেসে ফেলেছে এবার আমি সিনে আসব না। আমাদের লেডি অফিসার আছেন কী করতে? কী যেন?" ব্যস্! হয়ে গেল! অর্ণবের মনে হয়, এরপর থেকে তাকে আত্রেয়ী দত্তের নামের নামাবলী পরে ঘুরতেই হবে। সে আস্তে আস্তে বলে, "মিস্ দত্ত স্যার।"

"ইয়েস। মিস্ দত্ত।" সে কফির কাপে চামচ নাড়াতে নাড়াতে বলে, "মিস্ দত্তকে সুকোমল পান্ডের পেছনে ফিট্ করে দিতে হবে। হোমোসেক্সুয়াল মানুষ যতটা সেম সেক্সের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয়, ঠিক ততটাই অপোজিট সেক্সের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ও কমফর্টেবল। অবশ্যই সেই অপোজিট সেক্সের মানুষটিকেও ফ্রেন্ডলি হতে হবে। কারণ একজন সমকামী পুরুষের মনোভাব অবিকল একটি মেয়ের মতোই হয়। সেজন্যই মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ না থাকলেও চমৎকার 'সখা' হতে পারে। সুকোমল তোমাকে আমাকে দেখলেই প্রেম করতে চাইবে, কিন্তু মিস্ দত্তের সঙ্গে খুব চট্‌পট্ বন্ধুত্ব করবে। লোকটা এমনিতেই একা। মিস্ দত্ত যদি একটু সহানুভূতি নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন তবে সে একেবারে মনের কথা, প্রাণের কথা উজাড় করে দেবে। আর

অধিরাজ, "না।

এখনও সুকোমল পুরুষ পুলিস অফিসারদের দেখেই অভ্যস্ত। ১৯৮৭ তে লেডি অফিসাররা থাকলেও এতটা কমন ছিল না। মিস্ দত্ত যদি সাধারণ ড্রেসে ওর সামনে আসেন, তবে ও ভাবতেই পারবে না যে একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। থ্রেটন্ড ফিল করার প্রশ্নই ওঠে না।"

অর্ণবের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এই বুদ্ধিটা মন্দ নয়। অন্তত অনেক

কম বিপজ্জনক! সে ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দেয়, “তাহলে স্কুটারের লিডটা?” -“খুনী কি এখনও সেই মান্ধাতা আমলের স্কুটার নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্ণব? অন্তত লাল, হলুদ, কালোর জায়গায় যে নীল, সবুজ, সাদা হয়ে যায়নি তার কী গ্যারান্টি?” অধিরাজ একটু ভেবে বলে, “কিন্তু ভাববার বিষয় একটাই। স্কুটার কখনও তিনরকমের রঙের হয় না। অন্তত বত্রিশ বছর আগে তো ছিল না। স্কুটারের কালার একটাই। তবে এখানে তিনটে রঙ আছে! কেন? লোকটা স্কুটারটাকে হয় রঙ করিয়েছিল, নয় নিজেই কালার করে নিয়েছে। কিন্তু লাল, হলুদ, কালোই কেন?” – তার চোখ দুটো আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। এই লাল, হলুদ, কালোর মধ্যে কিছু তো রহস্য আছেই। হয়তো অপরাধীর মনের অবচেতনের কোনও গোপন খবর লুকিয়ে আছে এই কম্বিনেশনের মধ্যে। লাল, হলুদ, কালো রংগুলো কিছু একটা নির্দেশ করতে চাইছে। ঠিক কী? জার্মান ফ্ল্যাগ?কোরাল স্নেক? না অন্য কিছু? কোনও অর্থ তো এর মধ্যে আছেই। নয়তো খামোখা একটা লোক নিজের স্কুটারে এমন উদ্ভট রঙ করবে কেন!

“আচ্ছা স্যার...?”

অর্ণবের কণ্ঠস্বরে তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়। সে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল, “উঁ?” “একটা লোক একের পর এক কতগুলো মানুষকে ক্রমাগত স্টক করে গেল যাদের মধ্যে চারজন পুলিস অফিসারও ছিলেন, সবাই তার অস্তিত্ব টের পেলেন, অথচ কেউ দেখতেই পেলেন না! খুনী কি ইনভিসিবল ম্যান?” অধিরাজ মৃদু হাসল, “ইনভিসিবল নয়। আচ্ছা বলো তো, এই টেবিলে তুমি আমি ছাড়া আর কে ছিল?”

অর্ণব একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, “কে থাকবে! আপনি আর আমিই তো শুরু থেকে বসে আছি। আর কেউ ছিল না। অবশ্য আমাদের আগে যদি কেউ...।”

“আগে নয়। আমরা যতক্ষণ বসে আছি, তার মধ্যে আর কে ছিল?”

“কেউ না!”

“অধিরাজ দুষ্টু হাসি হাসছে, “তাহলে এই কফির কাপ আর স্যান্ডউইচের প্লেট কে রেখে গেল?”

“ওঃ হো!” এবার অর্ণব নিজের ভুল বুঝতে পারে, “বয়।”

“এগজ্যাক্টলি। ঐ একটি লোক আমাদের অর্ডার নিয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ বেচারি এই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর খাবার ডেলিভারিও দিয়েছে। কিন্তু তুমি ওকে লক্ষ্যই করোনি।” সে বুঝিয়ে বলে, “তার কারণ কফিশপে বয়ের অস্তিত্ব ভীষণ স্বাভাবিক ও সাধারণ। তাই তাকে কেউই গ্রাহ্য করে না। আমাদের খুনীও তেমনই। এতটাই স্বাভাবিক তার উপস্থিতি, এতটাই সাধারণ চেহারা যে নজরেই আসে না। তার ওপরে ছদ্মবেশে থাকাও আশ্চর্য নয়। সে সিনে থাকে বটে কিন্তু চোখে পড়ে না। থেকেও নেই; ইনভিসিবল! ক্লিয়ার?”

“ইয়েস স্যার।”

বলতে বলতেই ন্যাপকিনে মুখ মুছল অধিরাজ। ঘাড় ঘুরিয়ে সামান্য উঁচু স্বরে বয়কে ডাকল, “বিল প্লিজ।”

বিল মিটিয়ে দিয়ে দুই অফিসারই গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল কফিশপ থেকে। বয়টি মাথা নীচু করে টেবিল পরিষ্কার করছে। কফির কাপ, প্লেট তুলে নিয়ে ব্যবহৃত ন্যাপকিনটা ডাস্টবিনে ফেলে দিতেই যাচ্ছিল। তার আগেই একটি মানুষ তার রাস্তা আটকে দাঁড়াল। এতক্ষণ কফিশপের এককোণে চুপচাপ বসে কফি পান করছিল। এবার উঠে এসেছে। বয়কে চাপা গলায় বলল, “ওটা দিন তো।”

বয় অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। লোকটি কি তার হাতের ন্যাপকিনটা চাইছে! কিন্তু ওটা তো ব্যবহৃত!

“আমি আপনাকে নতুন ন্যাপকিন দিচ্ছি স্যার।”

বয়টি সম্ভবত নতুন ন্যাপকিনের খোঁজেই যাচ্ছিল। কিন্তু ফের তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে মানুষটা। এবার যেন একটু জেদি ও রূঢ়ভাবে বলল, “আমি হাতের টিস্যু পেপারটাই চাইছি।”

এরকম অদ্ভুত আবদারে ঘাবড়ে গেল বাচ্চা ছেলেটা। খুব সূক্ষ্ম চোখে সামনের আগন্তুককে মাপছে। এই লোকটা একটা ইউজড্ ন্যাপকিন নিয়ে কী করবে!

আগন্তুক বোধহয় তার দ্বিধা বুঝতে পারে। সে আর কোনও কথা না বাড়িয়ে বুক পকেট থেকে একটা নোট বের করে বয়ের নাকের সামনে ধরল। চোখ গোল গোল করে অল্পবয়েসী

বয় দেখল পুরো দু হাজার টাকার একটা নোট তার সামনে! একটা ইউজড্ ন্যাপকিনের দাম দু'হাজার টাকা! লোকটা পাগল নাকি!

একহাতে নোটটা এগিয়ে দিয়ে অন্য হাত বাড়াল মানুষটা, "ওটা আমার।"

বয় এবার বিনা দ্বিধায় ন্যাপকিনটা হস্তান্তরিত করে টাকাটা নিয়ে নিয়েছে। সম্ভবত এমন কাণ্ড সে বাপের জন্মেও দেখেনি। কিন্তু কে কার ন্যাপকিন নিয়ে কী করছে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দু'হাজার টাকার নোটটা।

"টয়লেটটা কোন্ দিকে-?"

"লেফট সাইডে।"

বয়টি চলে যেতে না যেতেই লোকটা দ্রুত বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম। এবং নির্জনও বটে। এই মুহূর্তে ঐ একটি মানুষ ছাড়া টয়লেটে আর কেউ নেই। সে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। যাক্, এতক্ষণে একটু প্রাইভেসি পাওয়া গেল! এখানে তাকে কেউ দেখবে না।

লোকটা এমন সাবধানে ন্যাপকিনটাকে ধরে আছে, যেন অত্যন্ত দুর্মূল্য জিনিস! কাঁপা কাঁপা উত্তেজিত আঙুলে দুমড়ে-মুচড়ে থাকা ন্যাপকিনটা খুলল। কোথায় কফির দাগ! কোথায় লেগে আছে তার অভিপ্রেত একজোড়া ভেজা ঠোঁটের ছাপ! এখানেই থাকা উচিত। কারণ একমাত্র সে-ই এই টিস্যুপেপারে মুখ মুছেছে। একটু দূরে বসলেও তার প্রত্যেকটি মুভমেন্ট স্পষ্ট দেখেছে ও। ভুল হওয়ার কথাই নয়। খুঁজতে খুঁজতেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই তো! আছে! কফির দাগ আছে! উন্মত্তের মতো কফি স্টেইনের গন্ধ শুকল পাগল মানুষটা। আঃ। তার চোখের সামনে ফের ভেসে উঠল একজোড়া ভেজা পুরুষালি ঠোঁট। তীক্ষ্ণ চোখের রাগী রাগী দৃষ্টি! একটা ভীষণ উন্মাদনা বুকের পাঁজরগুলোকে ভেঙে চুরে উঠে আসছে। লোকটা টের পেল তার প্রতিটি স্নায়ু, দেহের প্রতিটি পেশি থরথর করে কাঁপছে। নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো সে ন্যাপকিনে মুখ ডুবিয়ে দিল। পাগলের মতো - চুমু খাচ্ছে টিস্যুপেপারটাকে। তীব্র কামনায় ফেটে পড়ছে তার প্রতিটি চুম্বন। নেশা নেশা! আগুন আগুন! লোকটা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। কোনও এক

অজানা তীব্র জ্বরের ঘোর তাকে ঘিরে ধরছে। ন্যাপকিনটাকে বুকে চেপে ধরে স্খলিত স্বরে বলল, "তুমি কি আমায় পাগল করে দেবে?"

(১০)

"সুমঙ্গল পন্ডিত নামের কাউকে চেনেন স্যার? কিংবা অফিসার দাশগুপ্ত কি ঐ নামের কাউকে চিনতেন?" এডিজি শিশির সেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। সম্ভবত 'সুমঙ্গল পন্ডিত' নামটা তাঁর চেনা কি না, সেটাই ভাবছেন। বেশ খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "নাঃ। সুমঙ্গল বলে তো কাউকে চিনি না। আর বত্রিশ বছর পরে মনে করাও মুশকিল। কেন বলো তো?"

– "এই কেসটার শুরু থেকে সুকোমল পান্ডে নিজের নাম সুমঙ্গল পন্ডিত বলে আসছে কেন? ইনফ্যাক্ট এখনও নিজের নাম সুমঙ্গল পন্ডিতই বলল।" অধিরাজের কথা বলার ভঙ্গি অত্যন্ত শান্ত ও নম্র, "ও যে কোনও র‍্যান্ডম নাম বলতে পারত। বাট হোয়াই সুমঙ্গল পন্ডিত?" শিশির সেনের কপালে চিন্তার ছাপ, "সেটা আমারও মনে হয়েছিল। ব্যাপারটা একটু পিকিউলিয়ার ঠিকই। তবে আমি ভেবেছিলাম, হয়তো শব্দগত সাযুজ্যের জন্য বলছে।"

- "সেক্ষেত্রেও সুকোমল থেকে সুকমল, সুনির্মল, সুবিমল হতে পারত। ইনফ্যাক্ট ওটাই বেশি সহজ অপশন। কিংবা পান্ডে থেকে পান্ডা। একটা কাল্পনিক নামই তো বলতে হবে। সেটা এক্স ওয়াই জেড; সব কিছু হতে পারে। বেছে বেছে সুমঙ্গলই কেন! নামটা আদৌ কমন নয়।"

শিশির সেন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ কথাটায় যুক্তি আছে। "সব মিথ্যের মধ্যেই কোথাও না কোথাও একটা সত্যি আবছাভাবে লুকিয়ে থাকে স্যার।" সে বলল, "আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, 'সুমঙ্গল পন্ডিত' নামের কেউ বাস্তবেই এক্সিস্ট করে। নামটা একদম আকাশ থেকে পড়েনি। আর কেস ফাইল অনুযায়ী সুকোমলবাবুর প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই বারবার পালটে গিয়েছে। কিন্তু এই নামটা কনস্ট্যান্ট।"

—"ভাববার বিষয়।" তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন অধিরাজের দিকে, "তোমার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু গোটা কেসটায় সুমঙ্গল পন্ডিত বলে কেউ ছিল না। অন্তত আমি এমন নামের কাউকে চিনি না।"

– "অফিসার দাশগুপ্ত চিনতেন?"

"সুমঙ্গল... সুমঙ্গল...!" বেশ কয়েকবার নামটা বিড়বিড় করলেন এডিজি সেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনের কথা বোঝা অসম্ভব। কিন্তু চোখ দুটো ডুবে আছে গভীর চিন্তায়। হয়তো বত্রিশ বছরের পুরনো কাহিনির পাতায় একটি বিশেষ চরিত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু শেষমেষ ব্যর্থ হয়ে হতাশভাবে বললেন, "নো! আই কান্ট রিমেমবার! সুমঙ্গল বলে কারোর কথা স্যার কখনও বলেননি।"

অর্ণব বুঝতে পারল 'সুমঙ্গল পন্ডিত' নামটা আবার একটা ডেড-এন্ডেই যেতে চলেছে। অধিরাজ তবু নাছোড়বান্দা, "ওকে, সুমঙ্গল ছাড়ুন। অফিসারদের অনেকেরই সারনেম ব্যবহার করাটা অভ্যাস। যেমন আপনি আমায় 'ব্যানার্জি' বলেন। অর্ণবকে 'সরকার'। তেমনি অফিসার দাশগুপ্ত ও কি সারনেম ইউজ করতেন? না নাম ধরে ডাকতেন?"

"স্যারের অভ্যাস ছিল শুধু সারনেম ধরে ডাকা। একমাত্র আমি ওর ভাইয়ের মতো ছিলাম বলেই নাম ধরে ডাকতেন। আদারওয়াইজ...!" তিনি তড়াক করে সোজা হয়ে বসেন, "তার মানে তুমি বলতে চাইছ...।" - "ঠিক তাই যা আপনি ভাবছেন। অফিসার দাশগুপ্ত কি কখনও 'পণ্ডিত' বলে কাউকে অ্যাড্রেস করতেন?"

শিশির সেন ফের গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। ভাবতে ভাবতেই তাঁর দৃষ্টিতে হঠাৎই যেন বিদ্যুৎ খেলে ওঠে, "ইয়েস... ইয়েস! শেয়াল পন্ডিত। তখন বুঝিনি। ইট্ অল্ মেকস্ সেন্স নাও। শেয়াল পন্ডিত তবে কোডনেম ছিল না!"

"শেয়াল পন্ডিত স্যার?"

দুই অফিসারের মধ্যে ফের দৃষ্টি বিনিময় হল। শেয়াল পন্ডিত! এ আবার কী ধরনের নাম!

-"হ্যাঁ। এডিজি শিশির সেন উত্তেজিত, "এখন মনে পড়ছে নামটা। লোকটাকে আমি কখনও দেখিনি। ইনফ্যাক্ট আমি কেন, কেউই দেখেনি। আসল নামটাও জানি না। যেমন খবরি নেটওয়ার্কের বেশ কিছু লোক সব অফিসারের কাছেই কমন হলেও একজন, দু'জন তুরুপের তাস থাকে সবার কাছেই। আই মিন, অফিসারদের স্পেশ্যাল খবরি। অফিসার রথীন দাশগুপ্ত'র স্পেশ্যাল খবরি ছিল একজন। আসল নাম কী তা উনি কখনও বলেননি। কিন্তু ওঁর মুখেই শুনেছি, লোকটা শেয়ালের মতো ধূর্ত! দুর্দান্ত ইনফর্মার। স্যারের

বেশিরভাগ এনকাউন্টারের পেছনে ঐ লোকটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত। কোন্ হিস্ট্রিশিটার কোথায় লুকিয়ে আছে, কে পালাবার তাল করছে, কে গোপনে ইললিগ্যাল বিজনেস চালাচ্ছে- সব খবর ওর কাছে থাকত। স্যার অনেকবারই অ্যাকশনে যাওয়ার আগে আমাদের বলতেন, 'এটা কিন্তু শেয়াল পন্ডিতের খবর। অথেন্টিক হওয়ার চান্সই বেশি।' অনেক সময় এ ও বলেছেন, 'শেয়াল পন্ডিতের কপালই খারাপ! সাধারণ খবরি হয়েই রইল। কেউ লোকটার প্রতিভার মূল্য দিল না। অথচ ওর মধ্যে মারাত্মক একজন ইন্টারন্যাশনাল স্পাই হওয়ার সমস্ত গুণ ছিল'।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তখন আমরা ভাবতাম যে 'শেয়াল পন্ডিত' নামটা বোধহয় কোডনেম। এখন মনে হচ্ছে শেয়াল পন্ডিতেরই আসল নাম সুমঙ্গল পন্ডিত নয়তো!" অধিরাজের চাহনি তীব্র হয়ে ওঠে। সুমঙ্গল পন্ডিতই 'শেয়াল পন্ডিত' কি না জানা নেই। কিন্তু সম্ভাবনা আছে।

"এমন কী ছিল লোকটার মধ্যে যে অফিসার দাশগুপ্ত এরকম বলতেন?" সে আরও একটু খোঁচা দেয়, "আই মিন, খবরি তো অনেকই থাকে। তাই বলে ওঁর মতো এমন একজন কিংবদন্তী লোকটাকে একেবারে ইন্টারন্যাশনাল স্পাইয়ের খেতাব দিয়ে দিলেন!"

"ও লোকটাও কিছু কম ছিল না ব্যানার্জি।" এডিজি সেন বললেন, "স্যারের মুখে শুনেছি, ও পাবলিক প্রায় সর্ব রূপধারী। মেক-আপ করতে ওর জুড়ি ছিল না। আর খবরিদের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতা হল কাউকে নিখুঁতভাবে ফলো করা। শেয়াল পন্ডিতের এটাই সবচেয়ে স্ট্রং পয়েন্ট। বড় বড় ধুরন্ধর গ্যাংস্টারেরাও বুঝতে পারত না যে ওদের কেউ স্টক করছে। হি ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক স্টকার!"

অধিরাজ এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়। অর্ণব বুঝল এবার খবরি নেটওয়ার্ককে সুমঙ্গল পন্ডিত নয়, 'শেয়াল পন্ডিতের খবর নিতে বলতে হবে। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে চলে যায়। "শেয়াল পন্ডিতের খবর অফিসার দাশগুপ্ত'র মৃত্যুর পর আর কিছু পাওয়া গেছে কি?"

"নো!" শিশির সেন খুব ধীর স্বরেই বললেন, "সত্যি বলতে কী আমরা কেউ শেয়াল পন্ডিতকে কখনও স্বচক্ষে দেখিনি। ওকে যে কেমন দেখতে, কোথায় থাকে, ব্যাকগ্রাউন্ড, স্যার ওকে কোথায় পেয়েছিলেন আর তাঁর মৃত্যুর পরই বা সে কোথায় হাওয়া হল- কিছু

জানি না। শেয়াল পন্ডিতের' নামটাও আমি ভুলতেই বসেছিলাম। নেহাৎ তুমি বললে বলে মনে পড়ল।"

"কিউরিঅ-সার অ্যান্ড কিউরিঅ-সার!" অধিরাজের মুখ ফস্কে বাক্যটা বেরিয়ে আসে, "লোকটা কি চলমান অশরীরী?"

"তেমনই বলতে পারো। ফ্যান্টম্ ইনফর্মারও অনেকে বলত ওকে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। শেয়াল পন্ডিত আমাদের কাছে একটা ফেসলেস্, নেমলেস্ মিথই ছিল। তবে স্যার ওর লিডের ওপর অনেকটাই ভরসা করতেন।"

"হুঁ।" অধিরাজ একটু ভেবে বলল, এরপর যে প্রশ্ন করব, "স্যার, আমি জানি; আপনার কষ্ট হবে, কিন্তু প্লিজ খুব ভেবেচিন্তে উত্তর দিন।" শিশির সেন অধিরাজের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ হাসলেন, "তোমার জেরার সামনে পড়েছি যখন, তখন তো উত্তর দিতেই হবে। গো অ্যাহেড।"

"আপনি কি এখনও মনে করেন সুকোমল পান্ডেই আসল খুনী?" তাঁর মুখে বিষণ্ণ হাসি ভেসে ওঠে, "এখন কেন, তখনও আমি সুকোমল পান্ডেকে খুনী ভাবিইনি। ইনফ্যাক্ট, চার্জশিট ফাইল করার সময়ও আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তুমিই ভেবে দেখো, যে ওরকম ধুরন্ধর খুনী, সে একেবারে বোকার মতো মিথ্যে কথা বলবে! ক্রিমিনালরা মিথ্যে বলতেই পারে; কিন্তু সেটা অন্তত বিশ্বাসযোগ্য একটা মিথ্যে হবে। আর সুকোমল হাস্যকর মিথ্যে বলত। কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি নাকি ওর ছেলের বাবা! শুধু এইজন্যই ব্যাটাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত ছিল।" এবার অধিরাজের হাসি পেল। তাহলে সে একা নয়! শিশির সেনও আছেন সুকোমলের হিটলিস্টে।

"সবটা খুলে বলতে পারবেন?" সে খুব সহানুভূতিমাখা গলায় প্রশ্নটা করে, "আমি জানি আপনার সমস্যা হবে...।"

-"কাট দ্য কার্টসি ব্যানার্জি।" শিশির সেনের মুখে ছোট্ট হাসির রেখা, "তুমিও জানো, আমিও জানি- এটাই জেনারেল প্রসিডিওর।" অধিরাজ বুঝতে পারল ভদ্রলোকের রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। সে একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি খুব বেশি ঘাঁটাব না স্যার। শুধু আপনি আমায় কেসটার বিষয়ে যতটুকু মনে পড়ছে, ততটুকুই গুছিয়ে বলুন। বিশেষ

করে অফিসার দাশগুপ্তের ক্যারেক্টার। আপনি তো জানেনই যে অনেক সময় ভিকটিমের স্বভাবের পেছনে খুনের কারণ লুকিয়ে থাকে।" ইতোমধ্যেই অর্ণব খবরিদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসেছে। সেও এডিজি সেনের পাশে বসে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। এডিজি সেন কিছুক্ষণ সময় নিলেন। যেন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "এমনিতে স্যার, আই মিন অফিসার দাশগুপ্ত খুব কমই কথা বলতেন। তাঁর মুখ কম চলত, হাত বেশি। অমন সাহসী অফিসার আমি জীবনে এখনও পর্যন্ত মাত্র দুটি দেখেছি। উনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না অথচ গলার সোনার চেইনে ছোট্ট একজোড়া ভয়ঙ্কর শিঙওয়ালা লকেট ঝুলত। বলতেন, ওটা নাকি যমের শিং। অর্ডার দিয়ে বানিয়েছেন!" অর্ণব আস্তে আস্তে বলল, "টু! মিথোলজি বলে, যমরাজের শিং আছে। ইনফ্যাক্ট যমরাজের মোষের জবরদস্ত শিংটাই যমরাজের প্রতীক।"

"লোকে গলায় শিব, কালী, দূর্গা, কৃষ্ণ— এদের লকেট পরে ঘোরে জানতাম।" অধিরাজ হাঁ, "কিন্তু যমরাজ! আই মিন উনি স্বয়ং মৃত্যুকে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরতেন!"

"ঠিক তাই। ওঁর যুক্তিটাও অদ্ভুত ছিল। বলতেন, ভগবান বা স্বর্গ আছে কি না জানি না; দেখিনি, তাই বিশ্বাস করি না। কিন্তু নরক আর মৃত্যু যে আছে তা রোজই দেখছি। তাই সবাইকে ছেড়ে যমরাজকেই ধরলাম।" তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর শুধু মৃত্যুকে গলায় নয়, মাথায় নিয়েও ঘুরতেন। শহরের গ্যাংস্টারদের বুক কাঁপত ওঁর নাম শুনলে। উনি ইন্ডিয়ান ল' অ্যান্ড অর্ডারের সহনশীলতায় একদমই বিশ্বাস করতেন না। ওঁর বিশ্বাস ছিল, বছরের পর বছর খুনী, গ্যাংস্টারগুলোকে জেলে বসিয়ে, খাইয়ে দাইয়ে, কোর্ট কেসে গুচ্ছ টাকা খরচ করে জামাই আদর করার দরকারই নেই। তাতে সরকারের অমূল্য সম্পদ ও সময় নষ্ট হয়। তার চেয়ে গুলিতেই উড়িয়ে দাও। গল্পই শেষ। এর জন্য ওঁকেও গ্যাংস্টাররা পেছনে 'যমরাজ' বলেই ডাকত। ওঁর সঙ্গে এনকাউন্টারে গিয়ে দেখেছি, বিরাট বিরাট ষন্ডাগুন্ডাগুলো 'যম এসেছে', 'যম এসেছে' বলে আর্ত চিৎকার করতে করতে ইঁদুরের মতো পালাচ্ছে।" -

"অর্থাৎ ঐ একটা লোক বেঘোরে মারা গেলে অন্তত গোটা শহরের গুন্ডা, খুনী, গ্যাংস্টাররা পার্টি থ্রো করত। তাই না?"

শিশির সেন মাথা নাড়ালেন; “ঠিক তাই।”

“বেশ। তারপর?”

-“চূড়ান্ত বেপরোয়া আর সাহসী ছিলেন তিনি। তাই যখন ‘সার্জিক্যাল স’ কিলারের কেসটা এল, তখন উনি প্রায় লাফিয়ে পড়েই গিলোটিনে মাথা দিয়েছিলেন।”

“একটা প্রশ্ন স্যার।” শিশির সেনকে ইন্টারাপ্ট করল অধিরাজ, “এরকম একটা কেস যখন ডিপার্টমেন্টে এল তখন প্রথমেই ওঁর মতো একজন জাঁদরেল পুলিস অফিসারকে কেস ফাইল দেওয়া হল না কেন? যিনি ক্রিমিনালদের ‘যম’ তাঁকেই তো ‘সার্জিক্যাল স’ কিলারের মতো মারাত্মক কেসটা আগে দেওয়া উচিত ছিল।” -

–“উচিত ছিল। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের ওপরওয়ালারা তথাকথিত ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টকে’ যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে করতেন না। এনকাউন্টার করতে যথেষ্ট শক্তি লাগে মানছি। কিন্তু শক্তিমান মানুষ বুদ্ধিমান হতে পারে না; এরকম অদ্ভুত একটা থিওরি ওপরওয়ালারা বিশ্বাস করতেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার জানো ব্যানার্জি; যা বড় বড় বুদ্ধিমানরাও পারেননি, অফিসার দাশগুপ্ত সেটাই করে দেখিয়েছিলেন। খুনীর ফলো করার প্যাটার্নের ব্যাপারটা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, এমনকী কাউন্টডাউনের ব্যাপারটাও। এছাড়াও একমাত্র ওঁরই মনে হয়েছিল যে এই খুনগুলোর পেছনে ব্ল্যাক ম্যাজিকের কেসও থাকতে পারে। সেজন্য শহরে যত বাবা, তান্ত্রিক ছিল, সবাইকে রাউন্ড আপও করেছিলেন।”

– “ব্ল্যাক ম্যাজিকের অ্যাঙ্গেলটা ব্রিলিয়ান্ট।” অধিরাজ প্রশংসাসূচক ভাবে মাথা ঝাঁকায়, “ইনফ্যাক্ট তাহলে ভিকটিমদের মাথাগুলোর বেপাত্তা হওয়ার একটা জোরদার কারণ পাওয়া যায়।”

- “শুধু তাই নয়।” শিশির সেন বললেন, “আরও একটা জোরালো পয়েন্ট আছে।”

“কী?”

“লুক অ্যাট দ্য ডেটস্। তিরিশে ডিসেম্বর, ১৯৮৬, আঠাশে জানুয়ারি, ১৯৮৭, সাতাশে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, আঠাশে মার্চ ১৯৮৭; ডেটের প্যাটার্নটা - অদ্ভুত লাগছে না?”

“তা একটু অদ্ভুত। ঠিক ত্রিশ দিন অন্তর অন্তর! খুনী পুরো একমাস সময় দিয়েছে।”

"শুধু তাই নয়। অফিসার দাশগুপ্ত রীতিমতো পঞ্জিকা ঘেঁটে বের করেছিলেন যে প্রত্যেকটি ডেটেই অমাবস্যা পড়েছিল। যে সময়ে মৃত্যুগুলো হয়েছে, সেই সময়ে অমাবস্যা তিথি চলছিল। এমনকী যে ডেটে স্যার মারা যান— সেই একুশে অক্টোবর, ১৯৮৭ দিনটাও অমাবস্যাই ছিল।"

এতক্ষণ অধিরাজ সোফায় ঠেস দিয়ে বসেছিল। এবার সটান সোজা হয়ে বসল। তার চোখে যেন কয়েকহাজার ওয়াটের আলো জ্বলছে, "মাই গু-ড-নে-স!"

- "যেহেতু ভিকটিমদের শিরশ্ছেদ হয়েছিল, এবং রাতগুলো সব অমাবস্যার রাত; সে জন্য স্যারের মনে হয়েছিল এর পেছনে ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান, তথা তান্ত্রিকদের হাত থাকতে পারে। সচরাচর নরবলি দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে; এককোপে নিখুঁতভাবে মাথা কেটে নেওয়া, এবং সেটা অমাবস্যার রাতেই দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে সার্জিক্যাল স" এর থেকে বেটার অপশন আর কিছু হতেই পারে না। এবং অঘোরতন্ত্রের মধ্যে সেক্সের ব্যাপারটাও আছে। সেজন্য উনি যত তান্ত্রিক, অঘোরী, অমুকবাবা, তমুকবাবা সবক'টাকে লক্ আপে পুরে টানা সাতদিন ইন্টারোগেট করেছিলেন। তাও আবার থার্ড ডিগ্রি দিয়ে!"

—"জাস্ট ব্রিলিয়ান্ট!" আগ্রহে অধিরাজ শিশির সেনের দিকে ঝুঁকে পড়ল, "তারপর?"

- "কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শত পেটানিতেও তন্ত্রসাধকরা কেউ মুখ খুলল না। ওদিকে কাউন্টডাউনও চলছিল।" তিনি একটু বিষণ্ণভাবেই বললেন, "এরপরের ঘটনা আমার কাছে রহস্যময়। স্যার সম্ভবত অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিলেন...।"

"ঠিক কতটা জানতেন উনি?"

অদ্ভুত ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন এডিজি, "সঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা উনি সবটাই জানতে পেরেছিলেন!"

"আই সি।"

এরপর শিশির সেন যা যা বললেন, কেস ফাইলেও সে কথাগুলোই আছে। একুশে অক্টোবর বিকেল থেকে রথীন দাশগুপ্ত তাঁকে লালবাজারের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, "একটা ফাঁদ পেতে রেখেছি। টোপ বলতে পারো। আজ জালে পড়বেই শিকার। তুমি এখান থেকে কোথাও নড়বে না।"

শিশির সেন ইতস্ততঃ করে বলেছিলেন; "আপনি একা কোথায় যাচ্ছেন স্যার! এই সাইকো পুলিসদেরও রেয়াত করছে না। আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

কিন্তু অফিসার দাশগুপ্ত রাজি হননি। তাঁর সেই একই জেদ, "না। আমি একাই যথেষ্ট। তুমি এখান থেকে একদম নড়বে না শিশির! পৃথিবী উলটে গেলেও কোথাও যাবে না।"

"কিন্তু এত জায়গা থাকতে লালবাজারই কেন? খুনী যে কোনও জায়গায় বডি ডাম্প করতে পারত।" শিশির সেনকে বাধা দিয়ে বলে উঠল অধিরাজ, "উনি নির্দিষ্টভাবে কী করে বললেন যে এবার সে লালবাজারকেই বেছে নেবে?"

'এই প্রশ্নের উত্তরটা আমারও জানা নেই ব্যানার্জি।" তিনি মাথা নাড়লেন, "আমি এ বিষয়টা আজও বুঝতে পারিনি।"

অধিরাজ অন্যমনস্ক। এই ধাঁধাটার উত্তর কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না! সে একটু ভেবে নিয়ে বলে, "কিন্তু কোন্ ফাঁদের কথা বলেছিলেন অফিসার দাশগুপ্ত সেটা কি জানেন?"

"না।" তাঁর কথার মধ্যে বিষণ্ণতা স্পষ্ট, "তবে এখন হয়তো আন্দাজ করতে পারি।"

-"কী?"

আফসোস ঝরে পড়ল শিশির সেনের প্রতিটা শব্দে, "উনি নিজেকেই 'বেট্' বা টোপ হিসাবে ইউজ করেছিলেন। স্যার জানতেন যে খুনী ওঁকে টার্গেট করেছে। যে ফাঁদের কথা বলেছিলেন, সেটা স্বয়ং তিনিই। একটা নৃশংস খুনীকে ধরার জন্য নিজেকেই বলি দিয়ে দিলেন। অথচ আমরা কেউ কিচ্ছু করতে পারলাম না। এমনকী সঠিক খুনীকেও ধরতে পারলাম না। ওয়ার্থলেস!"

অধিরাজ স্তম্ভিত! বিস্ময়ে বাকরোধ হয়ে যায় তার। কতখানি সাহসী আর নিবেদিত প্রাণ হলে একটা মানুষ মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজের প্রাণটা বাজি রেখে যায়! অফিসার দাশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আসে। এই এনকাউন্টার এক্সপার্ট এখন অধিরাজের চোখে 'হিরো'। ট্র্যাজিক হিরো হলেও তিনিই নায়ক নিঃসন্দেহে।

এরপর যা ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত। শিশির সেনের কণ্ঠ আক্ষেপে জড়িয়ে আসে, "কেন যে আমি ওঁর সঙ্গে গেলাম না! কেন যে গাধার মতো ওঁর কথাই শুনলাম! জানতাম এই কেসে স্যারের প্রাণ সংশয় আছে। সব জানতাম তবু...!" বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর

ভেঙে গেল, "আমি সঙ্গী হিসাবে যে কতটা খারাপ তা এই একটা ঘটনাতেই প্রমাণ হয়ে গেল। আমি স্যারের ভরসা, বিশ্বাসের যোগ্য নই। আই অ্যাম্ আ নিনকম্পু

অর্ণব তাঁর দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। শিশির সেনের চোখে যেন রক্ত জমে। কাঁদতেও পারছেন না, আবার নিজেকে লুকোতেও পারছেন না। তাঁর যন্ত্রণা সে মর্মে মর্মে বুঝতে পারে। অধিরাজ কোনও কথা না বলে মাথা হেঁট করে বসে আছে। এই মুহূর্তে কথার চেয়ে নীরবতা বেশি প্রয়োজন। এরপর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে ইচ্ছে করে না।

-"তুমি একটা প্রশ্ন করতে ভুলে গেলে ব্যানার্জি।" নৈঃশব্দ ভেঙে শিশির সেনই প্রথম কথা বললেন। অধিরাজ তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

"আমি অফিসার দাশগুপ্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছি, 'অমন সাহসী অফিসার আমি জীবনে এখনও পর্যন্ত মাত্র দুটি দেখেছি।' প্রথমজন নিঃসন্দেহে অফিসার দাশগুপ্ত। তুমি জানতে চাওনি দ্বিতীয়জন কে?"

"কে?"

"ইউ, মাই বয়।"অধিরাজ উত্তরটা শুনে মরমে মরে যায়। শিশির সেন তাকে অমন কিংবদন্তী একজন 'ড্রাগন হার্টের' সঙ্গে তুলনা করছেন। আদৌ সে যোগ্যতা তার আছে কি! তবে মনে মনে একটা জিনিস বুঝতে পারছিল। তার 'হিরো' যেখানে কাহিনি শেষ করেছিলেন, এখন উত্তরসূরী হিসাবে তাকে ঠিক সেখান থেকেই গল্প শুরু করতে হবে। অধিরাজের চোয়াল দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে ওঠে। এই অসম সাহসী মানুষটির আত্মবলিদান ব্যর্থ হতে দেবে না সে! খুনীকে ধরা পড়তেই হবে। ক্রাইম নেভার পে'জ!

"দাদাই... দাদাই...।"

হঠাৎ নীরবতাকে ভঙ্গ করে একটি ছোট্ট শিশু ভেতরের ঘর থেকে দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিশির সেনের কোলে। তাঁর গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, 'বিড়াল-ইঁদুর দেখবে না?'

তিনি একটু অপ্রস্তুত হেসে দুই জুনিয়রের দিকে তাকালেন, "ইনি নাতিবাবু! ওনার টম অ্যান্ড জেরি দেখার শখ হয়েছে।"

"এখন টম্ অ্যান্ড জেরি!" অধিরাজ ঘড়ির দিকে আলগোছে তাকায়, "এখন তো টাইমিং নয়! কোন্ চ্যানেল?"

"চ্যানেল নয়। ডিভিডি।" তিনি শিশুকে সস্নেহে বললেন, "এখন তো এই কাকুদের সঙ্গে গল্প করছি। একটু পরে চালিয়ে দেব। নয়তো দিদুন বা মাম্মাম্‌কে বলো।"

"ওরা কেউ চালাচ্ছে না।" শিশু নাকি সুরে বায়না জোড়ে, "চালিয়ে দাও না দাদাই! প্লি-জ!"

"প্লিজ?" এডিজি হেসে ফেললেন, "তাহলে তো চালাতেই হবে। যাও, আসছি।"

শিশু ফের গুড়গুড়িয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। দুই অফিসারের দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন তিনি, "যদি কিছু মনে না করো, তবে...।"

"আপনি যান্ স্যার।" অধিরাজ নম্রভাবেই বলে।

শিশির সেন মৃদু হেসে ভেতরের দিকে চলে গেলেন। অর্ণব অধিরাজের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়েছে, "টম অ্যান্ড জেরি!"

– "শুধু তাই নয়।" অধিরাজ চাপা স্বরে উত্তর দেয়, "জনসনস্ বেবি ক্রিম আর পাউডারের গন্ধও পেয়েছি। বাচ্চাটার গায়ে ছিল।" অর্ণব কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজের মোবাইলে 'দেশ' রাগ বেজে ওঠে। অফিসার পবিত্র আচার্য।

- "বলো।"

ওপাশ থেকে পবিত্র'র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "জিও কাকা। পুরো বুলস আই হিট্ করেছ!"

"বলো ভাইপো।" অধিরাজ একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলে, "স্লটার-হাউজের খবর পেয়েছ?"

"হ্যাঁ। বহু দশক আগে পার্ক সার্কাসে রফিক আসলাম নামে এক ভদ্রলোকের বিরাট স্লটার-হাউজ ছিল। এখান থেকেই পার্কস্ট্রীটের সব বড় বড় রেস্তোরাঁ'তে মাংস যেত। ব্যবসা রমরমিয়ে চলছিল। কিন্তু বত্রিশ বছর আগেই হঠাৎ কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল রফিক। তারপর থেকেই বন্ধ হয়ে আছে স্লটার-হাউজটা।" -

"গ্রেট! কারেন্ট স্টেটাস কী?"

“সেটা আরও ইন্টারেস্টিং।” পবিত্র জানায়, “এখন স্লটার-হাউজটা ভেঙেচুরে গিয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে পুরো হন্টেড হাউজ মনে হয়। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা জানাচ্ছে গত কয়েক রাত ধরেই রেগুলার ওর ভেতর থেকে পিকিউলিয়ার সব সাউন্ড ভেসে আসছে!”

“কীরকম?”

“অ্যাকর্ডিং টু পাবলিক; সম্ভবত ধারালো কোনও অস্ত্রে শান দেওয়ার শব্দ, আরও উদ্ভট উদ্ভট আওয়াজ। স্থানীয় লোকেরা একটু অবাকই হয়েছে। কারণ এই স্লটার-হাউজটা বহুদিন বন্ধ আছে। এখানে আর জবাই হয় না। তবে কোন্ অস্ত্রে শান দেওয়া হচ্ছে? আর কেনই বা হচ্ছে?”

“তোমরা ভেতরে ঢুকেছ?”

“না। বাইরে একটা আকবরী আমলের তালা ঝুলছে। বলো তো ভেঙে দিই।”

“না। এখন নয়।” অধিরাজ বলল, “রোজ রাত্রে শব্দ হয় বললে না?”

“হ্যাঁ।”

– “তবে আজ রাতেই ঢুকব । দেখি কোন্ কসাই, কার মুণ্ডু কাটার জন্য কীসে ধার দিচ্ছে!” অধিরাজ মিটিমিটি হাসছে, “তুমি আর মিস্ দত্ত কনস্ট্যান্ট নজর রাখো। আমি আর অর্ণব আসছি। মিস্ মুখার্জীকেও নিয়ে আসব। যদি ফরেনসিক হেল্প লাগে।”

“ওকে বস্।” পবিত্র লাইন কেটে দেয়।

(১১)

“তুমি একজন ক্রিমিনাল! তুমি একজন রাক্ষস! এ সমাজে তোমার থাকার অধিকার নেই। তোমায় তো ফাঁসি দেওয়া উচিত!” আয়নার ভেতর থেকে প্রতিবিম্ব সরোষে বলে ওঠে, “বিকৃতকাম নরপশু! নিজেই মরো না কেন?”

লোকটা একদৃষ্টে নিজেরই প্রতিফলনের দিকে তাকিয়েছিল। আয়নায় তার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পড়ছে। আর আয়নার ভেতরের মানুষটাও তার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে। সে দেখল, প্রতিবিম্বের চোখে একরাশ ঘৃণা! তর্জনী তুলে প্রতিবিম্ব যেন রাগে, ঘৃণায় ফেটে পড়ে, “মানুষ নও, নরকের কীট তুমি! নরকেই যাও... মরো! মরো!”

“হ্যাঁ। আমার মরা উচিত। ঠিক... ঠিক! আমার মরাই উচিত...।” বলতে বলতেই লোকটা দু'হাতে নিজের গলা আঁকড়ে ধরল। নিজেই নিজেকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করছে। মস্তিষ্কের ভেতরে তখন কেউ যেন বারবার বলে চলেছে, ‘মরা উচিত! মরা উচিত। মরা উচিত!’ তার নিজের প্রতিবিম্বও বলছে, মরা উচিত! টিভির পর্দায় সংবাদ পাঠিকা যেন সকৌতুকে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সেও বোধহয় মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে। ওর মনে হল, ঘড়িটাও টিকটিক করে বলছে, ‘ডেথ... ডেথ... ডেথ!’ মানুষটা নিজের গলা আরও জোরে টিপে ধরে। মরতেই হবে! কিন্তু এভাবে হচ্ছে না যে! সে উন্মত্তের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে কী যেন খোঁজে। দড়ি আছে? কিংবা ব্লেড! ছুরিটাই বা কোথায় রাখল। কয়েক মুহূর্তের যন্ত্রণা সারাজীবনের জ্বালার থেকে অনেক ভালো। যে শান্তি জীবন তাকে দিতে পারেনি, মৃত্যুই হয়তো দেবে। তাই মৃত্যু খুব জরুরি। মরতে সে ভয় পায় না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে, জীবন মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর! একটা দড়ি, একটা ছুরি বা ব্লেড তাকে সেই বীভৎস অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু কোথায়?... কোথায়? তার অস্থির চোখ চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতেই আচমকাই শান্ত হয়ে যায়। অসন্তোষে ভুরু কুঁচকে গেল লোকটার। এক মিনিট! নিজে মরবে কেন? আত্মহত্যা করা কাপুরুষত্বের লক্ষণ! ভীতু মানুষেরাই সুইসাইড করে। সে আজ পর্যন্ত প্রমাণ করে এসেছে, তার থেকে ভয়ঙ্কর মানুষ আর নেই। যে পৌরুষের শক্তি, গর্ব, ঔদ্ধত্য প্রত্যেকবার ওকে

দংশন করেছে, তার কমনীয়তাকে চিরকালই দলিত মথিত করে এসেছে; সেই উদ্ধত পৌরুষকে বারবার অবদমিত, অপমানিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সে। যে সমাজ তাকে কখনও পুরুষের মর্যাদা দিতে চায়নি, সেই সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে; আমি পুরুষের চেয়ে যোগ্যতর প্রাণী। ডারউইনের ভাষায় 'ফিটেস্ট।' তবে 'সারভাইভ' কার করা উচিত? যাদের তোমরা 'পুরুষ' বলো, তারা আমার সামনে কেউ নয়, কিছু নয়। হতে পারে আমার যৌনকামনা অন্যরকম, হতে পারে আমার যৌনতা নারীসঙ্গে তৃপ্ত হয় না, কিন্তু আমিই শ্রেষ্ঠ। সমাজ বারবার আমায় নপুংসক বলেছে। কিন্তু বুদ্ধি, সাহস আর শক্তিই যদি পৌরুষের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হয়, সেক্ষেত্রে আমি পুরুষকেও টেক্কা দিয়েছি। যে শক্তির গর্ব পুরুষেরা করে, তাকে আমি বারংবার ধূলিসাৎ করেছি। সার্জিক্যাল স কিলারকে ঘৃণা করা যায়, ভয় পাওয়া যায় কিন্তু তার শক্তিকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই। সে ভয়ঙ্কর। মৃত্যু নয়— ভয়! তাকে সবার ভয় পাওয়া উচিৎ ! সেই মূর্তিমান আতঙ্ক কাপুরুষত্বের প্রমাণ দিতে পারে না! আত্মহত্যা তো কিছুতেই নয়।

তার চোখ দুটো আস্তে আস্তে শান্ত, স্থির হয়ে আসে। সে মুচকি হাসে। চিরকালই সবাই তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছে। জীবন প্রতি পদে পদে অপমান করে এসেছে! কিন্তু সার্জিক্যাল স কিলারকে ব্যঙ্গ বা অপমান করার সাহস কারোর নেই। তাকে সবাই ভয় পাবে! ভয়ই তার শেষ কথা! পুরুষ, নতজানু হও এই তথাকথিত 'নপুংসকের' সামনে। মেনে নাও; সে-ই শ্রেষ্ঠ। ভালো যদি না-ও বাসো, ভয় পেতে শেখো! ভয় পাও!

লোকটা আপনমনেই মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল ফ্রিজের দিকে। ভেতরে প্রচুর খাবার সাজানো। কিন্তু খাবারের ধরনটাও ভারী অদ্ভুত। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, ফ্রিজে অন্যান্য খাবারদাবারের থেকে চকোলেট, মিষ্টি, চিপস এবং আইসক্রিমের পরিমাণই বেশি। সে শিশুর মতো লোলুপ দৃষ্টিতে চকোলেট বারগুলোর দিকে তাকাল। তারপরই একটা ম্যাগনাম সাইজের ক্যাডবেরি বের করে ফয়েল ছাড়িয়ে খেতে শুরু করল। এই মুহূর্তে তাকে অবিকল ছোট্ট শিশুর মতো লাগছে। যেমনভাবে ছোট বাচ্চারা চকোলেট পেলে ভারী খুশি হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই এক অনাবিল নিষ্পাপ তৃপ্তি তার মুখে খেলা করছে। এখন কেউ দেখলে বলবে যে এই মানুষটা খুন করতে পারে!

রীতিমতো আঙুল চেটে চকোলেট খেতে খেতেই আড়চোখে ধুলো পড়া শো-কেসটার দিকে তাকাল লোকটা। ওখানে ন'টা ট্রফি সাজানো রয়েছে। দশ নম্বরের জায়গাটা খালি! না! ঠিক খালি নয়। ন'টা করোটির পাশে দশ নম্বরের ছবি। সে-ই নিজের ক্যামেরায় তুলে সাজিয়ে রেখেছে।

সেদিকে তাকিয়ে থমকে গেল ও। সত্যিই কি ছবি? আকস্মিকভাবেই তার মনে হল, ছবি নয়; সত্যিকারের মানুষটাই ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখে উষ্ণ ইশারা! ঠোঁটে ইঙ্গিতময় হাসি। অসামান্য দেহ সৌষ্ঠব কালো ব্লেজারে ঢাকা হলেও উন্নত অহঙ্কারী গ্রীবা স্পষ্ট। বুকের খুব সামান্য অংশ একটু অসাবধানে উঁকি মারছে। পোষাক থাকলেই এই! না থাকলে না জানি কেমন লাগবে!

লোকটা চোখ বুজে দৃশ্যটা কল্পনা করে। সাদা ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে তার ইপ্সিত পুরুষ। দীর্ঘকায় দেহ কামনায় টানটান। একটা হাত আলগোছে পড়ে আছে একপাশে। অন্য হাতটা মাথার ওপর ভাঁজ করে রাখা। নীলাভ ক্লিন শেভড গালে, লম্বাটে তীক্ষ্ণ মুখে ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু। চকচকে বাদামি ত্বকের ওপর সোনালি আলো এসে পিছলে পড়ছে। নিখুঁত ব্রোঞ্জের মূর্তি যেন! গ্রীবায়, কপালে মায়াবি আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলা। উন্মুক্ত পেশল বুক, কোমর, সুগভীর নাভি। চিতার মতো কমনীয় পেশীর খাঁজে খাঁজে রহস্য! পুরুষ নয়, এক অচেনা গভীর জগৎ ইশারায় ডেকে বলছে, “ক্ষমতা থাকলে আমায় আবিষ্কার করে দেখাও।” কোমরের নীচে একটা চাদর আলগোছে পড়ে আছে, কিন্তু চাদরের তলায় লম্বা দুটো পা, সুগঠিত উরু প্রকট। উন্নত চিবুক, মুখ আর চাহনির মধ্যে অদ্ভুত এক অহঙ্কার। ঠোঁট দুটো ঈষৎ উন্মুক্ত। যেন চুম্বনের অপেক্ষায় অধীর।

চকোলেটটা আধখাওয়া অবস্থাতেই টেবিলের ওপরে পড়ে রইল। মানুষটা চোখ খুলে তাকাল শোকেসের দিকে। এখন তার চোখের সামনে শো কেস, বা ছবি নেই! একটা কাচের দেওয়াল। অন্য প্রান্তে শুয়ে আছে সেই পুরুষ! যেন সকৌতুকে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। উজ্জ্বল বাদামি চোখের উষ্ণ দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট! দেখি তোমার কত ক্ষমতা। পারলে অধিকার করো আমায়!

তার নিঃশ্বাস ঘন হয়ে ওঠে। হৃৎস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। আশির নখে যেন আগুন ধরে গিয়েছে। রক্ত নয়, শিরা আর ধমনী বেয়ে উত্তপ্ত লাভাস্রোত বয়ে চলল! জেদি শিশুরা যেমন 'ওটা চাই' বলে বায়না করে হাত বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনই হাত বাড়িয়ে দিল সেদিকেই। ওকে চাই। সে সজোরে আছড়ে পড়ল কাচের ওপরে! কষ্ট দিচ্ছ আমায়; তাই না? লোভ দেখাচ্ছ? চ্যালেঞ্জ করছ? কী ভেবেছ? কাচের দেওয়ালের ওপ্রান্তে পৌঁছতে পারব না? এই সামান্য বাধা আমায় আটকাতে পারবে! "অসম্ভব জেদে সে ধাক্কা মারল কাচের দেওয়ালের ওপরে। কিন্তু বাধা বিন্দুমাত্রও টলল না। চীনের প্রাচীরের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। অসহ্য! অসহ্য! লোকটা এবার সর্বশক্তিতে ঘুঁষি মারল কাচের ওপর। মোটা কাচ কেঁপে উঠল, কিন্তু ভাঙল না। সামান্য ভঙ্গুর কাচের এত ক্ষমতা যে তাকে বাধা দেয়! প্রচণ্ড রাগে, জেদে সে উন্মত্তের মতো আবার ঘুষি মারল। হাতের কাছেই হাতুড়ি ছিল। কিন্তু সেসব কিছুই মনে পড়ল না তার। প্রবল জেদে, রাগে, কামনায় জর্জরিত মানুষটা উন্মাদের মতো একের পর এক ঘুঁষি মারতেই থাকল কাচের ওপরে। এই মুহূর্তে তার মাথায় দানব ভর করেছে। গায়ে খ্যাপা, একগুঁয়ে হাতির জোর। কাচের দেওয়ালে একের পর এক আঘাত পড়তেই থাকে। জোরে, আরও জোরে, ভীষণ জোরে, অমানুষিক জোরে...! একটা প্রবল ঝনঝন্ শব্দ। পরক্ষণেই কাচ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল চতুর্দিকে। লোকটা উন্মত্ত উল্লাসে ছবিটা তুলে নেয়। তার হাত বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কাচে হাত কেটে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড! কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই। সে ছবিটাকে তুলে নিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো আদর করছে।

দেখো! 'কেউ আটকাতে পারবে না! কেউ আমাকে তোমার কাছে পৌঁছতে বাধা দিতে পারবে না। অধিকার তো করবই। আজ হোক্ কী কাল। কিন্তু তুমি আমার! এবং আমারই। তোমার ঐ সঙ্গী তো দূর; স্বয়ং শয়তানও আমায় আটকাতে পারবে না।

তার হাত থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছিল। সে মোহগ্রস্তের মতো রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী লাল! চিরকালই লাল তার প্রিয় রঙ। লাল টিপ, লাল রিবন, লাল লিপস্টিক কিংবা আলতার ওপর বড় লোভ ছিল। কিন্তু ওগুলো পরলে বা মাখলে লোকে হাসবে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবে! অথবা...! রক্তাক্ত হাত দুটো সযত্নে নিজের মুখে বোলাল লোকটা।

মহানন্দে নিজের রক্তই নিজের মুখে মাখছে। এখন তাকে দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবে। সারা মুখ রক্তে লাল, তার মধ্যে একজোড়া হিংস্র চোখ কুটিল আনন্দে হাসছে। মাংসাশী প্রাণীর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত বীভৎস হাসিতে ঝিকিয়ে উঠল। লাল টিপ, লিপস্টিক বা আলতা, নেলপালিশ পড়লে বা মাখলে লোকে হাসবে! কিন্তু রক্ত! রক্ত মাখলে কেউ হাসবে না- ভয় পাবে। ভয়!

লাল রঙ তার বড় প্রিয়।

(১২)

"অনেক কথাই এখনও পরিষ্কার হল না অর্ণব।" অর্ণব ড্রাইভ করতে করতেই জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়েছে। অধিরাজ শান্তস্বরে বলে, "লালবাজারের কেসটা বুঝলাম না। এখনও জানতে পারলাম না অফিসার দাশগুপ্ত এত জায়গা থাকতে শিশির সেনকে লালবাজারের সামনেই দাঁড়াতে বলেছিলেন কেন! আর খুনীও কেমন লক্ষ্মী ছেলের মতো একদম লালবাজারের সামনেই ওঁর লাশ ডাম্প করল! এতটাই যখন বাধ্য, তবে নিজের নাম-ঠিকানাটাও লিখে গেলেই পারত!"

"আমিও বুঝিনি স্যার।"

"তবু ভালো যে তুমি এটুকু বুঝেছ যে তুমি বোঝোনি।" অধিরাজ হতাশ, "আমি যে কী বুঝলাম তা নিজেই বুঝিনি। যে খুনী বত্রিশ বছর আগে ধড়াদ্ধড় ন' খানা খুন করে বেরিয়ে গেল; সে পরবর্তী বত্রিশ বছর কি ঘোড়ার ঘাস কাটছিল? সার্জিক্যাল স কিলারের আর কোনও অ্যাক্টিভিটিই নেই! একদম মেডেন ওভার।" অধিরাজ চিন্তামগ্ন হয়েই একখানা চিপসের প্যাকেট তুলে নিয়ে খেতে খেতে বলল, "এবং বত্রিশ বছর পরে যখন ফের কেস ফাইল খুলল, তখনই তিনি এসে হাজির। অর্থাৎ তিনি মরেননি, কোথাও গায়েবও হননি এমনকী সাধু-সন্ততও হয়ে হিমালয়ে প্রস্থানও করেননি। তবে মাঝখানের ইতিহাস ফাঁকা কেন! এরকম উদ্ভট প্যাটার্ন চেঞ্জের কি কোনও মানে হয়?"

অধিরাজ চিন্তিত মুখেই চিপসের বড়সড়ো একটা টুকরোয় আলতো কামড় দিল। এতটাই অন্যমনস্ক যে খেয়ালই করেনি, ঐ বিশেষ ফ্লেভারের চিপসটা আহেলির জন্যই কিনে আনা হয়েছে। ওরা আহেলিকে তুলে আনার জন্য বাড়ি গিয়েছিল। তখন সে বেচারি সবে ডিনার খাওয়ার তোড়জোড় করছে। দুই অফিসারের উৎপাতে ডিনার মাথায় উঠল ঠিকই, তবে অতটা নিষ্ঠুরও হয়নি অধিরাজ। রাস্তাতেই তার জন্য একগাদা শুকনো খাবার, বার্গার, মোমো, চিপস— ইত্যাদি কিনে নিয়েছে। আহেলি লাজুক মুখে কান চুলকোতে চুলকোতে বলেছিল, "এত খাবার আমি একা কী করে খাব।"

“আপনি একা নন মিস মুখার্জী।” অধিরাজ নির্লিপ্তভাবে বলে, “অর্ণবও খাবে। আজ কত রাত অবধি অপেক্ষা করতে হবে তার ঠিক নেই। যা পারেন ও যতটা পারেন ঠুসে নিন। বাকিটা অর্ণব বুঝে নেবে। স্পেশ্যালি মোমোগুলো ওর জন্যই।” অর্ণব একটু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকিয়ে আহেলির মুখের ভাব মেপে নিয়েছিল। আহেলিও মোমো খেতে ভীষণ ভালোবাসে। ভেবেছিল, তেমন হলে শেয়ার করে নেবে। কিন্তু আহেলির মুখের দিকে তাকিয়েই আতঙ্কে প্রাণ উড়ে যায় তার। আহেলি একদম খুনীর দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। সার্জিক্যাল স কিলারকে এখনও স্বচক্ষে দেখেনি। তবে সেই দুর্দান্ত খুনীও নির্ঘাৎ আহেলির এই ‘ভলডেমর্ট’-মার্কা মুখভঙ্গী দেখলে সার্জিক্যাল স ছেড়ে আলু, পটল বেচতে বসে যাবে। সে আবার আড়চোখে আহেলির দিকে তাকাল। এখন তার অতিপ্রিয় ফ্লেভারের চিপসের প্যাকেট তুলে নিয়ে নির্বিবাদে খাচ্ছে অধিরাজ। অদ্ভুত ব্যাপার! এখন কিন্তু আহেলির মুখে কোনও রাগের প্রকাশ নেই। বরং সে ভারী সস্নেহে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অধিরাজের দিকে। অর্ণব ভয়ে ভয়ে বলল, “আপনি মিস মুখার্জীর ফেভারিট ফ্লেভারের চিপসটা খাচ্ছেন স্যার!”

-“হো-য়া-ট!” এবার সম্বিত ফিরে পায় অধিরাজ। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “ওঃ হো! তাই তো! অনেকটাই খেয়ে ফেলেছি! সরি... সরি...!” বলতে বলতেই কী করবে বুঝতে না পেরে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো আধখাওয়া চিপসের টুকরোটাই এগিয়ে দেয় আহেলির দিকে, “মিস মুখার্জী; প্লিজ?” আহেলি চিপসের টুকরোটার দিকে থাবা বাড়াতেই যাচ্ছিল। তার আগেই হাঁ হাঁ করে ওঠে অর্ণব, “ও কী করছেন স্যার! ওটা আপনার এঁটো!”

আহেলি রীতিমতো দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে, “আপনার তাতে কী? ওটা এঁটো হোক, আস্ত হোক, সিকিভাগ হোক; আপনি বলার কে!”

মরেছে! অর্ণব বুঝেই উঠতে পারে না সে আবার কী দোষ করল! অধিরাজ আরও অপ্রস্তুত হয়ে আধখানা চিপস ধরা হাতটা সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল। তার আগেই খপ করে ওর হাত ধরে ফেলেছে আহেলি। অধিরাজ আর অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল সেই আধখানা চিপস রীতিমতো খামচা মেরে ছিনিয়ে নিয়ে মহানন্দে গপাৎ করে গিলে ফেলল সে। অধিরাজ আক্ষরিক অর্থেই কিছুক্ষণ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর গোটা

প্যাকেটটাই নীরবে এগিয়ে দিল আহেলির দিকে। আহেলি ভারী খুশি হয়ে বলে; "থ্যাঙ্কস"। অধিরাজ বিড়বিড় করে বলে, "ওয়েলকাম! ফেভারিট চিপস একটু খেয়ে ফেলেছি বলে খামচে দেওয়া জরুরি ছিল?" অর্ণবের এবার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। এই লোকটার মাথায় সব ঢোকে, জটিল থেকে জটিলতর কেসে বিদ্যুতের মতো মস্তিষ্ক খেলে যায়, কিন্তু এই সামান্য ইকোয়েশনটা যে কেন ঢোকে না কে জানে! আহেলি যে এঁটো আধখাওয়া চিপসটা নির্বিবাদে খেল সেটা দেখল না! শুধু খামচে দেওয়াটাই তার চোখে পড়ল।

– "অদ্ভুত প্যাটার্ন; যদি না এর মধ্যে কোনও মিনিংফুল স্ট্র্যাটেজি থাকে।" অধিরাজ চিপস সমস্যা ছেড়ে ফিরে গিয়েছে খুনীর প্যাটার্নে, "আমার এমন কেন মনে হচ্ছে যে ন'নম্বর খুন'টার পরে খুনীর আর মার্ডার করার দরকার ছিল না?"

- "মানে স্যার?"

- "মানে একটাই। প্রত্যেক ভিকটিমের প্রোফাইল যদি লক্ষ্য করো, তবে বুঝতে পারবে যে তারা সবাই শারীরিকভাবে ম্যানলি ছিলেন। রথীন দাশগুপ্ত অতটা পুরুষালি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পেশা আর স্পেশ্যালিটি দুরন্ত ম্যানলি ছিল, যেখানে সব তথাকথিত 'মর্দানগি'কে টেক্কা দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র হি ওয়াজ আ জেনুইন 'ম্যান'। এই অবধি তো বোঝা গেল। অথচ তাঁর ও মৃত্যুর পর এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের ডান হাত শিশির সেনই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হলেন যিনি হয়তো দেখতে অতটা ম্যানলি নন, কিন্তু পেশাটা যথেষ্ট পুরুষালি। হি ওয়াজ অলসো আ জেনুইন 'ম্যান'। যদি সুকোমল পান্ডে খুনী না হয়; না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি, তবে অফিসার দাশগুপ্তের পরই শিশির সেনের নম্বর আসার কথা। কিন্তু শিশির সেনের গায়ে আঁচও পড়ল না। অদ্ভুত নয়?"

অর্ণব একটু ভেবে বলল "ঠিক তার মানে শিশির সেনকেও, সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না!"

"গুড থিঙ্কিং। দুঃখজনক হলেও এটাই ফ্যাক্ট। প্রার্থনা করি শিশির সেন বহাল তবিয়তে বহুবছর বেঁচে-বর্তে থাকুন, কিন্তু তাঁর 'দশ' নম্বর শিকার না হওয়াটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এক্ষেত্রে পাঁচটা অ্যাঙ্গেলের একটা অ্যাঙ্গেল আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর। যার

জন্য এডিজি সেন এইমুহূর্তে সাসপেক্ট লিস্টে আছেন।” তার চোখে গভীর আত্মমগ্নতা, “তাছাড়া শিশির সেনও আমাদের সব কথা বলেননি অর্ণব। কিছু চেপে গিয়েছেন!”

“সে কী! উনি কিছু চেপে যাবেন কেন!” প্রবল বিস্ময়ে বলল অর্ণব, “ওঁর গোপন করার তো কিছুই নেই!”

– “অবশ্যই আছে।” সে একটু চুপ করে থেকে বলল, “খুব নর্মাল কয়েকটা জিনিস দেখো। ফর এগজাম্পল, ধরো আমি অফিসার দাশগুপ্ত, আর তুমি শিশির সেন। তুমি জানো সার্জিক্যাল স কিলারের পরবর্তী শিকার আমি। কাউন্টডাউনে সেদিনই জিরো এসেছে। খুনী কতটা ভয়ঙ্কর আগের আটটা খুনেই স্পষ্ট! এবার সেদিনই আমি, তথা অফিসার দাশগুপ্ত জেদ ধরেছি যে আমি একাই খুনীকে ধরতে যাচ্ছি, তুমি, শিশির সেন লালবাজারের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবে, কোথাও নড়বে না, তুমি কি একেবারে লেম ডাক হয়ে একেবারে ছ'টা থেকে রাত একটা-দেড়টা অবধি লালবাজারেই ঠায় দাঁড়িয়েই থাকবে? যেখানে সিনিয়র অফিসারের লাইফ থ্রেট আছে, একজন ভয়ঙ্কর খুনীর তান্ডব সি আই ডি’কে পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছেড়েছে, সেখানে তাঁকে মরতে ছেড়ে দেবে? শিশির সেনের অ্যাকটিভিটি তোমার একটুও যুক্তিযুক্ত লাগছে? ওঁর জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে?”

– “অফকোর্স আপনাকে, আই মিন অফিসার দাশগুপ্তকে কোনওভাবেই একা ছাড়তাম না। বেশি জেদ করলে মুখে কিছু বলতাম না, কিন্তু...!”

– “গোপনে তাঁকে ফলো করতে।” অর্ণবের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে অধিরাজ বলল, “অন্তত নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে উনি কী করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, অ্যাট লিস্ট, ভদ্রলোক বিপদে পড়ছেন না তো! রাইট?” “ইয়েস স্যার।”

“যে কোনও বিশ্বস্ত সঙ্গী সেটাই করবে। অথচ ওরকম একটা মারাত্মক দিনে, যেখানে কাউন্টডাউনে জিরো এসেছে, দিনটাও অমাবস্যা, এরকম অবস্থায় শিশির সেনের যা করা উচিত ছিল, সেটাই করলেন না। তিনি ক্যাসাবিয়াঙ্কার পোজ মেরে লালবাজারের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলেন।” অধিরাজ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, “ব্যাপারটা হজম হচ্ছে না অর্ণব।”

“তবে?”

"আমার ধারণা শিশির সেন সেদিন আদৌ লালবাজারের সামনে ছিলেনই না। তিনি ঠিক তখনই এসে পৌঁছেছিলেন যখন লাশটা ডাম্প করা হয়েছিল, আর সুকোমল পান্ডে লাশটার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। খুনী এত বড় গাম্বাট নয় যে শিশির সেনের নাকের সামনেই লাশ ফেলবে।" অধিরাজের কপালে চিন্তার ছাপ, "আমার প্রশ্ন, তবে তিনি কোথায় ছিলেন? কোন কথা তিনি বত্রিশ বছর ধরে গোপন করে আসছেন। সবচেয়ে বড় কথা অফিসার দাশগুপ্ত যদি এই কেসটা ক্র্যাক করতে পারতেন, তাহলেই তাঁর বড় একটা প্রোমোশন হত। যেটা এডিজি শিশির সেনের ক্ষেত্রেও হয়েছে ।"

অধিরাজ বলতে বলতেই চুপ করে যায়। যদিও এই অ্যাঙ্গেলটার কথা নিজেই দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারছে না। তবু নিজের আবেগ সামলে নিয়ে অর্ণবকে বলল, "এটাও কিন্তু যথেষ্টই সন্দেহজনক। সবদিকই খতিয়ে দেখা ভালো।"

সে নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে। সম্ভাব্য সমাধানের একটা রাস্তা যে শিশির সেনের দিকেই যাচ্ছে তা বুঝতে তার বাকি নেই। একেই তিনি ভুল লোককে ধরেছিলেন, তার ওপর যে মুহূর্তে অফিসার দাশগুপ্তের খুন হয়, সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। লালবাজারের সামনে একা কেন দাঁড়িয়েছিলেন তারও কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই! তাঁর বয়ানকে 'করোবরেট যিনি করতে পারতেন, সেই অফিসার দাশগুপ্ত'ও নিহত। তিনিই একমাত্র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যাঁকে সার্জিক্যাল স কিলার স্পর্শও করেনি। উপরন্তু সম্প্রতি জানা গিয়েছে তিনি টম অ্যান্ড জেরি দেখেন, আর নিজে না মাখলেও তাঁর বাড়িতে জনসনস বেবি ক্রিম ও বেবি পাউডারের উপস্থিতি প্রমাণিত। সন্দেহের তীর তো যাবেই তাঁর দিকে!

অর্ণবের মনে পড়ল এডিজি সেনের শেষ কথাগুলো। ওরা যখন বেরিয়ে আসছিল, তখন ভদ্রলোক অর্ণবকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "সরকার, ব্যানার্জির থেকেও বেশি চাপ তোমার। ব্যানার্জি অবিকল স্যারের মতো। ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে, ডেয়ার ডেভিল, কোনও কিছুর তোয়াক্কা করে না। ভীষণ ওয়ার্কোহলিক আর ডেডিকেটেড। প্রয়োজনে নিজের মাথাটা কেটে ফেলতেও দু'বার ভাববে না। এই প্রজাতিকে তুমি আর আমি দু'জনেই ভালোভাবে চিনি। আমার ভুলটা তুমি কোর না।

একদম ছায়ার মতো ব্যানার্জির সঙ্গে লেগে থাকবে। আমার ধারণা দিনের বেলায় রিস্ক নেই। কিন্তু রাত্রে একমুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করবে না। এই মার্ডারারকে বিশ্বাস নেই। সে সব কিছু করতে পারে... সব...!" অর্ণব তাঁর চোখের দিকে অনিমেষে তাকিয়েছিল। অসম্ভব কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করছিলেন তিনি। একটা সজোরে শ্বাস টেনে বলেছিলেন বাকি কথাগুলো, "ব্যানার্জি যদি তাজমহল হয়, তবে তুমি চীনের প্রাচীরের মতো ওর সামনে দাঁড়াও। ও যদি তরোয়াল হয়, তবে তুমি দুর্ভেদ্য ঢাল সরকার! ও স্ট্রাইকার হলে তুমি স্টপার! সরকার, এখন কেসটার অর্ধেক তোমার হাতে।"

অর্ণব নীচু স্বরে বলেছিল, "ওকে স্যার।"

মুহূর্তটা মনে আসতেই কেমন যেন কেঁপে উঠল সে। এই মানুষটাকেও আজ সন্দেহ করতে হচ্ছে! অধিরাজের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার মুখে সেই একই বেদনা ও বিপন্নতার মিশ্রণ। সে প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে দেয়, "বাকি চারটে সম্ভাবনা কী?"

– "হতে পারে, সুকোমল পান্ডেই আসল খুনী। মানে, শিশির সেন সঠিক লোককেই ধরেছিলেন। সেজন্যই বত্রিশ বছর ধরে আর একটাও খুন হয়নি।" অধিরাজের মুখে অসন্তোষের ছাপ, "কিন্তু এই সমাধানটাও সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। কিন্তু তবু সুকোমলও সাসপেক্ট লিস্টে আছে। ও ব্যাটাও নির্ঘাৎ আরও কিছু জানে, বলছে না।"

"আর?"

"এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে খুনীর আসল টার্গেট ছিলেন রথীন দাশগুপ্তই। বাকি আটটা খুন তাঁর কাছে পৌঁছতেই করা হয়েছে। সেজন্যই তাঁকে মারার পর আর কোনও খুন করতে হয়নি।"

এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায় অর্ণবের। যদি এটাই বাস্তব হয়, তবে খুনী সত্যিই উন্মাদ! শুধু একজনকে মারার জন্য আট-আটটা খুন! আটখানা প্রাণ নেহাৎই কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ! কী সাঙ্ঘাতিক!

"তথাকথিত যমরাজ অনেক হিস্ট্রিশিটার, গ্যাংস্টারদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ লোকটা আলটপকা মরে গেলে গোটা আন্ডারওয়ার্ল্ড শ্যাম্পেনে স্নান করত। তার ওপর এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু! দেখলে মনে হয় না, যে গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে?"

“তাহলে আগের অতগুলো প্রাণ এমনি এমনিই নিয়ে নিল?”

“এমনি এমনিই নয় অর্ণব।” অধিরাজ একটু চিন্তা করে নেয়, “প্রথম—পাঁচজনকে ইচ্ছে করেই মেরেছে। দু'তিনটে লাশ পড়লে ১৯৮৭ সালের পুলিস চট করে সি আই ডি হোমিসাইডকে ডাকত না। কিন্তু খুনীর ব্যাডলাক, খুনী তৎক্ষণাৎ ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে খুন করল। হয়তো তার আগেও পাঁচটা খুন করার পরও পুলিস সি আই ডি’কে কেসটা ট্রান্সফার করল না। আইও-দের খুন করার প্ল্যানিং করেনি। কিন্তু এবার সে একটা সিরিয়াল কিলিঙের প্যাটার্ন তৈরির সুযোগ পেয়ে গেল। তার লক্ষ্য তখনও অফিসার দাশগুপ্তই ছিলেন। কারণ ‘সার্জিক্যাল স’ কিলার তখন কলকাতা কাঁপাচ্ছে। এরকম ভয়ঙ্কর খুনীর জন্য তথাকথিত ‘যমরাজ’কেই বেছে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল ওপরওয়ালাদের। কিন্তু আবার ব্যাড লাক! অফিসার দাশগুপ্ত’র আগে আরও দু'জন অফিসার এসে পড়লেন। খুনীর প্যাটার্ন চেঞ্জ করার উপায় ছিল না। অগত্যা...!”

“কিন্তু মার্ডারার তো একগুলিতেই অফিসার দাশগুপ্তকে উড়িয়ে দিতে পারত।”

—“পারত অর্ণব।” অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, “কিন্তু সেক্ষেত্রে তৎকালীন হিস্ট্রিশিটারদের ওপরই লাফিয়ে পড়ত পুলিস। সমস্ত গ্যাংস্টারদের ধরে ধরে কুকুরের মতো এনকাউন্টার করত। মানছি, অফিসার দাশগুপ্ত’র শত্রুর সংখ্যা কম ছিল না। আবার এত বেশিও ছিল না যে গুণে শেষ করা যাবে না। ঐ লোকটাকে মারতে গিয়ে নিজের পায়ে কেউ সরাসরি কুড়ুল মারে!”

“বেশি ছিল না! কত লোককে উনি গুলি করে মেরেছেন...!”

- “ঠিক সেজন্যই তাঁর শত্রু সংখ্যা কম অর্ণব। কারণ অফিসার দাশগুপ্ত অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখার লোকই ছিলেন না। তাঁর মতে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই বেশির ভাগই ফৌত হয়ে গিয়েছে। যারা ছিল, তারা সরাসরি পুলিস স্কোয়াডকে নিজেদের এনকাউন্টার করার ইনভিটেশন দেবে কখনও? কারণ শুধু অফিসার দাশগুপ্ত মারা গেলে সাসপেক্টের সংখ্যা লিমিটেড। কিন্তু সিরিয়াল কিলিঙের চেইনে ফেলে দাও। কোনও সাসপেক্টই পাবে না। যেমন আমাদের হাতে নেই! সাতজন ছিলেন, কিন্তু সাতজনকেই বেনিফিট অব ডাউট দিতে হচ্ছে। সন্দেহের আওতায় থাকলেও কারোরই জোরালো মোটিভ নেই!”

কথাটা নিঃসন্দেহে সত্যি। বাকি কেসগুলোয় সাসপেক্টদের মধ্যে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হয়। এখানে সাসপেক্টরাই সম্ভবত নিরপরাধ! একটা গোটা শহর থেকে খুনীকে খুঁজে বের করতে হবে, যার কোনও পরিচয়ই জানা নেই। অর্ণবের মনে হল, তারা একটা নৃশংস ম্যান-ইটারের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে যার সম্পর্কে কোন তথ্যই নেই। সে দেখতে কেমন, লম্বা না বেঁটে, ফর্সা না কালো; কী জাতীয় জন্তু, রুদ্রপ্রয়াগের লেপার্ড না কালান্তক বুনিপ; কিছুই জানে না!

– "ফোর্থ; ব্ল্যাক ম্যাজিক। যেটা অফিসার দাশগুপ্তেরও সন্দেহ হয়েছিল। লক্ষ্য করেছ, ওদিকে এক ভিকটিমের স্ত্রীও জানিয়েছেন যে অফিসার এক বাবার কাছে গিয়েছিলেন? অমাবস্যা, শিরচ্ছেদ, সেক্স— এগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিকের দিকেই ইঙ্গিত করছে। ব্ল্যাক ম্যাজিকের কেস হলে স্বাভাবিকভাবেই মাথাগুলো পাওয়া যাবে না। এই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেই বা হত্যালীলা থামল কেন? যিনি এই নরবলিগুলো দিচ্ছিলেন তার কি শুধু ন'জনেরই বলি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল? তাহলে যিনি আমার মাথার ওপর তান্ডব করছেন, তার আবার কী চাই! তিনিই কি ইনি?" সে চিন্তান্বিত স্বরে বলে, "অর্ণব, একবার পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে দেখো তো অফিসার দাশগুপ্ত কোন কোন তান্ত্রিক, অঘোরী বা সাধুবাবাদের পাকড়াও করেছিলেন? তাদের মধ্যে যদি একজনও বেঁচে থাকেন, তাকে আমিও দেখতে চাই।"

"ওকে স্যার।"

"অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট অ্যাঙ্গেল, কেউ সুকোমল পান্ডেকেই ফ্রেম করতে চেয়েছিল। সে জানত ও লোকটা একজন সমকামী। সেজন্যই গে'র অ্যাঙ্গেলটাও আনতে হল।" বলতে বলতেই বিরক্তিতে মাথা নাড়ে সে, "এ থিওরিও হাস্যকর। সুকোমল পান্ডেকে ফ্রেম করতে হলে একটা খুনই যথেষ্ট ছিল। কষ্ট করে ন'খানা খুন করার অর্থ কী? অবশ্য একটা খুন করলে সুকোমলের যাবজ্জীবন হত। কিন্তু নটী খুন করলে ফাঁসি অবধারিত! তাহলে বুঝতে হবে, খুনীর সুকোমলের ওপর প্রচণ্ড রাগ ছিল। ওকে ফাঁসিতে লটকাবার জন্যই এত প্রচেষ্টা! আবার তাকে ধরলেন কে দেখো! শিশির সেন! যিনি বিখ্যাত এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের বিশ্বস্ত সঙ্গী। স্যারের মতো তিনিও এনকাউন্টারে ওস্তাদ! আর

পুলিসের গায়ে হাত তুললে পুলিস কতটা রিভেঞ্জফুল হতে পারে তা সর্বজনবিদিত! তার ওপর আবার প্রিয় 'স্যারের' ঐ দশা চোখের সামনে দেখে শিশির সেনের মাথায় খুন চেপে যাওয়াই স্বাভাবিক। ঐ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে সবচেয়ে নর্মাল অ্যাকশন ছিল তখনই সুকোমলের বুকে পুরো ছটা বুলেট ঠুকে দেওয়া। হয়তো খুনীও তেমনই কিছু এক্সপেক্ট করেছিল। কিন্তু তিনি সেসব না করে ঠান্ডা মাথায় লোকটাকে গ্রেফতার করলেন! শিশির সেনের চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই যাচ্ছে না! জজসাহেবও লোকটাকে ফাঁসি দিলেন না। খুনীর কী কপাল! কিন্তু হয়তো তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু বত্রিশ বছর পর যে-ই সে মুক্তি পেল, এবার আমাকে পটল তুলিয়ে সুকোমলকে মামাবাড়ি অথবা যমের বাড়ি পাঠানোর তাল করছে।"

অধিরাজ আপনমনেই মাথা নাড়ল, "সুকোমল পান্ডের চেয়েও এই কেসে বেশি মিস্টিরিয়াস শিশির সেনের ক্যারেক্টার অর্ণব। কিছু গোলমাল আছেই যা উনি বলছেন না! খুনীর প্যাটার্ন দেখেই আমার মনে হচ্ছে সে পাঁচজনকে আনতাবড়ি মারলেও আসলে তার মেইন টার্গেট পুলিস অফিসাররাই ছিলেন। খুব আশ্চর্য হব না যদি আরও সূক্ষ্ম বিচারে অফিসার দাশগুপ্ত হয়ে থাকেন। পরপর তিন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের শোচনীয় মৃত্যুর পর হোমিসাইডও ভয় পাচ্ছিল, তাই প্রায় ছ'মাস ধরে ফাইলটা আনসলভড কেস হয়ে পড়ে ছিল। এর মধ্যে আর কোনও খুনও হয়নি! ছ'মাস পরে যেই অফিসার দাশগুপ্ত মাঠে নামলেন, অমনিই সে এসে হাজির! ব্যাপারটা আদতে কী!"

"আর বত্রিশ বছর পরে আবার যখন কেস ফাইল খুলল, আবার সে হাজির!" কাঁপা কাঁপা স্বরে আহেলি বলল। তার চোখের আতঙ্ক ও আশঙ্কা চোখ এড়াল না অর্ণবের।

অধিরাজ ছোট্ট নড করে, "ওয়েল সেইড। কিন্তু সেখানেও গোলমাল কাউন্টডাউন শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা তার সিগনেচার 'সার্জিক্যাল স' এর দেখা পাইনি। বাবুর মাথাটা অক্ষতই ছিল। 'গেস হু?' লেখা হাঁড়িই বা কোথায় গেল? প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম প্রয়োগ বা সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে কিনা সেটা অবশ্য রাতেই জেনে যাব। কিন্তু মার্ডারের প্যাটার্ন আবার চেঞ্জ হল কেন?"

অধিরাজ চোখ বুঁজে সিটে এলিয়ে পড়ল। আপনমনেই নীচু স্বরে বিড়বিড় করে, "সেম মার্ডারার? না চলমান অশরীরীর মতো লিগ্যাসি! ফ্যান্টম ইনফর্মার!... ফ্যান্টাস্টিক স্টকার! সত্যিই গে'? না ভান করছে? সুমঙ্গল পন্ডিত, মিসিং লিঙ্ক? ...শিশির সেন কী লুকোচ্ছেন? সুকোমল পান্ডে কী জানে? ...বেবো ব্রিগ্যানজা !... ব্ল্যাক ম্যাজিক? অমাবস্যা! ...লাল হলুদ বাইক! ...কোনও সিঙ্গল থিওরিই ঠিক মতো বসছে না! ...তবে কি এমন অন্য কোনও অ্যাঙ্গেল আছে যেটা আমরা মিস করছি? গেস হু নয়, গেস হোয়াই! তবে কেন? ...কেন?"

অর্ণব চুপচাপ ড্রাইভ করতে থাকে। সে জানে এখন অধিরাজকে বিরক্ত করা উচিত নয়। অধিরাজ এখন অঙ্ক মেলানোর চেষ্টা করছে। এই ভঙ্গি তার চির পরিচিত। অর্ণব তাই ভুল করেও হর্ণ দিচ্ছে না। আহেলিও যথেষ্ট বুঝদার। সে চিপসের প্যাকেটটাকে সরিয়ে রাখে। চিপসের প্যাকেটের খচরমচর, বা খাওয়ার সামান্য আওয়াজও মানুষটার চিন্তাকে ব্যাহত করতে পারে। অধিরাজের মুখে অনেক দ্বিধা, সংশয়, চিন্তা ছাপ ফেলে ফেলে সরে যাচ্ছে। সে নিজের মনেই প্রশ্ন করে চলেছে, "গেস হোয়াই? খুনীর মনে কী আছে? কী প্রমাণ করতে চায়! কেন...? কেন...? থিঙ্ক... থিঙ্ক!" ভাবতে ভাবতেই আচমকা চোখ খুলে তাকাল সে। গাড়িটা ট্র্যাফিক সিগন্যালে আটকে গিয়েছে। অধিরাজ একটু অন্যমনস্কভাবেই আশেপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। ঠিক তাদের গাড়ির পাশেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। পেছনের সিটে এক বোরখা পরা মহিলা একগোছা গোলাপ হাতে নিয়ে বসে আছেন। দেখলেই বোঝা যায় সন্তানসম্ভবা। অধিরাজ অপ্রতিভ হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। একজন গর্ভবতী মহিলাকে এমন প্যাট প্যাট করে দেখাটা অশালীন। ট্যাক্সির মধ্যে বসে, কালো বোরখার নীচে একজন পুরুষ তার এই ভদ্রতাবোধে ফিক করে হেসে ফেলল। সে অনেকক্ষণ ধরেই এই গাড়িটার পিছন পিছনই আসছে। সারা ট্যাক্সিতে গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো! এতক্ষণ ধরে একটা একটা করে গোলাপের পাপড়ি ছিড়ছিল আর বলছিল, "হি লাভস মি, হি লাভস মি নট ...হি লাভস মি, হি লাভস মি নট...হি লাভস মি...।"

এবার তার হিংস্র দৃষ্টি অধিরাজের ওপর স্থির হল। সে চাপা গলায় বলে, "হু কেয়ার্স!"

খুব আস্তেই হেসে উঠল লোকটা। হাতে যে গোলাপটা ছিল, সেটাকে অদ্ভুত এক রাগে মুঠোয় পিষছে! সুন্দর গোলাপটার সমস্ত পাপড়ি মুহূর্তের মধ্যে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে দলিত-মথিত হয়ে দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ল। একটা গোলাপ যৌবনেই খুন হয়ে গেল!

(১৩)

স্লটার-হাউজটাকে দেখলেই কেমন যেন গা শিরশির করে ওঠে। বত্রিশ বছর আগেও এই বড়সড় দোতলা বিল্ডিংটা সরগরম থাকত। কিন্তু এখন নেহাৎই ইট-পাথরের কঙ্কাল! একতলায় কোনও জানলা নেই। অন্ধকূপের মতো বদ্ধ প্রাচীন বধ্যভূমি। দোতলায় যে ক'টা জানলা আছে সবই ভাঙা। যেন করোটির শূন্য অক্ষিকোটর! খাঁ খাঁ শূন্যতার মধ্যে একা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনও বৈদ্যুতিক আলো নেই। বেশ কিছুটা দূরে বস্তি অঞ্চল। কিন্তু এখন সেখানেও অন্ধকার। আশেপাশে গড়ে ওঠা স্লটার-হাউজগুলোও বন্ধ। চতুর্দিকে অসীম তমিস্রা ফাঁদ পেতে রেখেছে। শুধু নীলাভ জ্যোৎস্না এসে পুরনো বিবর্ণ টিনের ছাতে পড়েছে। গোটা বাড়িটাই মৃত্যু নীল, নীরব ও বিষণ্ন। একটা দুটো গাছ আবার দেওয়াল ফাটিয়ে শিকড় গেড়ে দিব্যি গজিয়ে উঠেছে। তাদের শাখাপ্রশাখা এমনভাবে বিস্তারিত যে দেখলেই মনে হয়, বাড়িটা বুঝি দু'হাত ছড়িয়ে কারোর অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

অর্ণব সভয়ে বাড়িটার দিকেই তাকিয়েছিল। সম্ভবত এই অন্ধকূপেই নিরুপায়, অসহায় হয়ে প্রবল যন্ত্রণায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন ন'জন মানুষ। বত্রিশ বছর আগের সেই রক্তাক্ত ইতিহাস বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে কসাইখানা। তার প্রতিটা ইঁটে কত রক্ত লেগে আছে কে জানে! কত যন্ত্রণা কাতর চিৎকার আজও ইতিহাস হয়ে গুমরে মরে এই দেওয়ালে তারই বা হিসাব কে রাখে! ভাবতেই তার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অধিরাজও সেই বিষণ্ন, রক্তশূন্য প্রাচীন স্লটার-হাউজের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এক দুর্দান্ত খুনীর জীবনপঞ্জীর এক গুরুত্বপূর্ণ পাতা এই বিল্ডিং! যে খুনীকে সে পড়ার চেষ্টা করছে, সে এখানে বত্রিশ বছর আগে রক্তাক্ত এক ট্র্যাজেডি লিখেছিল। এই ভগ্নপ্রায়, বিধ্বস্ত প্রাচীন বাড়িটা সেই গল্প শোনাবে কি? যে রহস্যময় শব্দ এখন এখানে শোনা যায়, তার ইতিবৃত্ত জানা যাবে কি? সেই সঙ্গে নেপথ্য নায়কের সঙ্গেও দেখা কি হবে আজ!

হঠাৎ একটা উষ্ণ স্পর্শে তার সম্বিত ফিরল। অধিরাজ বিস্মিত হয়ে দেখল, আহেলি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। মেয়েটার উষ্ণ, ঘামে ভেজা কোমল হাত অধিরাজের বলশালী হাতকে প্রায় লতার মতোই আঁকড়ে ধরে আছে। সে একটু অস্বস্তি বোধ করে। আজ পর্যন্ত কোনও নারী এমনভাবে তার হাত স্পর্শ করেনি। মেয়েটা তার বুকের কাছে অনেকটা ঘনিয়েও এসেছে! তার হাবভাবেই স্পষ্ট ভয়!

– "ফিলিং এক্সাইটেড রাজা?" অন্ধকারের মধ্যেই দুটো ছায়ামূর্তি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ওদের দিকে। অফিসার পবিত্র আচার্য আর মিস আত্রেয়ী দত্ত। পবিত্র হাসতে হাসতে বলল, "রামসে ব্রাদার্স যদি এই স্লটার-হাউজটা দেখতেন তবে আরও একখানা মোক্ষম হরর ফিল্ম তৈরি হয়ে যেত!"

"সেই ফিল্মে বোধহয় তুমি ভিলেনের রোল করতে!" অধিরাজ মিটিমিটি হাসে, "চিরকালীন দুষ্ট আত্মা!"

"আত্মাদের তো ব্যাডলাকই খারাপ!" পবিত্র বিষণ্ণ স্বরে বলে, "ছোটবেলায় দেখতাম যখনই মেয়েরা বাথরুমে স্নান করে ঠিক তখনই ভূত এসে হাজির! ভূতের কী টাইমিং বলো! কেন, ওদের ঘরে বুঝি মা বোন নেই? কী ইনসাল্ট!"

- "ফাজলামি পরে। এই দেখো তোমার জোকস শুনে মিস মুখার্জী ভয় পাচ্ছেন।"

আহেলি একটু হকচকিয়ে গিয়ে অধিরাজের হাত ছেড়ে দিল। পবিত্র ভ্রূ ভঙ্গি করে, "এই অন্ধকারে শালা নিজের হাত পা-ই দেখতে পাচ্ছি না, অন্য কাউকে ঠিকমতো দেখা তো দূর! অথচ তুমি মামা বুঝলে কী যে মিস মুখার্জী ভয় পাচ্ছেন?"

অধিরাজ কথাটা এড়িয়ে গেল, "বাদ দাও। লোকাল লোকেরা কী বলছে? আওয়াজটা ঠিক কখন শুরু হয়?"

"ঐ যে দূরে বস্তিটা দেখতে পাচ্ছ না?" পবিত্র জানায়, "বস্তির লোকেরা স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে কাঁচকলা দেখিয়ে এখানে সন্ধ্যে থেকে ভোর অবধি প্রায়ই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আসে। তারাই বলছে যে ঠিক রাত একটা কী দুটো থেকে এই আওয়াজটা শুরু হয়। অস্ত্রে শান দেওয়ার শব্দ, কারোর রক্তজল করা হাসি! একেই এরকম ভয়ঙ্কর পোড়োবাড়ির মতো দেখতে, তার ওপর আবার বিটকেল আওয়াজ! প্রথম যেদিন দুটো

বাচ্চা ছেলে শুনেছিল, তখন ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার ভেবে ওখানেই উলটে পড়েছিল। এখন তো ভয়ের চোটে এদিকে আর কেউ আসে না।"

"হন্টেড ভাবাটাই স্বাভাবিক। ওরা তো আর ভূতের পেছনের মানুষের অস্তিত্বের খবরটা জানে না!" অধিরাজ তার রেডিয়াম অঙ্কিত ঘড়ি দেখে বলল, " সবে তো কলির সন্ধ্যে! বারোটা বাজতে পাঁচ। আশা করছি আরও একঘণ্টার আগে শ্রীমান দেখা দেবেন না।"

"গেমপ্ল্যান কী?"

"গুড কোয়েশ্চেন।" অধিরাজ মুচকি হাসল, "আপাতত তুমি আর মিস মুখার্জী এই পোড়োবাড়ির ভেতরে ঢুকবে। দেখো ওখানে কী অস্ত্রে শান দেওয়া হচ্ছে। মিস মুখার্জী ফরেনসিক কিট সঙ্গেই এনেছেন। উনি একটু খুঁজে দেখবেন যদি ওখানে কোনওরকম লিড বা ক্লু পাওয়া যায়। আমরা বাইরেই আছি। তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলে ব্লু টুথে বলে দেব। আর তোমরা ভেতরের দৃশ্য দেখে আমাদের বলবে। আমি সবাইকে ফোন কলে নিচ্ছি। ব্লু টুথ অন রেখো। দয়া করে আর কথা না বাড়িয়ে ঢুকে যাও ভেতরে।"

"তালা ভেঙে?"

"তালা ভাঙলে খুনী বাইরে থেকেই পালিয়ে যাবে।" অধিরাজ অন্ধকারেই মিটিমিটি হাসে, "তোমায় আজ রবিঠাকুর ধরেছেন দেখছি। তখন থেকেই দেখছি গাইছ; বাঁধ, আই মিন তালা ভেঙে দাও, তালা ভেঙে দাও...! কেন? ঐ ওপরের হাঁ করা জানলাগুলো দেখতে পাচ্ছ না?"

পবিত্র কিছুক্ষণ আক্ষরিক অর্থেই হাঁ করে তাকিয়ে 'হাঁ করা' জানলাগুলো দেখল। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, "রাজা, জানলা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তালাটাই কি বেশি সেফ নয়? ওই হাইটে উঠবে কোন শালা? আমি তো রণপা পরে আসিনি! মিস মুখার্জী, আপনি কি হিল পরেছেন?"

মিস দত্ত খুক খুক করে হেসে ওঠে। এতদিন সে যেসব অফিসারদের সঙ্গে কাজ করে এসেছে, প্রায় সকলেই টিপিক্যাল গোমড়াথেরিয়াম ছিল। এই সময়টা আদৌ রসিকতার নয়। বরং যথেষ্ট উত্তেজক মুহূর্ত। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই রসিকতা করছে। সে অতি অল্প সময়েই বুঝতে পেরেছে, টিম অধিরাজ চূড়ান্ত সিরিয়াস কাজও অত্যন্ত মনের আনন্দে

করে। এটাই তাদের স্টাইল। অধিরাজ তার টপ বস। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একবারও বোঝানোর চেষ্টা করেনি যে 'আমি কিন্তু অমুক চন্দৰ তমুক' হনু। লেডি অফিসারদের ভুলভাল নাম ধরে ডাকলেও অন্য অফিসারদের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছে ওটা তার ক্রনিক প্রবলেম। তার ইমিডিয়েট বস, অর্ণবও ভারী শান্ত ঠান্ডা।

বলাই বাহুল্য, এই টিমটাকে বেশ মনে ধরেছে আত্রেয়ীর।

"কী আশ্চর্য! রণ পা না পরে দেওয়াল বেয়ে ওঠা যায় না?" অধিরাজ খুব নম্রভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করে, "ঐ তো কার্নিশ। ওর ওপর পা রেখে উঠে যাও না!"

পবিত্র তাকিয়ে দেখল যে কার্নিশের কথা বলা হচ্ছে, সেটা অন্তত দুটো মানুষের সম্মিলিত দৈর্ঘ্যের সমান উচ্চতায় রয়েছে।

"রাজা, মাউন্টেনিয়ারিংটা আমার জানা নেই! ওটা তোমার স্পেশ্যালিটি ভাই।"

"ধুত্তোর।" বিরক্ত হয়ে অধিরাজ জানলার ঠিক নীচে মাটির ওপরেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে; "টাইম ওয়েস্ট না করে আমার কাঁধে চড়ো। কার্নিশ অবধি পৌঁছে যাবে। আর ফরেনসিক কিটের বক্সটাও তুমিই নিয়ে যাও। ওটা মিস মুখার্জী ঘাড়ে নিয়ে উঠতে পারবেন না। তুমি ভেতরে ঢুকলে তবেই মিস মুখার্জীকে পাঠাব।"

"যাক, এই ফাঁকে আমি বেতালের দুঃখ এক্সপেরিয়েন্স করে নিই।" পবিত্র একহাতে ফরেনসিক কিটবক্স নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে অধিরাজের কাঁধের ওপর উঠে পড়েছে। এরপরের ব্যালান্সের খেলাটা দেখে উপস্থিত সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ! আত্রেয়ী হাঁ করে দেখছিল আর ভাবছিল, এরা কি সার্কাসের ট্রেনিংটাও নিয়েছে! অধিরাজ অবলীলায় পবিত্রকে কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দুই অফিসারের কেউই একটুও নড়বড় করল না। একজনের চওড়া কাঁধের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে অন্যজন। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যালান্সড!

"কার্নিশ পাওয়া যাচ্ছে?"

"পেয়েছি বস।"

অধিরাজের কাঁধ থেকে ছোট্ট একটা লাফে পবিত্র কার্নিশে খুব সাবধানে ল্যান্ড করল। তারপর আরেকটি শৈল্পিক লাফ মেরে ফাঁকা জানলা দিয়ে ঢুকে যাওয়া নিতান্তই জলভাত।

ভেতরে ঢুকে সে জানলা দিয়ে হাত নাড়ায়; পৌঁছে গেছি।"

"ফাইন। মিস মুখার্জী?"

আহেলির ঘটনা দেখেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। সে ঢোঁক গিলে বলে, "আমাকেও কার্নিশে উঠে লাফ মেরে ভেতরে ঢুকতে হবে?"

"অত কষ্ট করতে হবে না। পবিত্র অলরেডি ওখানে আছে। আপনি শুধু কার্নিশে ঠিক করে পা টা রাখবেন। ও আপনাকে হাত ধরে টেনে তুলে নেবে।" সে আত্রেয়ীর দিকে তাকায়, "মিস দত্ত। ওনাকে একটু হেল্প করুন প্লিজ।"

স্বাভাবিক। মহিলাদের লেডি অফিসাররাই সাহায্য করবেন। অফিসার আত্রেয়ী দত্ত মাথা ঝাঁকিয়ে সেদিকে এগোতেই যাচ্ছিল। তার আগেই নজরে পড়ল অধিরাজের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ণব ইশারায় নেতিবাচক মাথা নাড়ছে। কয়েক পা এগিয়েই থমকে গেল আত্রেয়ী। হতবিহ্বল হয়ে অধিরাজের দিকে তাকায় সে। কী বলবে বুঝতে পারছে না। অধিরাজ অবাক, "কী হল!"

"আমার পিঠে ক্র্যাম্প ধরেছে স্যার।"

"কখন! এতক্ষণ তো ঠিকই ছিলেন!" অধিরাজ চোখ কপালে তুলে ফেলেছে, "এই তো দিব্যি স্ট্রেট হেঁটে এলেন!"

আত্রেয়ী দত্ত তার বড় বড় চোখ দুটোয় একেবারে অসহায় নিরূপা রায়ের দৃষ্টি এনে ফেলেছে। অর্ণব অতিকষ্টে হাসি সামলায়। এ মেয়ে তো দারুণ অভিনেত্রী! এবার অবিকল বাহাত্তুরে বুড়ির মতো ঝুঁকে পড়ে বলল; "এতক্ষণ ছিল না। কিন্তু এখনই... ও-রে বা-বা!"

অধিরাজ ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "না না! আপনি এক্ষুনি আমাদের গাড়িতে গিয়ে বসুন। ওখানে স্প্রে আছে। অর্ণব...।"

অর্ণব পিছনে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল আর কোনওমতে মুখে হাত রেখে হাসি আড়াল করছিল। আত্রেয়ীর অভিনয় রীতিমতো ইমপ্রেসিভ। এবার খুব নিরীহ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছে, "স্যার?"

— ‘‘ওনাকে একটু মেডিক্যাল কিট বক্স থেকে স্প্রে'টা বের করে দাও।" অধিরাজের মুখ চিন্তান্বিত, "এই রাতটা খুব ভাইটাল। ক্র্যাম্প ধরলে মুশকিল।"

অর্ণব লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নেড়ে মিস দত্তের দিকে এগিয়ে যায়। অধিরাজ একরকম বাধ্য হয়েই আহেলির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আসুন।"

একটু দূরে দাঁড়িয়েই অর্ণব আর আত্রেয়ী ঘটনাটা দেখছিল। অর্ণব গাড়ি থেকে স্প্রে বের করে আনে, "এই নিন।"

আত্রেয়ী একেবারে ভাবালু চোখ করে আহেলির সামনে নতজানু হয়ে বসা অধিরাজের দিকে তাকিয়েছিল। আস্তে আস্তে বলল, "স্যার কী সুন্দর রোম্যান্টিকভাবে বসে আছেন। তাই না?"

- "মিস দত্ত।" অর্ণব মৃদু হাসল, "উনি নেহাতই দায়ে পড়ে বসেছেন, কারণ আপনার ক্র্যাম্প ওঁকে প্রায় পথেই বসিয়েছে। আর এই ডায়লগ যদি কোনওভাবে ওর কানে যায়, তবে আপনি আর আমি দু'জনেই বসে যাব।"

"ওঃ!" আধহাত জিভ কাটল আত্রেয়ী, "না না! আমি কিছু বলিনি স্যার! ভুলে যান।"

"কী ভুলে যাব?" অর্ণব মুচকি হাসে, "আমি তো কিছু শুনিইনি।" অন্যদিকে আহেলি প্রথম দিকে একটু ভয় পেলেও সামলে নিয়েছে। সে অধিরাজের কাঁধে পা রাখতে একটু ইতস্তত করছে দেখে অধিরাজ বলে, "আমাদের হাতে গোটা বছরটা নেই মিস মুখার্জী। একটু তাড়াতাড়ি।" আহেলি একদম বাধ্য মেয়ের মতো অধিরাজের কাঁধে পা রাখে। কিন্তু যখনই দাঁড়াতে গেল, তখনই টলমল করে উঠল সে।

"ওরে বাবা! পড়ে যাব... পড়ে যাব...!"

"আপনি মিস না হয়ে মিসাইল হলে অনেক সুবিধা হত দেখছি।" অধিরাজ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে, "দাঁড়াতে হবে না। আপনি বরং পা ঝুলিয়েই বসুন।"

সে বিনা বাক্য ব্যয়ে অধিরাজের দুই কাঁধের ওপর দুই পা ঝুলিয়ে বসল।

-"কমফোর্টেবল?"

আহেলি ভয়ে ভয়ে জানতে চায়, "পড়ব না তো!"

অধিরাজ নিজের হাত দুটো তুলে দেয় তার দিকে, "হাত ধরুন, আর আরাম করে বসুন। ওরকম বাঁশের মতো স্টিফ হয়ে বসবেন না প্লিজ। আমি উট নই।"

আহেলি তার হাত দুটো সজোরে চেপে ধরল। একটু একটু ভয় লাগলেও এই বিশেষ মানুষটির ওপর তার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাকে কাঁধে নিয়ে কী অবলীলায় টানটান হয়ে দাঁড়াল লোকটা। যেন আহেলি নামক বস্তুটির কোনওরকম 'ভর' বা 'ভার' নেই। কী শক্ত কাঁধের লোক। এমন মানুষকে বিশ্বাস করা যায়, তার ওপর সহজেই নির্ভর করা যায়।

এরপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

আহেলি খুব নিরাপদেই কার্নিশ অবধি পৌঁছে গেল। সেখান থেকে খুব সহজেই তাকে হাত ধরে ওপরে টেনে নিল অফিসার পবিত্র আচার্য।

"পবিত্র, মিস মুখার্জী আপনারা একটু সাবধানে গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখুন। আমার ধারণা কিছু না কিছু ওয়েপন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। মিস মুখার্জী, অ্যালার্ট থাকুন। সম্প্রতি যখন কারোর এখানে যাতায়াত শুরু হয়েছে, তখন কোনও না কোনও ফরেনসিক এভিডেন্স পাওয়া আশ্চর্য নয়। আমরা বাইরে আমাদের মহান অতিথির জন্য অপেক্ষা করছি।"

"গট ইট।"

(১৪)

দোতলাটা একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাইরের নীলাভ জ্যোৎস্না যতটুকু এসে পড়ছে, তা যথেষ্ট নয়। বরং অন্ধকারের রঙটা গাঢ় নীল হয়ে গিয়ে আরও বেশি রহস্যময় দেখাচ্ছে। যতটা রহস্যাবৃত, ঠিক ততটাই বিষণ্ন। জানলার পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া গাছের পাতা অল্প অল্প নড়ছে। চট করে দেখলে মনে হয়, কোনও মানুষের সিল্যুয়েট হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভেতরে পা রাখতে না রাখতেই একটা বিটকেল দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল আহেলির। রীতিমতো মাংস পচা গন্ধ। সে বিস্মিত হয়। এখন তো এখানে আর জবাই হয় না! তবে এ কীসের গন্ধ! "সঙ্গে রুম ফ্রেশনারটা আনলে ভালো হত।" পবিত্র একটা হাই পাওয়ারের টর্চ কোমরের বেল্টের পেছনে গুঁজে রেখেছিল। এবার সেটাকে জ্বালিয়ে একটু চতুর্দিকটা দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "মিস মুখার্জী, আপনার মাকড়সায় ভয় নেই তো?" মাকড়সা শুনেই প্রায় লাফিয়ে উঠল আহেলি, "কোথায়!"

তার অবস্থা দেখে পবিত্র হাসছে, "আপনারও দেখছি আমার বেটার হাফের মতো অবস্থা! ঐ দেখুন।"

সে টর্‌চটা চতুর্দিকে একবার খুব ধীরে আলতো করে ঘোরাল। তীব্র আলোর রশ্মি গোটা ঘরটাকে ছুঁয়ে গেল। তার মধ্যেই ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে আহেলি দেখল চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আছে মাকড়সার জালে! আর শুধু জালই নয়। তার ওপর দিয়ে কড়কড়ে আট পা বের করে হেঁটে বেড়াচ্ছে নানা সাইজের মাকড়সা। ছোট, বড়, মাঝারি অষ্টাপদেরা খুব স্মথ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে জাল বেয়ে। কেউ কেউ আবার জালে শিকার পড়ার প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে আছে। তাদের কালো কালো পা দেখেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে তার।

"সিংহাসনে রানি বসে আছেন দেখছি!"

পবিত্র'র টর্চের আলো স্থির হল একটি বিশেষ জায়গায়। সেখানে কুচকুচে কালো রঙের পেট মোটা বিরাটদেহী এক মাকড়সা স্থির হয়ে বসে আছে। পেটে মস্ত বড় ডিম! কী কুৎসিত প্রাণী! গায়ে আলো পড়লেও সে একটুও নড়েনি। বরং আহেলির মনে হল মাকড়সাটাও যেন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। গা শিরশিরিয়ে ওঠে তার।

"আপনার কপাল ভালো আপনার ফেভারিট অফিসার ব্যানার্জি এখানে নেই। আমার জায়গায় রাজা থাকলে একটা সুইট বাও করে বলত, 'লেডিজ ফার্স্ট।' আমি আবার অত ভদ্র নই। অতএব আমার পেছন পেছন আসুন। আর এই নিন আপনার ফরেনসিক কিট বক্স।"

"পবিত্র!" ওপাশ থেকে অধিরাজের সংক্ষিপ্ত ধমক ভেসে এল। পবিত্র জিভ কাটে। ভুলেই গিয়েছিল যে তারা প্রত্যেকেই কনফারেন্স কল আর ব্লু টুথের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আছে। তার প্রতিটা মন্তব্য যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারেরাও শুনছে, তা মনেই ছিল না। সে অধিরাজকে নকল করে একটা নম্র 'বাও' করে, "প্লিজ, ফলো মি মাদমোয়াজেল।" হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আহেলি। যদিও খোঁচাটা খেয়ে সে মনে মনে বেশ চটেছে। তবু এই মুহূর্তে পবিত্র'র সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছে আদৌ নেই। পবিত্র আস্তে আস্তে মাকড়সার জাল ছিঁড়েছুঁড়ে এগিয়ে গেল। পিছন পিছন অতি সতর্ক পায়ে আহেলি। কে জানে, কোথা থেকে মাকড়সা গায়ে টপকে পড়ে! চতুর্দিকে যেরকম নির্বিবাদে হেঁটে বেড়াচ্ছে, গায়ে উঠে পড়া আশ্চর্য নয়।

বহুবছর ধরে এই স্লটার-হাউজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্বাভাবিকভাবেই দেওয়াল কোথাও কোথাও ধ্বসে পড়েছে। কোথাও পড়বে পড়বে করছে। সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে দুটি মানুষ। প্রাচীন দেওয়ালগুলো এতটাই বিবর্ণ যে টর্চের আলোও তাকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারছে না। শীর্ণ, জীর্ণ দেওয়াল মৃত রক্তহীন মানুষের মতো এলিয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। কোথাও ফাটল ধরে গর্ত হয়ে গিয়েছে। গর্তের মধ্যে সাপের খোলস! প্রাণীটা কোথায় আছে কে জানে! মেঝের অবস্থা আরও খারাপ। কোনওখানে বিরাট ফোঁকর বীভৎস হাঁ করে রয়েছে। অর্থাৎ ঐ অংশের চাঁইটা ভেঙে একতলায় পড়েছে। কোথাও আবার পা রাখলেই নড়বড় করছে। মানে আরও একটু বেশি চাপ পড়লে নির্ঘাৎ ভাঙবে।

"পুরো বিল্ডিংটাই ফ্র্যাজাইল! কর্পোরেশনের এটাকে বিপজ্জনক বাড়ির তকমা দেওয়া উচিত রাজা।" পবিত্র হাঁটতে হাঁটতেই ব্লু টুথে অধিরাজকে আপডেট করে, "যে কোনও মুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। পা রাখতেই ভয় করছে।"

— "সাবধানে এগোও।" আহেলিও কনফারেন্স কলে থাকার দরুণ ব্লু টুথের মাধ্যমে অধিরাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে বলল, "এখনও পর্যন্ত কিছু চোখে পড়ল?"

"একগাদা মাকড়সা আর ভাঙা দেওয়াল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি।" পবিত্র বলল, "কিছু দেখতে পেলেই বলছি। তোমাদের দিকে কোনও ডেভেলপমেন্ট?"

"এখনও পর্যন্ত নিল্! আমরা নীচেই আছি। ডোন্ট ওরি।"

'ডোন্ট ওরি' শব্দটা যদিও পবিত্রকে বলা। তবু ঐ শব্দ দুটোই যেন কানে মধু ঢালল আহেলির। সে সজোরে একটা শ্বাস টেনে এগিয়ে গেল। একটু এগোতেই দু'পাশে বেশ কিছু বড় বড় ঘর পড়ল। একটি ঘরে নানারকম অ্যাপ্রন জাতীয় কিছু ঝুলছে। সব কিছুই ছেঁড়াখোঁড়া আর নোংরা! অ্যাপ্রণ বলে ওটাকে চেনাই যেত না, যদি না পবিত্র বলে দিত। পরের একটি ঘরের দিকে আলো পড়তেই প্রায় আঁতকে উঠল আহেলি। ওগুলো কী! দেওয়ালে ওগুলো কী ঝুলছে সাপের মতো! সাপ নাকি।

পবিত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "ওগুলো বেল্ট! চাবুকও বলতে পারেন। চতুষ্পদ প্রাণীদের গা থেকে চামড়া আলগা করে নেওয়ার জন্য সপাসপ মারা হত। বলতে পারেন জ্যান্ত চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রসেস। ব্লাড ভেসেলগুলোকে ফাটিয়ে দেওয়ার আরেক পদ্ধতি। যাতে সহজে চামড়াটা তুলে নেওয়া যায়"।

"মাই গড!"

পবিত্র সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যায়, "ম্যাডাম, এটা স্লটার-হাউজ। চরম ভায়োলেন্সের জায়গা!"

বলতে বলতেই সে সামনের ঘরটায় টর্চের লাইট ফেলল, "দেখুন।" সামনের দিকে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে যায় আহেলির! এ কী বীভৎস দৃশ্য! কতগুলো কালো কালো ছোপ ছোপ, অথচ লম্বা লম্বা খাঁড়ার মতো কিছু ভর্তি সেই ঘরে। সে একটু ভালো করে দেখতেই বুঝতে পারল, বেশ কিছু লম্বা লম্বা শিক, চপার, বিভিন্নরকমের ছুরি, দাঁ-বটি এমনকী তরোয়াল, খাঁড়া– কিছুই বাকি নেই!

পবিত্র আর কোনও কথা না বলে তথাকথিত অস্ত্রাগারে ঢুকে পড়ে। পেছন পেছন আহেলিও।

“ধরুন তো।”

পবিত্র আহেলির হাতে টর্চটা ধরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে গ্লাভস বের করে পরে ফেলল। সে খুব মন দিয়ে নেড়েচেড়ে অস্ত্রগুলো দেখছে। যথারীতি সেগুলো মরচে ধরে একাকার। তার ওপর মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন! তবু নির্বিবাদে ঝুল পরিষ্কার করে, মাকড়সার জাল ছিঁড়েছুঁড়ে, অস্ত্রগুলোকে তুলে নেড়েচেড়ে গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করছে সে। লম্বা শিকগুলো দেখলেই ভয় করে! শুয়োর মারার জন্য ব্যবহৃত হত সম্ভবত। বেশ কয়েকটা ক্যাপটিভ বোল্ট গানও রয়েছে। হতভাগ্য প্রাণীগুলোর কপালে আঘাত করে তাদের মস্তিষ্ককে অসাড় করে দেওয়া হত। প্রাণীগুলো ভয়ে মাথা সরিয়ে নিত হয়তো। দৌড়োদৌড়িও করত। সেজন্য গলার শক্ত মোটা দড়িও উপস্থিত। মোটা মোটা লাঠিও আছে। ওগুলো দিয়ে কি পেটানো হত?

চোখ বুজে ফেলল আহেলি। কী ভয়ঙ্কর! কী বীভৎস। এর চেয়ে এককোপে মাথা উড়িয়ে দিলেই তো হয়। এত যন্ত্রণা দেওয়ার মানে কী! একটা জ্যান্ত প্রাণীকে শিক দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করার মধ্যে কী আনন্দ আছে! একটা অসহায় প্রাণীকে বেল্ট আর লাঠি দিয়ে পেটানোয় কী বীরত্ব!

“কী মনে হয় মিস মুখার্জী?” পবিত্র একটা ছুরি তুলে দেখায়, “এগুলো এখন আর ইউজ হয়? পরীক্ষা করার দরকার আছে?”

আহেলির বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। সে কোনওমতে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ— না!

পবিত্র তবু আঙুল দিয়ে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে। তরোয়াল, খাঁড়া, বঁটি আর চপারগুলোও দেখল। তারপর যেন একটু হতাশ হয়েই বলল, “নাঃ! এগুলো দিয়ে মাথা তো দূর, দাড়ি কাটাও যাবে না।”

“কিছু পেলে?” ওপ্রান্ত থেকে অধিরাজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, ‘এনিথিং সাসপিশাস?”

“কতগুলো ছুরি, চাকু, চপার এটসেট্রা। কোনও সার্জিক্যাল স বা কোনও স’ই নেই। যদিও এগুলোকে এখন যাদুঘরে পাঠানোই উচিত। বত্রিশ বছর ধরে ব্যবহার হয়নি বলেই মনে হয়।”

“মিস মুখার্জী?”

আহেলি অধিরাজের মুখে নিজের নাম শুনে সচকিত হয়ে ওঠে, “ইয়েস?”

“আপনার কী মনে হয়?”

-“এগুলোর একটাও বাবুর মার্ডার ওয়েপন হতে পারে না অফিসার। বহুবছর ধরে এগুলোয় কেউ হাতই দেয়নি! সবচেয়ে বড় কথা অফিসার আচার্য নিজে এগজামিন করেছেন ওগুলোয় বহুবছর ধার পড়েনি।”

- “ধার পড়েনি তার মানে এই নয় যে কখনই পড়বে না।” অধিরাজের নির্দেশ ভেসে এল, “পবিত্র, ওয়েপনগুলোকে পরে অবশ্যই কালেক্ট করবে। যেখানে এরকম একটা মার্ডারার ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে কোনও অস্ত্র রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে ধারালো হোক কী ভোঁতা।”

- “নোটেড বস। কিন্তু সার্জিক্যাল স বা ধার দেওয়ার যন্ত্র এখানে নেই।” পবিত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এগোতে এগোতেই বলে, “সামনেই সিঁড়ি। একতলায় যাচ্ছি।”

“যাও। সম্ভবত কিলিং ফ্লোরে কিছু পেলেও পেতে পারো।”

কিলিং ফ্লোর! শোনামাত্রই হিমশীতল ভয়ের স্রোত বয়ে গেল আহেলির শিরা বেয়ে। যদিও ফরেনসিক ল্যাবে অনেকরকম মৃতদেহ দেখে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এরকম একটা বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে বেশ ভয়ই করছে। ফরেনসিক ল্যাবেও অনেক যন্ত্রপাতি আছে। মরদেহ কাটাকুটি করতেও তার বিশেষ কোনও অনুভূতি হয় না। অথচ যে জায়গায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এখানে জীবন্ত প্রাণীকে কাটা হয়! কয়েক হাজার জন্তু এখানে মারা তো গিয়েছেই, উপরন্তু ন'জন মানুষ...!

“আরে...! মিস মুখার্জী !” -

আহেলি অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ি ভাঙছিল। একটা সিঁড়িতে যেই পা রেখেছে, অমনি স্ল্যাবটা হুড়মুড় করে ভেঙে নীচে পড়ল। আরেকটু হলেই সে ও সটান নীচেই পড়ত। তার আগেই টান মেরে তাকে সরিয়ে নিয়েছে পবিত্র আচার্য! ভয়ের চোটে আহেলির হৃৎপিণ্ড লাফ মেরে উঠল। সে তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, সিঁড়ির স্ল্যাবটা এভাবে ভাঙল।

-“দেখে নামবেন তো! ও সিঁড়িটা আধখানা ঝুলেই ছিল।” নীচু স্বরে মৃদু ধমক দেয় পবিত্র, “কোন দুনিয়ায় থাকেন! আরেকটু হলেই তো...।”

“হোয়াট হ্যাপেন্ড! পবিত্র?”

ওপাশ থেকে অধিরাজের উদ্বিগ্ন স্বর ভেসে এল, “ইজ এভরিথিং ওকে?” “ইয়াহ!” পবিত্র আহেলিকে ইশারায় একদম তার পেছন পেছন আসতে বলে ঘটনাটা চেপে গেল, “কিছু হয়নি।”

“শিওর?”

“একদম।”

অধিরাজ আর কথা বাড়াল না। পবিত্র অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপে নীচের দিকে নামতে থাকে। তার পেছন পেছন পা টিপে টিপে আহেলি। তার হৃৎপিণ্ড তখনও দ্বিগুণ বেগে চলছে। কোনওমতে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে সে।

একতলার মেঝে সাদা টাইলসের। বেশ স্লিপারি। এতক্ষণ দুর্গন্ধ তুলনামূলক কম ছিল। এবার একেবারে ভক করে নাকে এসে লাগল! প্রচণ্ড পচা গন্ধে দু’জনেরই অবস্থা খারাপ। পবিত্র মুখে রুমাল বেঁধে নেয়। আহেলির ফরেনসিক কিট বক্সেই মাস্ক ছিল। এতক্ষণ তবু গন্ধটা সহ্যের মধ্যেই ছিল বলে বের করেনি। এবার বাধ্য হয়েই মাস্কটা পরে নিল। কিন্তু যেটুকু গন্ধ তার নাকে এসেছে, তাতেই বুক দুরুদুরু করে উঠল। ফরেনসিক ল্যাবে কাজ করার দরুণ রক্তের গন্ধ সে চেনে। এখানে বত্রিশ বছর ধরে কোনওরকম রক্তপাত হয়নি। তবে রক্তের গন্ধ আসছে কোথা থেকে!

পবিত্রকে কথাটা বলতেই সে বলল; “আর ইউ শিওর মিস মুখার্জী?” “শিওর শট। রক্তের মধ্যে যে আয়রন থাকে তার স্মেল আমি চোখ বুঁজেও বলে দিতে পারি। এটা ব্লাডেরই স্মেল! এবং ক্রমাগত বাড়ছে।”

“বত্রিশ বছর ধরে ক্লোজড স্লটার-হাউজে রক্তের গন্ধ!” পবিত্র বিড়বিড় করে বলল, “সামথিং ফিশি।” সিঁড়ির ঠিক ডানদিকেই সার সার অন্ধকার ঘর। টর্চের আলোয় দেখা গেল - ঘরগুলো প্রায় জেলখানারই মতো। সাদা টাইলসের মেঝে ও দেওয়াল। তবে সাদা বলে চেনা দুষ্কর। কোথাও টাইলস খসে পড়েছে। কোথাও শ্যাওলা জমে কালো! সামনে

লোহার গরাদ। বাইরে বেশ কিছু লোহার রড সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছে। দু' একটা ঘরে খাঁচার মতো কিছু চোখে পড়ল।

প্রাণীগুলোকে কি খাঁচার মধ্যে রাখা হত!

পবিত্র নীচু স্বরে জানায়, "ভেতরের ঘরগুলোয় জবাই হত। বধ্যভূমি বলতে পারেন। ভেতরে একজন বা দু'জনকে যখন কাটা হচ্ছে, তখন গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে অন্য পশুগুলো রক্তের গন্ধ শুকছে। মানে শুকতে বাধ্য। নিজের জাতভাই বা আত্মীয়ের চিৎকার শুনছে! আর নিজের ভাগ্যও বুঝতে পারছে। ওখানেই অর্ধেক জান খতম! ভয় পেয়ে পালাতেও যাতে না পারে সেজন্য ঐ লোহার রডগুলো আছে। ওখানেই বাঁধা থাকত প্রাণীগুলো। এটাই নিয়ম। সত্যি বলতে কী, শুয়োরের মরণ চিৎকার যদি আপনি কখনও শোনেন, অন্তত সাত-আট রাত ঘুমোতে পারবেন না! অথচ স্লটার-হাউজের কর্মীদের কানে ঐ আওয়াজটাই গানের মতো শ্রুতিমধুর!"

"আমাদের খুনীর মোডাস অপারেন্ডিও সেম!" অধিরাজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "আমি আশ্চর্য হচ্ছি না, সে এরকম একটা কাজের জন্য স্লটার-হাউজকেই বেছেছে! কারণ তার মনস্তত্ত্বের সঙ্গে হুবহু স্লটার-হাউজের পদ্ধতি মিলে যায়! গট ইট মিস মুখার্জী?"

আহেলির মুখ শুকিয়ে গেলেও সে মাথা নাড়ে। বুঝেছে। এই মুহূর্তে সে খুনীকে শাপশাপান্ত করছে! তার নিষ্ঠুরতায় অবাকও হচ্ছে। যেমন প্রাণীগুলো বুঝতে পারত তাদের কপালে কী নাচছে, তেমনই ন'জন বলশালী পুরুষও বুঝতে পেরেছিলেন তাদের নিয়তি কী! যেমন চতুষ্পদগুলোর মাথায় ক্যাপটিভ বোল্ট গানের সাহায্যে আঘাত করে অবশ করে দেওয়া হত, কিংবা মাথায় এক শার্প ব্লোয়ে প্রায় জ্ঞানহীন করে জবাই করা হত, তেমনই প্যাংক্যুরোনিয়ামের সাহায্যে চলৎশক্তিহীন করে দেওয়া হত মানুষগুলোকে। পশুগুলো একে অপরের রক্তের গন্ধ পেত ও চিৎকার শুনত। মানুষগুলো নিজের রক্তেরই গন্ধ পেতেন। আর চিৎকার...!"

"হো-লি শি-ট!"

পবিত্র ডিসপ্লের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। টর্চের আলোয় এখনও সেই জং ধরা কালো হুকগুলো দেখা যাচ্ছে যেগুলোতে উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হত প্রাণীগুলোকে। নীচ

দিয়ে চলে গেছে ড্রেন। সেই কালান্তক ড্রেনেজ সিস্টেম! যেখান দিয়ে নিহতের রক্ত সহজেই বাইরে চলে যেত। কিন্তু এই মুহূর্তে দ্রষ্টব্য বিষয় শুধু হুক বা ড্রেন নয়। তার সঙ্গে আরও কিছু আছে। পবিত্র আচার্যর চোখ বিস্ফারিত। তার মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না! কোথায় সহজাত প্রগলভতা! কোথায় লঘু রসিকতা!

সে শুধু কোনমতে বলল; "গ-ড!"

আহেলির মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। এরকম দৃশ্য দেখতে পাবে সে জীবনে কখনও ভাবেনি! এটা কি পৃথিবীর দৃশ্য, না নরকের! নিজেকে আর সামলাতে পারল না সে। হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলল। হুকগুলো খালি নয়। বরং সার সার কুকুর বিড়ালের মুণ্ডুহীন দেহ উলটো হয়ে ঝুলছে সেখানে! সব মিলিয়ে পনেরোটা!

(১৫)

অধিরাজ নির্লিপ্ত মুখে দৃশ্যটা দেখছিল। রাত সাড়ে তিনটে অবধি ওরা বাইরেই ফাঁদ পেতে বসেছিল। কিন্তু কেউ আসেনি! যার প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে প্রহর গুণছিল, সে আজ দেখা দেয়নি। হয়তো আজ আসবে না। কিংবা টের পেয়ে গিয়েছে যে সি আই ডি হোমিসাইড তাকে স্বাগত জানানোর জন্যই বসে আছে। আসল লোকটি না এলেও তার রোমহর্ষক কাণ্ডকীর্তি দেখে উপস্থিত সকলেই হতবাক। যখন পাকাপাকিভাবে বোঝা গেল যে দুষ্কৃতী আজ আর আসবে না, তখনই আর অপেক্ষা করেনি ওরা। তালা ভেঙে ঢুকে গিয়েছিল স্লটার-হাউজের ভেতরে। পবিত্র'র মুখেই পরিস্থিতি কিছুটা শুনলেও চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখে আরও জোরদার ধাক্কা লাগল। ডিসপ্লেতে অনেকগুলো কুকুর আর বিড়ালের মুণ্ডুহীন দেহ ঝুলছে! সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা, দেহগুলো পূর্ণাঙ্গ কুকুর বা বিড়ালের নয়, বরং কুকুর শাবকের এবং বিড়াল ছানার।

"স্যার, এ লোক সাধারণ খুনী নয়! এর মাথাটা পুরোপুরি গেছে।" অর্ণবের কণ্ঠস্বর একটু কেঁপে যায়, "নয়তো কুকুর ছানা আর বিড়াল ছানাদের এরকম কিলো দরে কেউ মারে! আমার এখন মনে হচ্ছে, ওর কোনও মোটিভই নেই। স্রেফ খুন করার আনন্দে খুন করছে! নয়তো এই ইনোসেন্ট প্রাণীগুলোকে মারার পেছনে কোনও লজিক পাচ্ছেন।"

"লজিক আছে ।"

আহেলি তখনও ট্রমা থেকে বেরোতে পারেনি। তার কপাল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম পড়ছে। কিন্তু কর্তব্যে গাফিলতি নেই। তিন পুরুষ অফিসার কুকুর-বিড়ালের দেহগুলো শিক থেকে খুলে নামিয়ে এনেছিল। আহেলি খুব মন দিয়েই মৃতদেহগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছিল। অধিরাজ লক্ষ্য করল, মেয়েটার হাত কাঁপছে। যখন কথা বলল, তখন গলাও কেঁপে গেল, "লজিক আছে, কিন্তু এরকম ভয়াবহ লজিকের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

অধিরাজের ভুরু প্রশ্নের ভঙ্গিতে একটু উঠে গেল। আহেলি তার দিকে তাকায়, "লোকটা এই প্রাণীগুলোর ওপর সার্জিক্যাল স-এর ধার পরীক্ষা করছিল!"

অর্ণবের মাথায় কে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারল। একটা লোক শুধুমাত্র সার্জিক্যাল স-টা মানুষের গলা কাটার জন্য যথেষ্ট ধারালো হয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য পনেরোটা বিড়াল আর কুকুর শাবককে মেরে ফেলল।

"সম্ভবত সার্জিক্যাল স-টা এখনও যথেষ্ট ধারালো হয়নি।" আহেলি গ্লাভস পরা হাতে একটি মুণ্ডু কাটা বিড়াল শাবকের দেহ তুলে ধরল, "গলার কাছটা দেখুন। সহজে কাটেনি। অন্তত তিনটে ব্লো করার পর মাথাটা কাটা গেছে। তাও স্মুদলি নয়। কাটা অংশটা এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে। আই মিন, রাফ। শুধু এই বডিটা নয়, পনেরোটা বড়িরই এক ইতিহাস। যে বিড়ালের দেহটা দেখছেন, সেটাই লেটেস্ট। বাকিগুলো আরও একটু পুরনো। প্রথম অ্যাটেম্পট এই কুকুরটা।"

আহেলি এবার একটি কুকুর শাবকের দিকে এগিয়ে যায়। যেখান থেকে তার মাথা কাটা হয়েছে সেখানে আঙুল রেখে বলল, "এর মাথা একবার তো দূর, তিনবারেও কাটা যায়নি। দেখুন একফালি চামড়াও ঝুলছে। এত রাফলি কেটেছে যে গলার হাড়, পেশী সব দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। পরপর আরও কয়েকটা প্রাণীর একই ইতিহাস। কিন্তু তারপর প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে। সেকেন্ড ফেজে স্মুদলি না হলেও তুলনামূলক সহজভাবে শিরচ্ছেদ হয়েছে। শেষমেষ এই বিড়ালটা। এর ক্ষেত্রে আরও স্মুদ। দুঃখের বিষয় এখনও সার্জিক্যাল স-টা তেমন ধার পায়নি যে একটা অ্যাটেম্পটেই গলা কাটবে।"

– "আপনি শিওর যে অস্ত্রটা সার্জিক্যাল স'ই! অন্য কিছু নয়?"

"ড্যাম শিওর।" আহেলি জবাব দেয়, "ছুরি বা চপারের কাজ নয়।" অধিরাজ কী বলবে ভেবে পায় না। জীবনে এরকম নৃশংস কাণ্ড দেখেনি সে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল। এটা 'সার্জিক্যাল স' কিলারেরই কাজ। বাবুর ক্ষেত্রে 'সার্জিক্যাল স' এর দেখা মেলেনি কারণ অস্ত্রটা পুরোপুরি খুন করার জন্য প্রস্তুত হয়নি। খুনীকে বাধ্য হয়েই ছুরির শরণাপন্ন হতে হয়েছে। ঠিক ঐ একই কারণে বাবুর মাথাটা অক্ষত রয়েছে।

"সার্জিক্যাল স'টা পেয়েছ তোমরা?"

"নাঃ।" পবিত্র মাথা নাড়ে, "তবে আরও কিছু পেয়েছি। এসো দেখাচ্ছি।"

ডিসপ্লে জোনের ঠিক পাশেই একটা ছোট ঘর। ঘরটার প্রায় আধখানা জুড়ে একটা প্রাচীন শ্বেতপাথরের টেবিল! টেবিলের ঠিক উল্টোদিকেই দেওয়াল ঘেঁষে কাচের শোকেস। এই ঘরটার অবস্থা অবশ্য তুলনামূলক ভালো। অন্তত এইটুকু বোঝা যায় যে কেউ এটাকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য পরিষ্কার করে রেখেছে। কিন্তু টেবিলের ওপর যা আছে তা অবিশ্বাস্য। ডাক্তারি শাস্ত্রে যতরকম ছুরি আর স' ব্যবহার করা হয়, সব ঝকঝক করছে টেবিলের ওপরে। তার পাশেই ধার দেওয়ার যন্ত্র! নাইফ অ্যান্ড টুল শার্পনার।

টেবিলের একদিকে একটা মাঝারি স্ক্রিনের ব্যাটারি চালিত টিভি ও ডিভিডি প্লেয়ার! প্রচুর ডিভিডি। সবই কার্টুনের- টম অ্যান্ড জেরি! উল্টোদিকে আবার একটা জরাজীর্ণ স্প্রিং বের করা সোফা!

"রীতিমতো মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা আছে দেখছি। প্রভু সোফার বসে অস্ত্রে শান দিতে দিতে টম অ্যান্ড জেরি দেখতেন!" অধিরাজ হতাশভাবে মাথা নাড়ল, "তার মানে তাঁকে যদি আমরা হাতের কাছেও পাই, তাঁর ঘরে টম অ্যান্ড জেরির ডিভিডি পাওয়া যাবে না। ডিডাকশনটা মাঠে মারা গেল দেখছি।"

-"কিন্তু তোমার ডিডাকশন মোক্ষম ছিল স্বীকার করছি!" পবিত্র বলল, "আমি প্রথমে টম অ্যান্ড জেরির কেসটা বিশ্বাসই করিনি।"

—"মোক্ষম হলেও মিস হল পবিত্র।" বলতে বলতেই সে ফিরে তাকাল শোকেসের দিকে। আলমারিতে কিছুই নেই! একদম শূন্যগর্ভ! শুধু কতগুলো গুঁড়ো, কোনও শো পিসের এক-দু টুকরো পড়ে রয়েছে। সে আপনমনেই বিড়বিড় করে, "শোকেসে কী ছিল? নিশ্চয়ই কিছু ছিল। সরিয়ে নিয়েছে নির্ঘাৎ। কিন্তু সরানোর দরকার পড়ল কেন! সে কী জানত যে আমরা আসব!"

"হতে পারে রাজা। এ মার্ডারারের কীর্তিকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, এ পাবলিক সবই পারে।"

"ফাইন। শোকেসটাকে ল্যাবে পাঠিয়ে দাও। এখন ডক 'উজরে চমনের' মগজাস্ত্রর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।" সে আহেলির দিকে ফিরল, "মিস মুখার্জী সব ওয়েপনগুলো টেস্ট করে দেখেছেন?"

অধিরাজের পেছন পেছন বাকিরাও এসে দাঁড়িয়েছে। আহেলি মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, "প্রাথমিকভাবে, ল্যুমিনল টেস্ট করে দেখেছি। ব্লাড ট্রেস আছে। তবে কোনওরকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। এই ছুরিগুলো কিন্তু মারাত্মক ধারালো। সম্ভবত নতুন কেনা হয়েছে।"

—"ওকে।" অধিরাজ ওদের দু'জনের দিকেই তাকায়, "পবিত্র আর অর্ণব, তোমরা গোটা স্লটার-হাউজে যত ওয়েপন আছে বাজেয়াপ্ত করো। ধারালো, ভোঁতা, ধুলোয় ঢাকা, চকচকে সব ওয়েপনই, নাইফ অ্যান্ড টুল শার্পনার সমেত সিল করে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দাও। এই বডিগুলোও পাঠানোর বন্দোবস্ত করো। ডঃ চ্যাটার্জী যদি কিছু লিড খুঁজে বের করতে পারেন। আর এই স্লটার-হাউজটা ক্রাইম স্পট হিসাবে সিল করে চতুর্দিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দাও। লোকটাকে না পেলেও অন্তত এই গেমটা আমাদের।"

অর্ণব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। অধিরাজ আত্মমগ্নভাবে বলে, "লোকটা টম অ্যান্ড জেরি খেলতে চাইছিল না? ফাইন, সেটাই খেলব। টম জেরির গর্তে ডিনামাইট ঢুকিয়ে দিত মনে আছে? আমরাও ওর গর্ত সিল করে দিচ্ছি। ওর এতদিনের বেস অব অপারেশনসে ও আর ঢুকতে পারবে না। সার্জিক্যাল স' পাইনি তো কী হয়েছে! ধার দেওয়ার যন্ত্রটা এই মুহূর্তে আমাদের হেফাজতে। আশা করছি, ওর কাছে আর নাইফ অ্যান্ড টুল শার্পনার নেই। আর অ্যাকর্ডিং টু মিস মুখার্জী। সার্জিক্যাল স এখনও যথেষ্ট শার্প হয়নি। ওদিকে নিজেই আবার কাউন্টডাউন শুরু করেছে। ওর হাতেও খুব বেশি সময় নেই।"

"তাতে কী? ও নতুন সার্জিক্যাল স কিনতে পারে না? অথবা শার্পনার?"

অধিরাজ মিটিমিটি হাসে, "অবশ্যই কিনতে পারে। আমিও তো তাই চাইছি। শহরের সব সার্জিকাল ইন্সট্রুমেন্টের শপগুলোকে চেতিয়ে দাও। সেখানে যদি কেউ বা কারা সার্জিক্যাল স কিনতে আসে, তবে যেন আমরা সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি। ধাতুতে শান দেওয়ার যন্ত্র আগে পথে ঘাটে পাওয়া যেত। এখন পাওয়া যায় না। তার জন্য আলাদা দোকান আছে। সেখানেও চব্বিশ – ঘণ্টা লোক বসিয়ে দাও। আমার ধারণা লোকটা যেরকম ডেসপারেট, তাতে আরেকটা নতুন স বা শার্পনার কিনতে যাবেই। ফুল চান্স

আছে হসপিটাল থেকেও চুরি করার। সমস্ত হসপিটালকে অ্যালার্ট করে দাও। তারা যেন নিজেদের সার্জিক্যাল স, নাইফ ইত্যাদি খুব সাবধানে রাখে। আর চুরি গেলেই যেন পুলিসকে ইনফর্ম করে। যতটা বজ্র আঁটুনি দেওয়া যায়, ততটাই দাও। লোকটা চাপে পড়ে কিছু না কিছু ভুল করবেই।"

"কিন্তু লোকটা আসলে কে রাজা?" পবিত্র বলল, "আমি সিরিয়াসলি এই লোকটাকে দেখতে চাই।"

"সময় এলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।" অধিরাজের কপালে চিন্তার ছাপ, "কিন্তু আমাকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে চারটে লোক।"

- "না। সবাই সাসপেক্ট নয়। তিনজন সাসপেক্ট এবং এক মিসিং লিঙ্ক।" "সুকোমল পান্ডে?"

"সুকোমল পান্ডের থেকেও রহস্যময় স্বয়ং শিশির সেন। তবে ও দু'জনকে নিয়ে পরে ভাবব। আপাতত আমার মাথায় দুটো নামই বেশি ঘুরছে। বেবো ব্রিগ্যানজা ও শেয়াল পন্ডিত।"

পবিত্র'র মুখ দেখেই বোঝা গেল যে সে কিছুই বোঝেনি। এতক্ষণে আত্রেয়ী দত্ত মুখ খুলল, "শেয়াল পন্ডিত মানে সুমঙ্গল পন্ডিত কি স্যার?"

"গুড!" প্রশংসাসূচকভাবে মাথা ঝাঁকাল অধিরাজ, "ভেরি গুড কোয়েশ্চেন মিস...?"

পাশ থেকে অর্ণব প্রায় তোতাপাখির মতোই বলল, "আত্রেয়ী দত্ত।"

"রাইট! মিস দত্ত। শেয়াল পন্ডিতই সুমঙ্গল পন্ডিত কি না এখনও জানা নেই। কিন্তু সম্ভাবনা আছে। অলরেডি অর্ণব খবরিদের আপডেট দিয়েছে। আপনিও দিয়ে দিন। এবার সুমঙ্গল পন্ডিত নয় 'শেয়াল পন্ডিত'-এর খবর চাইবেন। আর পবিত্র...।"

পবিত্র তখন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে ফোন করে ইনফর্ম করে দিয়েছে। অধিরাজের ডাক শুনে ফোনটা কেটে দিয়ে বলল, "বলো।"

"এই বেবো ব্রিগ্যানজাকে যে করেই হোক খুঁজে বের করো। ড্রাগ স্মাগলার যখন, তখন ড্রাগ স্মাগলিং র‍্যাকেটের মধ্যেই কোথাও আছে। সবক'টা ড্রাগ পেডলার, স্মাগলারকে

হাজতে ভরে ভালোভাবে খাতির করো। কেউ না কেউ বেবোকে চিনবেই, এবং তার ঘাঁটিটাও জানবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেবোকে বের করো। হাতে খুব বেশি সময় নেই।” পবিত্র ইতিবাচক মাথা ঝাঁকায়, “কাল থেকে লেগে পড়ছি মামা! বেবো, লোলো সবাইকেই খুঁজে বের করব।”

- “মিস দত্ত, আপনার জন্য আরও একটি জরুরি মিশন আছে। আপনাকে সুকোমল পান্ডেকে একটু কায়দা করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। অর্ণব, প্লিজ এক্সপ্লেইন।”

আত্রেয়ী কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। অর্ণব তাকে সমস্তটাই বুঝিয়ে বলে। আত্রেয়ী গোটা ব্যাপারটাই হৃদয়ঙ্গম করে বলল, “ওকে স্যার। কাল থেকেই তবে ফিল্ডিং স্টার্ট করি?”

“পজিটিভলি।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফরেনসিকের লোকেরা এসে পড়ল। দেখা গেল ডঃ চ্যাটার্জী ধৈর্য ধরতে না পেরে মাঙ্কি ক্যাপ, মাফলার, সোয়েটার চাপিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। বুড়ো যে প্রচণ্ড টেনশনে আছে তা তাঁর মুখ-চোখের অবস্থাতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অধিরাজকে দেখেই উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, “তুমি ঠিক আছ তো?”

— “এখনও পর্যন্ত। তবে আপনার জন্য একটি শোকেস, একশোর ওপর নতুন-পুরনো অস্ত্র, এবং পনেরোটি মৃতদেহ আছে। প্লিজ, কালেক্ট করে নিন।”

মাঙ্কিক্যাপের মধ্যেই বুড়োর ভুরু ফের জড়ো হয়ে পাকিয়ে উঠেছে, “মানেটা কী! কেস শুরু হতে না হতেই একটা লাশ এসে হাজির! তার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ফের পনেরোটা! তোমরা কি জালিয়ানওয়ালাবাগ জালিয়ানওয়ালাবাগ খেলছ! এমনিতেই শীতে কাঁপছি, তার ওপর আমার দুশো ছ'টা বুড়ো হাড় না কাঁপালে তোমার হচ্ছে না? আর শোকেস আর গাদাগুচ্ছের ওয়েপন নিয়ে কী করব?”

– “ফরেনসিক ল্যাবে সাজিয়ে রাখবেন।” অধিরাজ মুচকি মুচকি হাসছে, “তবে কে বলতে পারে! আপনি যেরকম মিস কাটামুণ্ডুকে দেখে উলটে পড়েছেন, তাতে খাঁড়া আর তরোয়াল উচিয়ে খিলজি ডান্সও করতে পারেন, “খলিবলি হো গয়া হ্যায় দিল, হাবিবি-ই-ই-ই!”

- "কার বিবি? উনি আনম্যারেড মহিলা! আর তুমি তাঁকে কার না কার বিবি বানিয়ে দিচ্ছ! লজ্জা করে না!"

অধিরাজ ডঃ চ্যাটার্জীর ভাষা জ্ঞানে মোহিত! ফিচেল হেসে বললে, "ওখানে তো আবার রণবীরের বিবি, আই মিন দীপিকাও আছেন! মিস কাটামুণ্ডু আর দীপিকার জন্য তো ডাবল ডান্স বনতা হ্যায়।"

- "ডান্স!" তিনি গরগর করে উঠলেন, "শোনো ছোঁড়া, চান্স পেলে ঐ ওয়েপন দিয়ে তোমার মুণ্ডু আমিই কাটব। ওঁর নাম মোটেই কাটামুণ্ডু -

– "আই নো।" অধিরাজ তাঁকে থামিয়ে দেয়, "আপাতত এভিডেন্সগুলো স্বচক্ষে দেখবেন প্লিজ?"

-"হ্যাঁ। তার আগে ঐ হতভাগ্যের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা তোমায় জানিয়ে দিই।" ডঃ চ্যাটার্জী হাতে গ্লাভস পরে এগোতে এগোতেই বললেন, "লোকটাকে মারতে বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। একটা ব্লোয়েই কাজ শেষ করেছে। ছুরিটা 'শেফস নাইফ' হওয়ার চান্সই বেশি। উন্ড ছ'ইঞ্চি লম্বা! দেড় ইঞ্চি চওড়া। তোমার খুনী রীতিমতো এক্সপার্ট রাজা। ও জানে কোথায় ছুরিটা বসালে শিকার ডেফিনিটলি মরবেই। এ পাবলিকের ডাক্তারি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে আশ্চর্য হব না! আহেলি যে ক্লু'টা বের করেছে সেটা ছাড়া খুনী আর কোনও ট্রেস ছাড়েনি। নো ফিঙ্গারপ্রিন্ট, নাথিং। পুরো ক্লিয়ার। তবে সার্জিক্যাল স ব্যবহৃত না হলেও বাবুর রক্তে প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম আছে। ড্রাগটা সেম।" -

"তার মানে প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের আবির্ভাব ফের হল! এনি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট?"

- "এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে শকিং!" ডঃ চ্যাটার্জী একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "নো সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট! খুনী শুধু খুন করেছে। লোকটাকে ছুঁয়েও দেখেনি!"

অধিরাজ ভেতরে ভেতরে বিস্মিত হলেও বাইরে প্রকাশ করল না। মৃদু স্বরে বলল, "ঠিক আছে। আসুন।"

ফরেনসিক এক্সপার্ট প্রথমে স্লটার-হাউজের অবস্থাটা একঝলক দেখলেন। তারপর আহেলির কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট নিলেন। জুনিয়রের কৃতিত্বে কতটা খুশি হলেন তা বোঝা গেল না, তবে সে বেচারির অবস্থা দেখে এক রামধমক দিয়ে উঠলেন, "কী আশ্চর্য! অমন

সেলফিশ জেলিফিশের মতো কাঁপছ কেন! আর তো কেউ কাঁপছে না! তুমি তো আমায় ডোবাবে দেখছি!”

আহেলি মিনমিন করে কিছু একটা বলল। কিন্তু কিছুই ঠিকমতো শোনা গেল না। ডঃ চ্যাটার্জী নিমপাতা খাওয়া মুখ করেছেন, “আরে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না কেন! মানছি, দৃশ্যটা খুব সুন্দর নয়। কিন্তু স্লটার-হাউজে কী এক্সপেক্ট করেছিলে? মোঘল গার্ডেন? হুঃ!”

আহেলির ওপর আরও একচোট তর্জন গর্জন করে ডঃ চ্যাটার্জী শেষমেষ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পুরনো অস্ত্র, নতুন অস্ত্রের সেট দেখে শুধু হুম আর হাম করে গেলেন। মৃতদেহগুলোও দেখলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। ডিভিডি প্লেয়ার আর টিভি পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন, “অ্যাজ ইউজুয়াল ! ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই।” তারপর শোকেসটা নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে হাতড়ে হাতড়ে দেখছেন, যেন পারলে ভেতরেই ঢুকে যাবেন। আত্রেয়ী দত্ত, ডঃ চ্যাটার্জীকে এই প্রথম দেখছে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাণ্ড দেখে একটু অবাকই হয়েছে। সে ফিসফিস করে অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করে, “উনি কি ভীষণ রাগী?”

না!” অর্ণবও চাপা স্বরে জানায়, “সবসময় রাগেন না। মাঝেমধ্যে হাসেনও। তাই না স্যার?”

অধিরাজের শান্ত উত্তর, “সে হাসি রাগের চেয়েও ভয়ঙ্কর! অবিকল বুলডগের দাঁত খিঁচুনির মতো!”

আত্রেয়ী হেসে ফেলল। ডঃ চ্যাটার্জী তখনও একমনে কী যেন দেখে যাচ্ছেন। এক টুকরো হাড়ের মতো কী যেন বের করে এনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দড়াম করে প্রশ্ন করলেন; “তোমাদের সবার মুণ্ডু যথাস্থানে আছে তো? মাথা এদিক ওদিক ঘোরাতে বা মা কালীর মতো অ্যা-অ্যা করে জিভ বের করতে পারছ?”

এরকম বিটকেল প্রশ্নের অর্থ কী! অফিসাররা সব পরস্পরের দিকে তাকায়। পবিত্র আস্তে আস্তে বলে, “স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেল নাকি?”

অধিরাজ তার দিকে তীর্যকদৃষ্টিতে তাকায়, “স্ক্রু আছে বলছ?”

এবার পবিত্র, অর্ণব এবং আত্রেয়ীও হেসে ফেলেছে। ডঃ চ্যাটার্জী তীর্যক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "যাক, হাসি যখন পাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে এটা তোমাদের কারোর নয়!"

একটা সরু ছোট্ট হাড় হাতের তালুর ওপর রেখে এগিয়ে ধরলেন তিনি; "রাজা, তোমার স্লটার-হাউজের আইডিয়াটা মারাত্মক ছিল। বত্রিশ বছর ধরে পুলিস যা খুঁজে পায়নি, তা তুমি আরেকটু হলেই খুঁজে বের করে ফেলছিলে।"

অধিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকায়। এখন ভদ্রলোকের মুখে অল্প হাসি ভেসে উঠল। আত্রেয়ী বুঝল, অধিরাজ একটুও অত্যুক্তি করেনি। বুলডগই বটে!

-"এটা দেখো। এটাকে বলে টেম্পোরারি স্টাইলয়েড প্রোসেস। এই হাড়ের টুকরোটা ঠিক কানের নীচে থাকে। বেশি হাবিজাবিতে যাচ্ছি না। এককথায় এই হাড়ের টুকরোটা টেম্পোরাল বোনের ইনফিরিয়র সারফেসকে কন্ট্রোল করে। এটা মানুষের স্কালের টুকরোই বটে। খুনী তাড়াহুড়োয় খুলিগুলো সরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই হাড়টা এতটাই ছোট যে লক্ষ্যও করেনি। অতএব যে মাথাগুলো বত্রিশ বছর ধরে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেগুলো আগে এখানেই ছিল।"

- "এতটা শিওর কী করে হলেন?"

"এখানে এসে দেখো।" তিনি হাত বাড়িয়ে অধিরাজকে ডাকলেন। সে এগিয়ে গেল। তিনি শোকেসের তাকে টর্চের আলো ফেলে দেখান, "ঐ দেখো। আলমারির তাকটা দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"দেখো, তাকে একটা গোলাপি রঙের কাগজ পাতা আছে।" অধিরাজ কিছুই বুঝতে না পেরে ডঃ চ্যাটার্জীর মুখের দিকে তাকায়। এতকিছু থাকতে তিনি তাকে কাগজ দেখাচ্ছেন কেন! কিন্তু সেটা জিজ্ঞাসা - করার আগেই ভদ্রলোক প্রায় খিঁচিয়েই উঠলেন, "আমার মুখটা কি গোলাপি রঙের কাগজ, না আমি ভার্মিলিয়ন রেড লিপস্টিক মেখেছি যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছ! যেদিকে তাকাতে বলছি সেদিকেই তাকাও।"

হাঁ ধমক খেয়ে অধিরাজ অবিকল নিরীহ ছেলেমানুষের মতো মুখ করে কাগজের দিকে তাকায়। কাগজের ওপরে গাঢ় বাদামি রঙের উদ্ভট ধরনের একটু লম্বাটে দাগ! তার ভুরু কুঁচকে যায়। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, মোট ন'টা এরকম উদ্ভট ছাপ আছে গোটা কাগজে।

"ক'টা দাগ দেখতে পাচ্ছ?"

"নটা! ইউ মিন...!" রুদ্ধশ্বাসে বলে সে, "এগুলো...!"

"স্কালের দাগ। মানুষেরই স্কাল। জ' স্ট্রাকচারের ছাপটাই সচরাচর পড়ে। আমার ল্যাবে এমন প্রচুর স্কাল পড়ে থাকে বলে ছাপটা আমি চিনি। এইখানেই খুনী রেখেছিল মৃত লোকগুলোর কাটা মাথা, যেগুলো পরে স্কাল হয়ে গিয়ে এরকম ছাপ ফেলেছে।" ডঃ চ্যাটার্জী আবার হাসলেন, "ব্রেভো! আরেকটু হলেই জ্যাকপট মেরে দিচ্ছিলে তুমি! খুনী নেহাৎ সরিয়ে ফেলেছে।" অধিরাজের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ, "ঐটাই তো সমস্যা ডক! খুনী ঠিক আমরা আসার আগেই সরিয়ে ফেলল কী করে! অন্যান্য দিন এখানে কেউ এসে ওয়েপনগুলোয় ধার দেয়। অথচ আজ সে এল না কেন? এর একটাই সহজ উত্তর...!"

অর্ণব দেখল অধিরাজের চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে, "সে আমাদের ফলো করছে অর্ণব। আমরা প্রতি মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, সব জানে সে! যে কোনওভাবেই হোক বুঝতে পেরেছে, আমরা স্লটার-হাউজেই আসব। তাই সার্জিক্যাল স আর খুলিগুলো সরিয়ে ফেলেছে। অথচ আজ আমি পুরোপুরি অ্যালার্ট ছিলাম। বারবার চেক করেছি; কেউ ফলো করছে কি না। কিন্তু কিচ্ছু টের পাইনি! লোকটা ঠিক কীভাবে ফলো করল! কীভাবে বুঝতে পারল! আশ্চর্য!"

ভাবতেই অর্ণবের মনে অদ্ভুত আতঙ্ক ছায়া ফেলল। অর্ণব চোখ বুজে ভাবার চেষ্টা করল কোনও সন্দেহজনক মানুষ বারবার তার চোখে পড়েছে
কি না!

"ডক, এই কুকুর বিড়ালের কেসটা দেখে আমি একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাচ্ছি।" অধিরাজের চোখ দুটোয় গভীর আত্মমগ্নতা, "এ পাবলিক – কিছু করার আগে ভালো

করে ট্রায়াল দিয়ে নেয়। এমন নয়তো, প্রথম পাঁচটা খুন আসলে তার মূল উদ্দেশ্যই নয়? ওগুলোও ট্রায়াল! যেহেতু ভিকটিমরা ম্যানলি ছিলেন, এবং সে হয়তো সমকামী; তাই নিজেকে সামলাতে না পেরে রেপ করেছে। কিন্তু আসলে ওগুলো র‍্যান্ডম ট্রায়াল।"

"তুমি বলতে চাইছ একটা লোক শ্রেফ সার্জিক্যাল সটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না দেখার জন্য পাঁচ পাঁচটা খুন করে ফেলল!" ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ ব্রহ্মতালুতে, "এতখানি ক্রুয়েল!"

–"যে লোক সার্জিক্যাল স'এ যথেষ্ট ধার হয়েছে কিনা দেখার জন্য পনেরোটা নিষ্পাপ কুকুরছানা আর বিড়ালছানাকে মারতে পারে; তাকে আপনার লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প মনে হচ্ছে ডক?" অধিরাজ একটু চিন্তা করল, "এখন আর সেই পাঁচটা লাশ পাওয়া যাবে না। কিন্তু পুরনো ছবিগুলো আছে। দরকার পড়লে ছবিগুলোকে কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে, জুম করে খুঁটিয়ে দেখুন। দেখুন প্রথম পাঁচটা লাশের সঙ্গে পরের চারটে লাশের কোনওরকম পার্থক্য আছে কি না। এটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট।"

. "ফাইন। আজ রাতে তবে আর বাড়ি ফিরছি না। পুরনো এভিডেন্সগুলো সম্ভবত এক্সিবিট হিসাবে পুলিসের কাছে আছে। সেগুলো এখনই ল্যাবে পাঠাতে বলছি। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখি। যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়।"

"খুঁজুন ডক। যত তাড়াতাড়ি পারেন খুঁজুন। এই খুনী একদমই সময় দেওয়ার লোক নয়। এখন বুঝতে পারছি যে কোনও দিক দিয়ে, যে কোনও মুহূর্তে তার আক্রমণ আসতে পারে। অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয়ভাবে মাত দেওয়াটাই তার স্টাইল।"

– "কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তার অন্তত একটা রহস্যভেদ করেছি। তার দুর্গ আমাদের কবজায়। ওয়ান উইকেট ডাউন।"

অধিরাজ পবিত্র'র কথা শুনে তার দিকে তাকাল। তার চোখে যেন কুয়াশা জমছে, "ওয়ান উইকেট ডাউন ঠিকই, কিন্তু এর একটা পালটা আঘাত আসবে পবিত্র। ...আমি নিশ্চিত আমাদের 'জেরি' শোধ তোলার রাস্তা খুজছে। তার ঘাঁটি আমরা দখল করেছি ঠিকই, কিন্তু এত বড় ডিফিট সে সহজে মেনে নেবে না...।"

সে আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই মোবাইল ফোনে 'দেশ' রাগের রিংটোন বেজে উঠল। অধিরাজ ডিসপ্লে'র দিকে তাকিয়ে একটু অবাক। ডিসপ্লেতে শো করছে, 'হোম।'

"বাড়ির ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন আসছে!" সে বিস্মিত হয়ে অর্ণবের দিকে তাকায়, "আমরা সবাই তো এখানে। তবে বাড়ি থেকে ফোন কে করছে?"

"সিকিউরিটি গার্ড বা আপনার কুক নয়তো?"

"না অর্ণব। তাদের সবার মোবাইল আছে। কেউ ফোন করলে মোবাইলে করবে। আর হিস্টোর এতক্ষণে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা। সে খামোখা ফোন করতে যাবে কেন?"

"তবে?"

"কিউরিঅ-সার অ্যান্ড কিউরিঅ-সার!"

বলতে বলতেই অব্যক্ত সন্দেহে ফোনটা লাউডস্পিকারে দিয়ে বলল অধিরাজ, "হ্যালো?"

ও প্রান্ত প্রথমে নীরব। অধিরাজ আবার বলল, "হ্যালো! হু ইজ দিস?" এবার ওদিক থেকে একটা অদ্ভুত হাসির শব্দ ভেসে এল। কে যেন ভারী ফিচেল ভঙ্গিতে খিঁক খিঁক করে হেসেই চলেছে। সে হাসি থামার নয়। অবিকল উন্মাদের মতো খলখল শব্দে হাসছে ওপ্রান্তের কণ্ঠস্বর। হাসিটা শুনেই অর্ণবের মাথা থেকে পা অবধি যেন কয়েকশো ভোল্টের বিদ্যুৎ ঝটকা মেরে গেল। এ হাসি কি কোনও স্বাভাবিক মানুষের! অধিরাজ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফোনের লাইনটা কেটে দেয়। পরক্ষণেই পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, "শি-ট! শি-ট!" বলতে বলতেই পাগলের মতো দৌড়ে গেল নিজের গাড়ির দিকে। অর্ণবও দৌড়ল পিছন পিছন। এমনকী ডঃ চ্যাটার্জীও অত বড়সড় বপু নিয়ে ছুটে গেলেন সেদিকেই।

"সিটবেল্ট বেঁধে নাও অর্ণব!"

অধিরাজ একলাফে ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল। অর্ণব আর দ্বিরুক্তি না করে তাড়াতাড়ি সিটবেল্ট বেঁধে নেয়। সে জানে, সিটবেল্ট বেঁধে নেওয়ার নির্দেশের অর্থ এবার ট্র্যাফিক গোল্লায় গেল। সিগন্যালের নিকুচি করেছে। অধিরাজ আর একটিও কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। পরক্ষণেই তীরবেগে ছুটতে শুরু করল গাড়ি। একটা বাম্পারে

ধাক্কা খেয়ে প্রবল লাফিয়ে ওঠায় ডঃ চ্যাটার্জীর টাকটা অল্প ঠুকে গেল গাড়ির ছাতে। অথচ ভদ্রলোক টু শব্দটিও করলেন না। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন পরের দৃশ্যটার জন্য। অর্ণবের মনে হল, তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড নয়, কেউ একটা জেনারেটর ফিট করে দিয়েছে। যেভাবে ধপধপিয়ে চলছে, তাতে শিরাগুলো না প্রবল রক্তচাপে ফেটে যায়। সে এখনও সেই ভয়ঙ্কর হাসিটা ভুলতে পারছে না! শীতল, অথচ কী নিষ্ঠুর। ও কি মানুষের হাসি! অধিরাজের চোয়াল বজ্রকঠিন। ক্রমাগত স্পিড বাড়াচ্ছে।

"রাজা, আমরা আসছি।" -

তার হেডসেট কড়কড় করে ওঠে। অফিসার পবিত্র আচার্য'র কণ্ঠস্বর। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রবল আফসোসে বলল অধিরাজ, "ভুল হয়ে গেল পবিত্র! বিরাট ভুল হল...!"

পবিত্র তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে আর কোনও কথা বাড়ায় না। অর্ণব উইং মিররের দিকে তাকিয়ে দেখল পবিত্রদের গাড়িটাও সমান স্পিডে ঠিক তাদের পেছন পেছনই আসছে।

রাতের ফাঁকা রাস্তা ধরে দু' দুটো গাড়ি প্রায় আলোর গতিবেগে ছুটে চলেছে। অথচ কোনও শব্দ নেই! সবাই যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। গাড়ির ভেতরে অখণ্ড নিস্তব্ধতা! ডিপারের আলো রাস্তার ওপর পড়েই সরে যাচ্ছে। বাইপাসের শুনশান পথই শুধু সি আই ডি টিমের উদ্বেগের আঁচ পেল। অধিরাজ একেবারে অপ্রতিরোধ্য গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। কোনও বাম্পার, স্পিড ব্রেকারই আজ তাকে থামাতে পারবে না। আতঙ্কে, উদ্বেগে দরদর করে ঘামছে সে।

অধিরাজের বাড়ির সামনে কিন্তু তেমন কোনও উত্তেজনা নেই। অধিরাজের দেহরক্ষীরা বাইরে তখনও সজাগ হয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের হাবভাবে কোনওরকম দুর্ঘটনার আভাস টের পাওয়া গেল না। বরং অধিরাজের গাড়ি দেখেই তারা দরজা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"রাজা, এখানে কিছু হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না!" ডঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণে এই প্রথম মুখ খুললেন, "কেউ তোমার সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করেনি তো?" অধিরাজ কোনও উত্তর না দিয়ে প্রায় লাফ মেরেই নামল গাড়ি থেকে। একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে দৌড়ল বাড়ির দিকে। আশ্চর্য! বাড়ির মূল দরজা খোলা ! একটা অব্যক্ত আশঙ্কা অর্ণবের মনের ভেতরে আঁচড়

কাটছে। যতদূর মনে পড়ছে, আহেলিকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজা লক করেই গিয়েছিল ওরা। তবে খুলল কে! দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা বিরাট হলঘর। অধিরাজের বাবা ওটাকে বলেন, 'বৈঠকখানা'। তিনি পেশায় নামজাদা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তাঁর নিজস্ব ফার্ম আছে। এই ঘরটা বিশেষ করে তাঁর ক্লায়েন্ট মিটিঙের জন্যই। অধিরাজের দর্শনার্থীদের জন্যও বটে।

কিন্তু আজ কোনও ক্লায়েন্ট বা দর্শনার্থী এ ঘরে অপেক্ষা করছিল না! অধিরাজ তথাকথিত 'বৈঠকখানা'র আলো জ্বালাতেই অপেক্ষারত ব্যক্তিকে চোখে পড়ল। দৃশ্যটা দেখে অর্ণবের হাত-পা অবশ হয়ে আসে। পবিত্র'র চোখদুটো বুঝি ফেটে বেরিয়ে যাবে! মিস আত্রেয়ী দত্ত নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারছে না! ডঃ চ্যাটার্জী কোনওমতে উচ্চারণ করলেন, হোয়াট দ্য হেল...!"

পুরো বাক্যটা উচ্চারণের আগেই একটা ভয়ার্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার! পরক্ষণেই আহেলি মুখার্জী সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে হুড়মুড় করে উলটে পড়ল অধিরাজের ঘাড়ে। অধিরাজ তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে না ফেললে মেয়েটা সপাটে মেঝেতেই পড়ত। এতক্ষণ স্নায়ুর ওপরে অনেক চাপ সহ্য করেছে। আর নিতে পারল না।

বৈঠকখানার কার্পেটের ওপর সাজানো রয়েছে পনেরোটা কুকুর বিড়ালের কাটা মাথা। অর্থাৎ ছিন্নশির কবন্ধের মুণ্ডুগুলো। ঠিক তার মাঝখানেই পড়ে রয়েছে একজনের নগ্ন লাশ! বুকের ওপর মারাত্মক ক্ষত। সেখান থেকে এখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দামি কার্পেট লাল হয়ে গিয়েছে রক্তে! লাশের বুকের ওপর একই স্টাইলে ছুরি দিয়ে চামড়া মাংস কেটে লেখা আছে, 'নয়'।

লোকটার নাম শ্যামল। অধিরাজের সিকিউরিটি গার্ড।

(১৬)

“আমার সিকিউরিটি লাগবে না।" অসম্ভব হিমশীতল কণ্ঠে বলল অধিরাজ, “তোমরা সবাই চলে যাও।” ঘটনার প্রায় দু ঘণ্টা পরে এই প্রথম কথা বলল সে। শ্যামলের মৃতদেহটা দেখে বেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়েছিল। তারপর কেমন যেন বাহ্য জ্ঞানশূন্য মানুষের মতো ধপ করে বসে পড়েছিল সোফায়। ডঃ চ্যাটার্জী লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি ডাকলেন। গাড়ি এসে শ্যামলের মৃতদেহ নিয়েও চলে গেল! সঙ্গে পনেরোটা প্রাণীর মাথাও গেল ফরেনসিক ল্যাবে। বেহুঁশ আহেলিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আত্রেয়ী দত্ত। বেশ কিছুক্ষণ চোখে মুখে জল ছেটানোর পর তার জ্ঞানও ফিরল। পাংশু মুখে সে ডঃ চ্যাটার্জীর আরেক চোট ধমক খাওয়ার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জী তাকে কোনও কড়া কথাই বললেন না। উলটে একটু উদ্বিগ্নভাবেই একটা জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। সস্নেহে জানতে চাইলেন, “এখন সুস্থ বোধ করছ?”

অন্যদিকে পবিত্র অন্যান্য রক্ষীদের নিয়ে পড়েছে। রীতিমতো রাগে ফেটে পড়ে জানতে চাইল, “তোমাদের চোখের সামনে তোমাদেরই এক সঙ্গীকে খুন করে দিয়ে চলে গেল একটা লোক, আর তোমরা কিছুই জানতে পারলে না! এটা কী করে সম্ভব! ডিউটি করছিলে, না নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?” সিকিউরিটি গার্ডরা কী বলবে বুঝতে পারছে না! কোনওমতে জানাল, শ্যামল তাদের সঙ্গে ডিউটিতেই ছিল। হঠাৎ বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে দেখে সে সন্দেহ প্রকাশ করে। যদিও ব্যাপারটা তাদের খুব সাঙ্ঘাতিক রহস্যময় মনে হয়নি। উপরন্তু গেট কিপাররা জানিয়েছিল, এ বাড়ির লোকেরা মাঝে-মধ্যেই অমন আলো জ্বালিয়ে রেখে চলে যায়। ওটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু শ্যামল নিজেই চেক করতে চলে গিয়েছিল। এবং দশ মিনিটের মধ্যে ফিরেও আসে।

“কী!” এবার অবাক হওয়ার পালা পবিত্রর, “শ্যামল ফিরে এসেছিল!” “হ্যাঁ স্যার।” একজন রক্ষী জানায়, “কিন্তু ব্যাটা দশ মিনিট পরে এসেই কড়ে আঙুল তুলে বলল হালকা হতে যাবে। আমরাও কিছু বলিনি। কিন্তু ও আর ফিরছে না দেখে একটু অবাকই হচ্ছিলাম। খুঁজতেও যেতাম। কিন্তু তার মধ্যেই আপনারা চলে এলেন।”

"ঠিক করে দেখেছিলে যে ওটা শ্যামলই ছিল? অন্য কেউ নয়?"

"স্যার, মিথ্যে কথা বলব না। রাতের অন্ধকারে মুখ দেখতে পাইনি।" রক্ষীটি মাথা হেঁট করল, "কিন্তু উর্দি...!"

পবিত্র রাগের মাথায় তাকে আরও একচোট গালিগালাজ করল। রক্ষীটির কথাতেই স্পষ্ট, যে উর্দিধারী বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সে আর যে-ই হোক শ্যামল ছিল না। তাদের নাকের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল খুনী, অথচ কেউ বুঝতেই পারল না! ঠিক ইঁদুর-বিড়ালের প্যাটার্ন! রাগে চিড়বিড় করতে করতে বলল পবিত্র আচার্য, "ওয়ার্থলেস! অপদার্থ!"

সব শুনেও অধিরাজের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই! সে একদৃষ্টে কার্পেটের দিকেই তাকিয়ে আছে। তার মুখ অভিব্যক্তিহীন। বজ্রাহত গাছের মতো স্তম্ভিত, নির্বাক! তার চারপাশে যে এতকিছু ঘটে যাচ্ছে, কোনও বিকারই নেই! সে তখনও কার্পেটের ওপর চাপ চাপ রক্তের ছাপ দেখে চলেছে। চোখের সামনে ভাসছে শুধু শ্যামলের মৃতদেহটা! আর তার বুকের ওপর সেই কালান্তক 'নয়' সংখ্যা! সদ্য বিয়ে করেছিল ছেলেটা! সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। বাবুর পর এবার শ্যামল! একের পর এক দুটো নিরপরাধ মানুষ মারা গেল! বেঘোরে মারা গেল কতগুলো নিষ্পাপ সারমেয় আর মার্জার শাবক। আর কত!

ডঃ চ্যাটার্জী ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই অর্ণবকে ইশারায় ডেকে ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, "রাজা কথা বলছে না কেন!"

অর্ণব অপলকে নিজের বসের দিকেই তাকিয়েছিল। অধিরাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাকের পাটা থেকে থেকে ফুলে উঠছে। চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড রাগ। বুকের ওঠাপড়া দেখেই বোঝা যায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। "আমার ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না।" অর্ণবের কাঁধের ওপর হাত রাখলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, "আবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও সাহস পাচ্ছি না। তুমি একবার দেখো।"

অর্ণব ডঃ চ্যাটার্জীর কথার উত্তরে সামান্য মাথা ঝাঁকায়। তারপর গুটি গুটি পায়ে অধিরাজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কোনও কথা না বলে পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দিয়েছে তার দিকে। এইবার অধিরাজের স্থির দৃষ্টি সামান্য

নড়ল। এই প্রথম চোখের পলকও পড়ল। সে খুব আস্তে কাঁপা কাঁপা হাতে একটা স্টিক তুলে নেয়। অর্ণব নীরবে তার লাইটারটা এনে দিয়েছে। ফস করে লাইটার জ্বলে উঠল। সিগারেটে টান মারল ঠিকই, কিন্তু তার অস্থিরতা অর্ণবের দৃষ্টি এড়ায়নি। সে খুব নম্রভাবে ডাকল, "স্যার!"

তার দিকে কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো তাকাল অধিরাজ। অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে, "সিকিউরিটি সরিয়ে দাও অর্ণব।"

অর্ণব বিস্মিত, "কী?"

"সিকিউরিটি এই মুহূর্তেই সরিয়ে দাও।" তার কণ্ঠস্বর ঠান্ডা কিন্তু শাণিত, "আমার সিকিউরিটি লাগবে না। ইনফ্যাক্ট তোমাদের কারোর প্রয়োজন নেই। তোমরা সবাই চলে যাও। আমি ওপর মহলে সিকিউরিটি তুলে নেওয়ার জন্য ই-মেল পাঠাচ্ছি।"

– "হোয়াট!"

ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন, "নো ওয়ে!"

"কেন নয়?" -

অর্ণব সভয়ে দেখল অধিরাজের মধ্যে সেই অনমনীয় গোঁয়ার্তুমিটা ফিরে এসেছে। সে ডঃ চ্যাটার্জীকে ইশারায় থামতে বলবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি বলে বসলেন; "বি'কজ দিস ইজ সুইসাইড রাজা! সিকিউরিটি থাকতেই এই! না থাকলে কী হবে! সিম্পলি সুইসাইড!"

– "সিকিউরিটি না থাকলে সুইসাইড?" একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল যেন, "সিকিউরিটি থাকলে কী হচ্ছে? সিম্পলি হোমিসাইড! ম্যান স্লটার! অলরেডি দু'দুটো নিষ্পাপ প্রাণ চলে গিয়েছে ডঃ চ্যাটার্জী! কার জন্য? আমাকে সিকিউরিটি দিতে গিয়ে গার্ডরা নিজেরাই ইনসিকিওরড হচ্ছে! ওদের একটাই অপরাধ! বাবু ছিল বলে খুনী আমার কাছে আসতে পারছিল না, আর শ্যামল সম্ভবত ওকে বাধা দিয়েছিল; প্রকারান্তরে ওর মনস্তত্ত্বে দু'জনেই আমার কাছে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বাধা ! আমি অন্তত এইটুকু জানি যে এখনও ন'দিন আমার হাতে আছে! কিন্তু এই লোকগুলো কী অপরাধ করেছে যে ওদের সবাইকে এখনই

বকরাক্ষসের মুখে তুলে দিতে হবে! ওদের সবার সংসার আছে, স্ত্রী-সন্তান আছে! আমার নিজের প্রাণের ভয়ে ওদের ফ্যামিলিকে পথে বসাবো! রা-বি-শ!"

"রাজা !" তিনি মরিয়া হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন, "তুমি বুঝতে পারছ না, ঠিক এটাই ও চাইছে! নার্ভের যুদ্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ একা, অরক্ষিত করে দেওয়ার এটা একটা স্ট্র্যাটেজি। আর তুমিও ওর ফাঁদে পা দিচ্ছ।"

"বেশ করছি। যদি আমায় একা পেলে ওর শান্তি হয়, তবে তাই হোক। অন্তত আমার জন্য অন্য কাউকে প্রাণ দিতে হয় না।" ডঃ চ্যাটার্জী প্রমাদ গুনলেন। অধিরাজের কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। অর্থাৎ তার মাথায় খুন চেপে গিয়েছে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

বেশি উত্তেজনা ওর পক্ষে মোটেই ভালো নয়। কথা বলার ভঙ্গিতেই স্পষ্ট, নিঃশ্বাস নিতে সামান্য কষ্ট হচ্ছে। 'সর্বনাশিনী কেসে ফুসফুসে বুলেটের আঘাত লাগার দরুণ তার লাংস এখনও সামান্য দুর্বল। পুরোপুরি সেরে উঠতে যে সময় লাগে, তা পায়নি। উপরন্তু এই কেসটার বীভৎসতা মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ ফেলেছে।

– "আপনি এখনও লোকটার মেন্টালিটি বোঝেননি? যতদিন না ও আমায় একা পাচ্ছে, ততদিন অবধি একটা একটা করে লাশ ফেলবে, আর কাউন্টডাউন লিখে লিখে পাঠাবে! অর্থাৎ এখনও আরও ন'টা ইনোসেন্ট লোকের লাশ পড়বে! যত ওকে বাধা দেবেন, ওর হিংস্রতা আরও বাড়বে।" প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল সে, "আপনি চান ততদিন আমি ভয়ের চোটে চতুর্দিকে সিকিউরিটি নিয়ে ঘুরব! বু-ল-শি-ট!" -

ডঃ চ্যাটার্জী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, "আমি সেকথা বলিনি রাজা। প্লিজ, শান্ত হও।"

- "শান্ত! শান্ত তখনই হবো যখন আপনারা আমায় একা ছাড়বেন! ঐ লোকটা ওয়ান টু ওয়ান ব্যাটল চায়। সেটা ও আমায় বোঝাতে পেরেছে। ফাইন! ওয়ান টু ওয়ান ব্যাটলই হবে। কাউকে চাই না। কোনও টিমের দরকার নেই। বেরিয়ে যান আপনারা। জাস্ট গেট আউট!"

বলতে বলতেই মারাত্মক বিষম খেল সে! একটা দুর্দান্ত কাশির দমক ফুসফুস বেয়ে উঠে আসছে। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে তার চোখে জল এসে গিয়েছে। অর্ণব তার হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেয়। ডঃ চ্যাটার্জী আগেই এমন কিছুর আশঙ্কা করেছিলেন। এবার অর্ণবের দিকে তাকিয়ে আর্তস্বরে বললেন, বললেন, "অর্ণব, নেবুলাইজার– কুইক!"

"নো!"

সেই অবস্থাতেই কোনওমতে উঠে দাঁড়িয়েছে অধিরাজ। টলতে টলতে ভেতরের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, "কিচ্ছু চাই না! কাউকে চাই না! আমার জন্য কাউকে কিছু করতে হবে না। লিভ মি! গেট আউট!" অর্ণব ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যায় তার দিকে, "স্যার, প্লিজ। আপনি তো ঠিকমতো হাঁটতেও পারছেন না!"

—"ডো-ন্টটা-চ!" সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধভাবে গর্জন করে উঠল অধিরাজ, "আ-উ-ট! আই সে, গে-ট আ-উ-ট!"

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। আত্রেয়ী দত্ত অধিরাজের এই মূর্তি কখনও দেখেনি। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে! আহেলিকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে। পবিত্র নীরব। ডঃ চ্যাটার্জী সখেদে মাথা নাড়লেন। আপাতত আর কিছু করার নেই। অধিরাজ সহজে রাগে না। কিন্তু তার মাথায় রক্ত চড়লেই বিপদ!

অর্ণবের দিকে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ফের তর্জনী তুলে বলল সে, "আ-উ-ট!" কথাটা ছুঁড়ে সে টলতে টলতে ভেতরের দিকে চলে গেল। অর্ণব সেখানেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। শান্ত, স্থির, সর্বংসহা! ডঃ চ্যাটার্জী এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বললেন, "অর্ণব, রাজার এক্সাইটমেন্ট বাড়ছে। এখন ব্যুরোয় চলো। ওর ব্লাডপ্রেশার বাড়িয়ে লাভ নেই।" অগত্যা সকলেই আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। পবিত্রর মুখ গম্ভীর। আহেলি এতক্ষণে সামলেছে, কিন্তু তার মুখে বিষণ্নতা। আত্রেয়ীর কেন কে জানে অর্ণবের জন্য দুঃখ হচ্ছিল! লোকটার কোনও দোষ নেই। অথচ সবচেয়ে বেশি ধমক ঐ মানুষটার কপালেই জুটল। সে আস্তে আস্তে বলে, "তবে কি সিকিউরিটি সত্যিই তুলে নেওয়া হবে?"

"নিউ রিক্রুট? মিস আত্রেয়ী দত্ত?" ডঃ চ্যাটার্জীর প্রশ্নে মাথা নাড়ল আত্রেয়ী। ডঃ চ্যাটার্জী একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "সেজন্যই এখনও নিজের টপ বসকে চেনেননি আপনি। এই লোকটার মতো ত্যাড়া ঘেটি লোক খুব কমই আছে। ও যখন বলেছে সিকিউরিটি তুলে দিতে হবে, তখন তুলতেই হবে। ডিপার্টমেন্টের বড় বড় চাঁইয়েরাও অধিরাজ ব্যানার্জীর জেদের সামনে হেরে যান। অতএব সিকিউরিটি উঠবেই।"

"তাহলে কী হবে?" আত্রেয়ীর চোখে আতঙ্ক, "স্যার এরকম অরক্ষিত থাকলে তো খুনীর পোয়াবারো।"

ডঃ চ্যাটার্জী ফ্যাকাশে হাসলেন। কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। বরং অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কাছে কিছু খুচরো হবে? আমার গাড়ি তো লাশ বোঝাই করে চলে গেল। তোমরা তো বোধহয় ব্যুরো যাবে। আমি আর আহেলি একটা ক্যাব ডেকে নেব ভাবছিলাম। ল্যাবে যাওয়া জরুরি। কিন্তু আমার কাছে সব বড় নোট।"

- "আপনারা এখান থেকে স্ট্রেট ল্যাবে যাবেন স্যার?" আত্রেয়ী অবাক, "কিন্তু সারারাত বোধহয় বিশ্রাম নেননি আপনারা। মিস মুখার্জীও সুস্থ নন।" - "উপায় নেই মিস দত্ত।" ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "অলরেডি রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে। ভগবান জানেন, আরও ক'টা লাশ পড়বে! খুনী সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য নেই আমাদের কাছে। রাজা বলল, শুনলেন না? এখন যুদ্ধটা ওয়ান টু ওয়ানে দাঁড়িয়েছে। আর সত্যি বলতে কী, আমিও এবার ভয় পাচ্ছি।" আত্রেয়ী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞর কণ্ঠস্বরে সত্যিই ভয়ের ছাপ, "কথাটা আমার বলা উচিৎ নয়, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ। খুনী যে-ই হোক না কেন, গে' এবং বদ্ধ পাগল। আর রাজার চেহারাটা দেখেছেন? মেয়েদের পাগল করে দেওয়ার জন্য পারফেক্ট। এমনিতেই পাগল, তার ওপর ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে দেখে নির্ঘাৎ আরও পাগল হয়েছে! আমার মনে হচ্ছে, রাজাকে সে আদৌ অতখানি সময় দেবে না! দেখুন গিয়ে, ওর হয়তো আর তর সইছে না। সুতরাং নেক্সট ব্লো আসার আগেই উঠে পড়ে কিছু খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের। বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই।"

আহেলি আত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওয়েলকাম টু টিম অধিরাজ। এই টিমটা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে। তোমারও অভ্যেস হয়ে যাবে ভাই!"

অর্ণব এর মধ্যে একটি কথাও বলেনি। সে চুপচাপ ওয়ালেট খুলে ডঃ চ্যাটার্জীর হাতে কয়েকটা নোট ধরিয়ে দেয়। আত্রেয়ী সবিস্ময়ে দেখল তার ওয়ালেটের ভেতরে অত্যন্ত পরিচিত মুখ উঁকি মারছে!

- "আপনি ওয়ালেটে স্যারের ছবি রেখেছেন!"

সে বিস্ময়ে কী বলবে ভেবে পায় না। লোকে নিজের বাবা-মায়ের ছবি রাখে, বৌয়ের ছবি রাখে কিংবা প্রেমিকার! কিন্তু কেউ নিজের বসের ছবিও ওয়ালেটে রাখে, তা জীবনে প্রথমবার দেখছে।

অর্ণব একটু বিব্রত হয়েই ওয়ালেটটা তাড়াতাড়ি পকেটে গুঁজে ফেলে। আত্রেয়ীর প্রশ্নের উত্তর দিল না। আসলে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই নেই। দুনিয়ায় এমন কোনও নিয়ম নেই যে বাবা-মা, বৌ কিংবা প্রেমিকার ছবিই ওয়ালেটে রাখতে হবে। কিছু কিছু ভালোবাসা আছে যেগুলো অন্য গোত্রের। সেখানে স্নেহ, মমতা আর স্বার্থহীন শুভাকাঙ্ক্ষাই মূল উপাদান। সে কোনও কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। কারোর মুখে কোনও কথা নেই।

গাড়ি সি আই ডি ব্যুরোর দিকে ছুটে চলল। অর্ণবের মুখে আষাঢ়ের ঘন মেঘ। তার ফর্সা মুখে অচ্ছাভ বিষণ্নতা চয়ে আছে। পবিত্র আচার্যও তার স্বাভাবিক রসিকতা করার প্রবণতা হারিয়ে ফেলেছে। আত্রেয়ী এই অখণ্ড নীরবতার মাঝখানে কী করবে বুঝতে পারছে না। তার দুই সিনিয়রই নির্বাক। বেচারি বুঝে উঠতে পারছে না আদৌ তার কিছু বলা উচিত কি না। সে চোরের মতো অর্ণবের মুখের দিকে তাকায়। অর্ণবের চোখ সামনের দিকে স্থির। একেবারে যন্ত্রের মতো ড্রাইভ করছে। যেন প্রাণহীন পুতুল।

"আমি আপাতত বেবো ব্রিগ্যানজার খোঁজে যাচ্ছি।" শেষপর্যন্ত পবিত্রই এতক্ষণের অসহনীয় নীরবতা ভেঙে বলে ওঠে, "ও শালাকে যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছি, ততক্ষণ শান্তি নেই। নিতান্তই যদি মরে না গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে বের করবই। তুমি কি শেয়াল পন্ডিতকে ট্র্যাক করবে অর্ণব?" অর্ণব সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। এবার একটু অন্যমনস্ক স্বরে উত্তর দেয়, "হুঁ।"

আত্রেয়ী এতক্ষণে একটু সাহস পেয়ে বলে, "আর আমি কী করব?" "মিস দত্ত, আপনি সুকোমল পান্ডের পেছনে ফিল্ডিং লাগিয়ে দিন। ঐ লোকটার পেট থেকেও কথা বের করতে হবে।"

"ওকে।"

অর্ণব তখনও অন্যমনস্ক। তারচোখের সামনে তখনও টুকরো টুকরো ছবি ভেসে উঠছে। সে সম্পূর্ণ মনোসংযোগে ড্রাইভ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু "ঠিক এটাই ও চাইছে!... আর তুমি ওর ফাঁদে পা দিচ্ছ।" মনে পড়ে যায় খণ্ড খণ্ড দৃশ্য বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে ডঃ চ্যাটার্জীর কথা, শিশির সেনের কথা, 'আমার ভুলটা তুমি কোর না!...সরকার, এখন কেসটার অর্ধেক তোমার হাতে।'...একটু আগেই বলা আত্রেয়ীর শব্দগুলো, "খুনীর পোয়াবারো... খুনীর পোয়াবারো...!"

অর্ণবকে কে যেন জোরালো ধাক্কা মারে! সে আচমকা ব্রেক কষল। যেন এতক্ষণ গভীর ঘুমে ছিল, এই মুহূর্তেই জেগে উঠেছে! "কী হল!" পবিত্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, "ব্রেক কষলে কেন!" অর্ণব একটা শ্বাস টানল। তার দৃষ্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে একটি কথাও না বলে সবলে স্টিয়ারিং ঘোরায়। পবিত্র আর আত্রেয়ী সবিস্ময়ে দেখল, সে ইউ টার্ন নিয়ে ফের অধিরাজের বাড়ির পথ ধরেছে। সদ্য সকাল হয়েছে। এখনও পথ ঘাটে গাড়ির বাহুল্য নেই। কিন্তু চিরকালীন শান্ত ও সাবধানী অর্ণবের এ কী মূর্তি! সে প্রাণপণে গাড়ির স্পিড বাড়াচ্ছে। যে চিরকাল অন্য গাড়িকে সাইড দিয়ে অভ্যস্ত, সে আজ ডেলিবারেটলি ওভারটেক করছে। অর্ণবকে এরকম র‍্যাশ ড্রাইভ করতে নিজের গোটা কেরিয়ারে কখনও দেখেনি পবিত্র। সে স্খলিত, স্তম্ভিত স্বরে বলল, "অর্ণব! হোয়াট হ্যাপেন্ড!"

"আমাদের এক্ষুনি স্যারের কাছে যেতে হবে।"

অর্ণব সর্বশক্তি দিয়ে অ্যাক্সিলেটর চেপে ধরে। এখন তার কথা বলার মতো পরিস্থিতি নেই। দাঁতে দাঁত পিষে শুধু মনে মনে বলল, "আমি শিশির সেন নই!"

(১৭)

অবশেষে! অবশেষে তুমি আর আমি একা প্রিয়তম। আশ্চর্য সব লোকজন! কিছুতেই তোমায় একলা ছাড়ে না এরা! অথচ কতদিন ধরে এই মুহূর্তটার অপেক্ষা করে চলেছি। রাতের পর রাত অধীর আগ্রহে প্রহর গুণেছি। কল্পনায় কতবার তোমায় ভেবে ভীষণ কষ্টে ছটফট করেছি। তুমি জানো না, একমুহূর্তের জন্যও তোমায় চোখের আড়াল করিনি। বলেছিলাম না, আটকাতে পারবে না! দেখো, কেউ আটকাতে পারেনি। যারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাদের গুঁড়িয়ে দিয়েছি, সরিয়ে দিয়েছি। আর আজ আমি তোমার মুখোমুখি! এই মুহূর্তে তুমি অসহায়ের মতো আমার সামনে পড়ে আছ। এখন চাইলে আমি তোমায় ছুঁতে পারি, প্রাণভরে আদর করতে পারি। কেউ বাধা দিতে আসবে না। আরও কেউ যদি আসে, যদি গোটা পৃথিবীটাও এসে দাঁড়ায়, সব ধ্বংস করে দেব। কথা দিলাম!

লোকটা সকৌতুকে সামনে পড়ে থাকা অধিরাজের দিকে তাকায়। এখন সে নিজের বেডরুমের মেঝেতে চিৎ হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে। পরাজিত ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। নিজের টিমের সঙ্গে বাদানুবাদের পর অধিরাজ কোনওমতে হাঁফাতে হাঁফাতে দোতলায় উঠে এসেছিল। নিজের বেডরুমে ঢুকে আপ্রাণ খুঁজে বের করেছিল নেবুলাইজারটা। শ্বাসকষ্টে চোখ বারবার ঝাপসা হয়ে আসে, দীর্ঘ দেহ কুঁকড়ে যায়। একটু অক্সিজেন নেওয়ার তাগিদে হাঁসফাঁস করছিল সে তাই লক্ষ্যই করেনি, একটা ছায়ামূর্তি কখন যেন চুপিচুপি এসে দাঁড়িয়েছে তার ঠিক পেছনেই। লোকটা বুঝতে পেরেছিল, এই সুবর্ণ সুযোগ। কারণ তার ইপ্সিত মানুষ তখন বিপন্ন ও নিঃসঙ্গ। এবং দীর্ঘদেহী মানুষটা ঝুঁকে পড়ে নেবুলাইজারের মাধ্যমে ওষুধ নিচ্ছে! একদম হাতের নাগালে! সে আর একমুহূর্তও দেরি না করে তার ঘাড় ও মাথার সংযোগস্থলে সপাটে হাতের ধার দিয়ে চরম এক আঘাত বসিয়ে দিয়েছিল। অধিরাজ প্রত্যাঘাত করারও সুযোগ পায়নি। অবশ হয়ে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতেই। লোকটা কিন্তু তখনই তাকে স্পর্শ করেনি। বরং জানলা দিয়ে দেখছিল নীচের দৃশ্যটা।

যখন নিশ্চিন্ত হল, অফিসাররা সব চলে গিয়েছে, তখনই সমস্ত জানলা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসেছিল অধিরাজের কাছে। তার কাঁধের একটা মলিন ঝোলাব্যাগ থেকে একটা ইঞ্জেকশন বের করে পুশ করে দিয়ে ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল।

সে এবার অবিকল একটা লোভী শিশুর মতো অধিরাজের মুখে আঙুল বোলাচ্ছে। তার কপাল বেয়ে লোকটার আঙুল চোখ, নাক ছুঁয়ে নীচে ঠোঁটের ওপর নামল। এই সেই ঠোঁট, যা তার কল্পনায় বারবার ফিরে এসেছে। রাতের পর রাত উন্মত্ত করে তুলেছে। এখন কল্পনা বাস্তবে এসে দাঁড়াল! লোকটার মনে হল একটা প্রচণ্ড বিদ্যুত্তরঙ্গ তার আঙুল বেয়ে উঠে এসে গোটা শরীরকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। কী অদ্ভুত যৌন আবেদনময় ঠোঁট! কী নরম! কী উষ্ণ! অথচ কী পুরুষালি !

সে ঝুঁকে পড়ে তার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল। ওঃ! পুরো চারশো চল্লিশ ভোল্টের ছ্যাঁকা! ভীষণ আগ্রাসী চুম্বনে যেন বহু শতাব্দীর তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করছে মানুষটা। অধিরাজের শিথিল শরীরটাকে দু'হাতে জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে বুকে টেনে নিয়েছে। তার মাথার পেছনে খেলছে লোকটার দু'হাত। চুলে বিলি কাটছে। কিন্তু তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মেটে না। একবার, দু বার, তিনবার ...অগুনতি বার! চুমুর পর চুমু! তবু উত্তাপ যেন ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে! কী নেশা! কী জ্বালা! এ তৃষ্ণার কী শেষ নেই! কী আগুন তৈরি করেছ ঈশ্বর! আমি যে পতঙ্গের মতো জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেলাম! লোকটা অধিরাজের গালে, কপালে নেশাগ্রস্তের মতো গাল ঘষছে। তার অবশ হাত দুটোকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকটা আঙুলের মাথায়, নখে আলতো করে আদরভরা কামড় বসাচ্ছে। ছোট্ট শিশু ভীষণ পছন্দের পুতুল পেলে যেমন বুঝে পায় না যে কী করা উচিৎ, তেমন সেও বুঝতে পারছে না এই অচেতন পুরুষ দেহটাকে নিয়ে ঠিক কী করবে! আকণ্ঠ চুমু খেতে খেতে অবিকল চকোলেটের র‍্যাপারের মতো ছাড়িয়ে নিচ্ছে তার পরনের শার্ট। দু'হাত খেলছে প্রিয় পুরুষের দেহের প্রত্যেকটি পেশীর ভাঁজে, কোমরে। ডাকাতের মতো ছিনিয়ে নিচ্ছে সমস্ত ওম।

লোকটা তার কানের লতিতে আলতো কামড় দিয়ে তাকে ফের চিৎ করে ফেলে ফিসফিস করে বলল, “দাঁড়াও, তোমায় ভালো করে দেখি।” মুহূর্তের মধ্যে সরে গেল শেষ

সুতোটুকুও। অধিরাজের দেহ এখন সম্পূর্ণ অনাবৃত, উন্মুক্ত! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না! এ কী কারুকার্য! যখন স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে ছেনি হাতুড়ি ওঠে তখনই বোধহয় এমনই শিল্প তৈরি হয়! যতটা সুন্দর, ঠিক ততটাই পবিত্র। নারীর কমনীয়তা সর্বস্ব সৌন্দর্য এর পাশে দাঁড়ায়ই না। সে বুঝল, এ জিনিস কল্পনা করা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কল্পনাশক্তি বাস্তবের কাছে চূড়ান্তভাবে হেরে গিয়েছে!

ওঃ কী পুরুষ! অপূর্ব! কী অপূর্ব তুমি। জানি না কত মেয়ের তুমি ইপ্সিত! কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার মতো তোমায় কেউ এমন আকুলভাবে কামনা করবে না। বত্রিশ বছর পর তোমাকে আসতে হল! এভাবে আসতে হয়। আমি জানি তোমার শরীরের মতো হৃদয়টাও ভীষণ সুন্দর। তুমি মানুষের কষ্ট বোঝো। একটা পাগলকেও ভালোবাসতে জানো। নয়তো সব বুঝেশুনেও এরকমভাবে ফাঁদে পা দিতে না। কী হত, যদি আরও কয়েকটা মানুষ মরত? কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, তুমি সবার মতো নও। বুদ্ধির ধারে এখনও পর্যন্ত আমার দেখা শ্রেষ্ঠ অফিসার তুমিই। যে রহস্য বত্রিশ বছর ধরে কেউ ভেদ করতে পারেনি, তুমি কয়েকঘণ্টাতেই বুঝতে পেরেছ। এভাবে আমাকে কেউ হারাতে পারেনি! আমাকে এমন চরম পরাজয়ের সম্মুখীন করেনি। তুমি আমার অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছ। 'সার্জিক্যাল স' কিলারের হাত থেকে সার্জিক্যাল স'টাই কেড়ে নিলে! আমি এখন কী করব? দোকান থেকে কিনতে গেলেই গ্রেফতার হতে হবে! তোমার একটা দুর্দান্ত চাল আমায় অসহায়, বিপন্ন করে তুলেছে। ব্রিলিয়ান্ট! ফ্যান্টাস্টিক।

সে ফের অধিরাজের ঠোঁটে, চোখে আঙুল বোলাচ্ছে। মানছি, তুমিই আমার জন্য যোগ্যতম। হয়তো বত্রিশ বছর আগে এলে আমায় সুস্থ একটা জীবন দিতে পারতে। কিন্তু, আমি জানি; তুমি আমায় কখনও ভালোবাসবে না! কখনও আমার হবে না। এখন তো আর সম্ভাবনাই নেই।

আপনমনে বিড়বিড় করতেই লোকটা তার নাভিমূলে মুখ রেখেছে। তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। তার নাভিকুণ্ডে একটা তীব্র বিষাক্ত চুমু খেয়ে বলল, "কী মনে হচ্ছে ডার্লিং? নিজেকে ভীষণ একা লাগছে না? মনে হচ্ছে না, তুমি অভিশপ্ত? কার্সড!

বুঝতে পারছ না, তোমার আশেপাশের মানুষগুলো সরে যাচ্ছে? এই নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত জীবনের যন্ত্রণা কি বুঝেছ?

তোমার কোন দোষ নেই; অথচ এখন কাউকে কাছে ডাকতেও ভয় পাচ্ছ। বুঝতে পারছ, কেমন লাগে! অথচ এটাই যে আমার গোটা জীবন! অভিশপ্ত! আমি এক অভিশপ্ত মানুষ! আই অ্যাম কার্সড।"

তার অবশ দেহটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল মানুষটা। আমার কী দোষ! আমারও ভালোবাসা আছে, কামনা আছে, আমার শরীরেও আগুন জ্বলে; কিন্তু কী করব! বুদ্ধিতে, যোগ্যতায়, শক্তিতে আমি কারোর থেকে কম নই। নিজেকে উজাড় করে ভালোবাসতেও জানি। অথচ সমাজ সেসব কিছুই দেখে না। আমার পরিচয় কি শুধুমাত্র আমার যৌনজীবন! এ কী ধরনের বিচার? আর কোনও কিছুই কি আমার যোগ্যতা বহন করে না! তবে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করলাম কেন? জানো? আমি নাচতে বড় ভালোবাসতাম। পাড়ার ফাংশনে নেচেছিলাম। কিন্তু 'নাচ' না কী পুরুষের যোগ্য কাজ নয়! এ কী ধরনের বোকা বোকা কনসেপ্ট! নাচ একটা শিল্প, তার আবার নারী পুরুষ কী! নেচেছিলাম বলে বাবা বেল্ট দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে চামড়া তুলে নিয়েছিলেন।

লোকটার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ে। একটা অসহনীয় কান্নাকে অবদমিত করার চেষ্টা করছে সে। ভাবতে পারো, একটা শিশুকে কী কী সহ্য করতে হয়েছে! এর চেয়ে তখনই মেরে ফেলতে পারত! মরছিলাম তো এমনিই! আমার জ্যেঠু রোজ আমায় রেপ করত। তার চেয়ে মৃত্যুও ভালো ছিল। আমার কোমল অঙ্গটা ছিঁড়েখুঁড়ে যেত! রক্ত পড়ত...। তলপেটে কী যন্ত্রণা! আমি ভীষণ কাঁদতাম। জ্যেঠুর পায়ে পড়তাম। জ্যেঠু খিঁচিয়ে উঠত। বলত, "মেয়েদের মতো কাঁদিস কেন! ব্যাটাছেলেদের অমন ছিঁচকাঁদুনে মাগীপনা মানায় না! তুই শালা নির্ঘাৎ হিজড়ে!" তারপর আরও বেশি অত্যাচার করত।

বুঝতে পারছিলাম না কী করব! বড় লজ্জার কথা। অথচ সহ্যও হচ্ছিল না। মাকে সব খুলে বললাম। মা বললেন, "চুপ! চুপ! এমন কথা বলতে নেই। ব্যাটাছেলের মুখে এমন কথা শুনলে লোকে হাসবে!" আমার শেষ অবলম্বন ছিলেন বাবা। তিনি আইনের রক্ষক।

মনে হয়েছিল, হয়তো তিনিই আমাকে বাঁচাবেন। বাবাকে বলেছিলাম, “জ্যেঠু ভীষণ নোংরা! আমার সঙ্গে খুব বিচ্ছিরি কাজ করে...!”

বাবা সঙ্গে সঙ্গেই আমায় সপাটে এক থাপ্পড় মেরেছিলেন। অত শক্তিশালী হাতের চড় সহ্য হয়নি। আমার দুধের দাঁত ভেঙে দু'টুকরো! নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়েছিল। তবু মরিয়া হয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম, “জ্যেঠু নোংরা লোক। আমায় ব্যথা দেয়। তোমরা যখন ঘরে না থাকো তখন...!” সে একটু থেমে গেল। একেবারে ছোট্ট শিশুর মতো অধিরাজের বুকে মুখ গুঁজল। যেন আশ্রয়, নিরাপত্তা খুঁজছে। ঠিক যেখানে হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করছে, তার ওপর সযত্নে হাত বোলাল। তার মাথার চুলে সস্নেহে বিলি কাটছে মানুষটা।

তারপর কী হয়েছিল জানো! জ্যেঠু সবাইকে বলল যে আমি আসলে একটা হিজড়ে। কুলের কলঙ্ক। নপুংসক! আমি মেয়েদের জামা কাপড় পরে, লিপস্টিক মেখে তাঁকে নাকি সিডিউস করেছিলাম! যৌন চাহিদাটা নাকি তার ছিল না, বরং একটি বালকের ছিল, যে শিশু গোপনাঙ্গের ব্যবহার প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া অন্য কিছুতেও করা যায়, তাও জানত না! এককথায় মানুষ নই, ঘৃণ্য প্রাণী। সেদিন আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু জ্যেঠুর কথা বিশ্বাস করেছিল। বাবা আমাকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলেছিলেন। কারণ আমার মতো সন্তান তাঁর মতো একজন জাঁদরেল পুরুষ মানুষের কলঙ্ক ! তিনি ডেয়ার ডেভিল পুলিসকর্মী! তাঁর মতো অমন দুর্দান্ত পুরুষের কিনা নপুংসক সন্তান! পৌরুষের ঔদ্ধত্য সেদিন প্রচণ্ড চোট খেয়েছিল! এই অবমাননা মেনে নিতে না পেরে তিনি লোহার রড দিয়ে পশুর মতো আমায় এলোপাথাড়ি মেরেছিলেন। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা আর চান্স নেননি। তখনই আমার অর্ধমৃত দেহটাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন অনেক দূরের এক জঙ্গলে! মা, দিদি কী ভেবেছিল, আদৌ কিছু ভেবেছিল কিনা জানা নেই! এখন আর জানতেও চাই না। শুধু এইটুকু জানি, যে একদল অমানুষ তাদের নিজের সন্তানকে আধমরা করে জঙ্গলে ফেলে এসেছিল। তারা জানত, শিশুর কচি মাংস ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়ার জন্য বন্য জন্তুর অভাব হবে না! কিন্তু এটা জানত

না বন্যপশুরা শিশুদের ওপর আক্রমণ করে না; সে নারী হোক, পুরুষ হোক, কিংবা বৃহন্নলা!

সে অধিরাজের গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, "আমি তোমাকে বোর করছি না তো? উঁ?"

ও পক্ষ নীরব। যাকে বলা হচ্ছে তার উত্তর দেওয়ার বা প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই! তার প্রশস্ত, কবাট বুকে ফের মুখ ডুবিয়ে দেয় লোকটা। লম্বা গ্রীবায় গ্রীবায় আলতো আলতো চুমু খায়। তার চোখে তখন যেন শিশুর বিপন্নতা! সেই ছোট্ট বালক, যাকে ত্যাগ করেছে তার পরিবার। সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই শিশু যে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত দেহে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘন সম্পূর্ণ অচেনা এক অরণ্যে! আকুলি-বিকুলি কাঁদছে, আর ছোট্ট দেহটাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্তত একটা পরিচিত মুখ! চিৎকার করতেও ভয় পাচ্ছে। পাছে কোনও বন্য জন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনে চলে আসে। কাঁদতে কাঁদতেই অসহায়, ভয়ার্ত স্বরে অস্ফুটে ডাকছে, "বাবা! মা! মা গো...!"

তখনই ভেবেছিলাম, আমি সবাইকে মেরে ফেলব। যখন সময় আসবে তখন আমার জ্যেঠু, আমার বাবার মতো সব্বাইকে খুন করে ফেলব আমি! লোকটা দাঁতে দাঁত ঘষল। পুরুষের এত অহঙ্কার কীসের? কীসের ঔদ্ধত্য! তোমাদের তথাকথিত পুরুষ শ্রেষ্ঠদের হারিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছি আমি! আর কতবার নিজেকে প্রমাণ করব? কিন্তু তারপরও কী পেলাম? কী পেলাম! লোকের টিটকিরি? টর্চার? অপমান? 'আনারকলি', 'চম্পা', 'গুলাবো' উপাধি! বেশ করেছি খুন করেছি! বাকিরা কী করেছে আমার সঙ্গে? তারাও কি প্রতিনিয়ত আমায় একটু একটু করে খুন করেনি? তুমি জানো না... তুমি জানো না...! ওঃ গড! আই অ্যাম সো লোনলি! অঝোরে কাঁদতে কাঁদতেই একসময় থেমে গেল মানুষটা। পরম আদরে স্পর্শ করল অধিরাজের দেহ। তার আঙুল খেলে বেড়াচ্ছে নাভির চারপাশে। অচেতন পুরুষ দেহ যেন এবার একটু শিউরে উঠল। লোকটা লক্ষ্য করল, তার শ্বাস নেওয়ার গতি বেড়েছে। ঠোঁট দুটো নিজে থেকেই ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল!

সে হাসল। এই দেখো, তুমিও অজান্তেই আমায় চাইছ! তোমার শরীর আমায় চাইছে। কিন্তু যে মুহূর্তে জানবে আমি একজন পুরুষ, সেই মুহূর্তেই আমায় ঘৃণা করবে! কেন?

পুরুষ বলে কি মানুষ নই? কাউকে গভীরভাবে ভালোবাসার অধিকার থাকবে না আমার? একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ভালোবাসতে পারে না? তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না? দুটো মানুষের ভালোবাসায় নারী পুরুষের বিভেদ করা জরুরি? সমাজ ঠিক করবে আমি কাকে ভালোবাসব? সমাজের নিকুচি করেছে! যে সমাজ মানুষের মন, তার অনুভূতির কদর করে না; শুধুমাত্র মাপকাঠি নিয়ে তার আচার-আচরণ বিচার করতে বসে, সে সমাজকে চাই না! কোথায় ছিল এই তথাকথিত সমাজ যখন আমি একটু একটু করে মরছিলাম! কেউ ছিল না বিশ্বাস করো! আগেও ছিল না, পরেও না!

সে গভীর আবেগে অধিরাজের ওষ্ঠাধরে, গালে, কাঁধে, বুকে জ্বরতপ্ত বিকারগ্রস্তের মতো মুখ, ঠোঁট ঘষছে। প্রিয়, ...প্রিয়তম... ! জানি তুমি কখনও আমার হবে না!...

ভাবতেই তার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে। হিংস্র শ্বদন্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বিপজ্জনকভাবে উঁকি মারে। অসহ্য রাগে হিসহিসিয়ে উঠল সে, "আমার না হলে তুমি আর কারোর হবে না!" কিন্তু তার আগে...! তার আগে...!

"কিস্ মি বেবি! লেট মি লাভ ইউ!"

সরীসৃপের মতো অধিরাজের শরীর বেয়ে কোমরের ওপরে উঠে এল লোকটা। সাপের মতো কামনাতুর ভঙ্গিতে প্রায় সাপ্টেই ধরল তাকে। গলা, চিবুকে তীব্র চুমু খেতে খেতে তার ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁটের ফাঁকে নিজের ঠোঁট, জিভ ডুবিয়ে দিল...!

আচমকাই পুলিশি বুটের জোরালো শব্দ। সে বিদ্যুৎগতিতে মুখ তোলে। একটু উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শুনল। বুটের আওয়াজটা দুড়দাড় হুড়মুড় করে এদিকেই আসছে। লোকটা একটু বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করে। আঃ! জ্বালিয়ে মারল! তার মুখের ক্রূর, নিষ্ঠুর রেখাগুলো নড়েচড়ে ওঠে। তারপরই অধিরাজকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে খাটের তলায় গড়িয়ে ঢুকে গেল সে। "স্যার... স্যার! দরজা খুলুন।"

বাইরে থেকে অর্ণবের আকুল প্রার্থনা ভেসে আসে। কিন্তু বন্ধ ঘরের ভেতরে কোনও সাড়া নেই। অর্ণবের মনে হল, ও এখনই বুঝি হার্টফেল করবে! সে পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা মারছে। প্রথমে কাধ দিয়ে চেষ্টা করল। কিন্তু দরজা খুলল না। অর্ণব সমস্ত শক্তি দিয়ে

খ্যাপা হাতির মতো আছড়ে পড়ছে দরজাটার ওপরে। দরজাটা তার এই অনমনীয় প্রচেষ্টায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে আপ্রাণ দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে আর চেঁচিয়ে ডাকছে, "স্যার, প্লিজ! দরজা খুলুন!"

অবশেষে একটা মানুষের প্রবল প্রচেষ্টার কাছে হার মানল কাঠের দরজা। সপাটে এক লাথি খেয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল ডোর নব! দরজাটা হাট করে খুলে গেল। অর্ণব প্রায় ঝড়ের বেগেই ছুটে ভেতরে ঢোকে। বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে যেটুকু আলো আসছিল, তাই সামনের দৃশ্যটাকে স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট! অর্ণব সেকেন্ডের ভগ্নাংশে দৃশ্যটা দেখেই বুঝতে পেরেছে, তার আশঙ্কাই সত্যি ছিল। সারা রাস্তা সে প্রার্থনা করতে করতে এসেছে তার ভয়টা যেন কাল্পনিকই হয়। কিন্তু বাস্তবে যা দেখল, তা তার কল্পনার চেয়েও ভয়ঙ্কর!

"স্যা-র!"

অর্ণব আর একমুহূর্তও দেরি না করে বিছানার চাদরটা একটান মেরে তুলে নিয়েছে। অধিরাজের অনাবৃত দেহ সযত্নে ঢেকে দিল লম্বা বেডকভারে। তার সামনে ঝুঁকে পড়ে, গালে আলতো চাপড় মেরে ব্যাকুলভাবে ডাকল অর্ণব, "স্যার! স্যা-র!"

দেখেছ! তোমার সঙ্গীরাও এক-একজন ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট! একটু প্রাইভেসিও দেবে না। আর এই ছেলেটিও একটি অবতার! সবসময়ই তোমার গায়ের সঙ্গে লেগেই আছে। ওর প্রবলেমটা কী!

লোকটার মুখের প্রত্যেকটা রেখা চূড়ান্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। সে আরও কয়েকজোড়া পুলিশি বুটের আওয়াজ পেয়েছে। ততক্ষণে হুড়মুড়িয়ে পবিত্র এবং আত্রেয়ীও এসে হাজির। পবিত্র ভেতরের দৃশ্যটা দেখেই আত্রেয়ীকে ইশারায় ঘরে ঢুকতে বারণ করে ছুটে গেল অর্ণবের দিকে। উদ্বেগপূর্ণ স্বরে জানতে চাইল, "কী হল? রাজা ঠিক আছে?"

অর্ণব ভেজা স্বরে জবাব দেয়, "উনি চোখ খুলছেন না স্যার! কোনও উত্তর দিচ্ছেন না! দেখুন কী অবস্থা!" বলতে বলতেই তার চোখমুখের ভাব পালটে গেল। প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় বলে উঠল সে, "আই উইল কিল দ্যাট বাস্টার্ড! জানোয়ারটাকে মেরেই ফেলব!"

বাস্টার্ড! আমি বাস্টার্ড! জানোয়ার! শব্দগুলো লোকটার মাথায় পিন ফুটিয়ে দেয়। মস্তিষ্কের ভেতরে এই শব্দগুলো বিঁধে বিঁধে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কী শুরু করেছে! আমি

নরপশু, বিকৃতমস্তিষ্ক, নরকের কীট— আর এখন বাস্টার্ড! যা খুশি তাই বলবে! সে আর একমুহূর্তও দেরি না করে মুখঢাকা টুপিটা পরে নেয়। বিদ্যুৎগতিতে ঝোলা থেকে বেশ কয়েকটা ক্যান বের করে ছুঁড়ে দেয় দুই পুরুষ অফিসারকে লক্ষ্য করে। অর্ণব আর পবিত্র এমন অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিছু বোঝার আগেই ঘর ভরে গেল উৎকট ধোঁয়ায়! অর্ণব প্রমাদ গুণল। টিয়ার গ্যাস ক্যানিস্টার! পবিত্র ধোঁয়ার জালে আটকে গিয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে কী! কাশতে কাশতেই অতিষ্ঠ। অর্ণবের চোখ জলে ভরে গিয়েছে। চোখ জ্বালা করছে। সে ঠিক মতো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু সেই অবস্থাতেই দেখল একটা ছায়ামূর্তি সরীসৃপের মতো বেরিয়ে এসেছে খাটের তলা থেকে!

তারা অধিরাজকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে ভাবতেও পারেনি যে দুর্বৃত্তও এ ঘরেই লুকিয়ে থাকতে পারে। আফসোসে সে ঠোঁট কামড়ায়। ভাবা উচিৎ ছিল! কিন্তু অপরাধীর খোঁজ করার আগেই বিদ্যুৎচমকের মতো এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ।

পবিত্র কাশির দমকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারা টিয়ার গ্যাস ক্যানিস্টারের ব্যবহার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতের কাছে গ্যাস মাস্ক নেই! ছায়ামূর্তি পালাতে গিয়ে একেবারে আত্রেয়ী দত্তের সামনে পড়েছে। আত্রেয়ীকে এক ঠ্যালা মেরে সরিয়ে দিলেও লেডি অফিসার প্রায় চিতার বেগে তার পিছনে ছুটল। অর্ণবও লাফ মেরে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। একটা জোরালো শ্বাস টেনে সেও তীরবেগে দৌড়চ্ছে! মুহূর্তের মধ্যে তার হাতে উঠে এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র। চোখ, নাক জ্বালা করছে, ঠিকমতো লক্ষ্যও স্থির করতে পারছে না। তবু দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম ফায়ারটা করল সে।

চতুর্দিকের শান্ত পরিবেশ ফায়ারিঙের শব্দে কেঁপে উঠল। আত্রেয়ী প্রায় বাঘিনীর মতো তাড়া করেছে লোকটাকে। দৌড়তে দৌড়তেই হাঁ করে দেখল, লোকটা প্রায় ভল্ট যেই সিঁড়ি পেরিয়ে গেল। প্রবল স্পিডে স্প্রিন্ট টানতে টানতে এবার আত্রেয়ীকে ছাড়িয়ে গেল অর্ণব। সেও এক মসৃণ লাফে সিঁড়ি পেরোল। নীচে ল্যান্ড করেই চেঁচিয়ে উঠল, “কী দেখছেন! ফা-য়া-র!”

আত্রেয়ী দৌড়তে দৌড়তেই মাথা নাড়ল। তার হাতেও মসৃণ আগ্নেয়াস্ত্র কালনাগিনীর মতো ফণা তুলেছে। পরপর র‍্যান্ডেম ফায়ারিঙের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল গোটা তল্লাট!

কিন্তু আশ্চর্য! লোকটাকে একটা বুলেটও স্পর্শ করল না। সে তীব্রবেগে এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। রীতিমতো এক্সপার্টের মতো এঁকেবেঁকে দৌড়চ্ছে রাস্তা দিয়ে। বুলেট কখনই বেঁকে চলে না। ফলস্বরূপ সব ফায়ারই ব্যাঙ্ক হচ্ছে। তার

ট্র্যাফিকহীন পথ বেয়ে চলছে এক মরণপণ চেজিং। সামনে অপরাধী। মুখ অদ্ভুত একটা টুপিতে ঢাকা। পেছন পেছন দুই অফিসার। লোকটা দৌড়তেই দৌড়তেই লাফ মেরে পার হল ডিভাইডার। অর্ণবও হাল ছাড়বে না। সে প্রায় ক্ষ্যাপা শিকারীর মতো লোকটাকে ধাওয়া করেছে। আজ ওর একদিন কী তার একদিন! সে ও লাফ মেরে ডিভাইডার ক্রস করে। ওর মাথা লক্ষ্য করে ফের ফায়ার করেছে। কিন্তু লোকটা দেহটাকে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে যেভাবে বুলেটটা ডজ করল তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ!

"ও পুরো জিগজ্যাগ ওয়েতে যাচ্ছে স্যার।" আত্রেয়ী নিরুপায়ভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "এভাবে তো একটাও গুলি লাগবে না।" দুষ্কৃতীর কাণ্ড দেখে অর্ণবও অবাক। বত্রিশ বছর পরেও এই লোকটার এত ক্ষমতা! এত শক্তি! এ বত্রিশ বছর আগের অপরাধীই তো! না কী অন্য কেউ! কী দুরন্ত গতিতে দৌড়চ্ছে! দু'জন হোমিসাইডের অফিসারও তার সঙ্গে দৌড়ে এঁটে উঠতে পারছে না। টিয়ার গ্যাস ক্যানিস্টারের আইডিয়াই বা মাথায় এল কী করে। এ লোকটা ঠিক কী জিনিস! অর্ণবের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। আরেকটু হলেই অধিরাজকে হারাতে যাচ্ছিল সে! লোকটাকে ছাড়বে না। কিছুতেই না। সে ফের ফায়ার করার জন্যই হাত তুলেছিল, কিন্তু তার আগেই একটা সুতীক্ষ্ণ ছুরি শনশন করে নির্ভুল লক্ষ্যে এসে বিধল তার কাঁধে। একেবারে মোক্ষম জায়গায় আঘাত। অর্ণবের বন্দুক ধরা হাত স্খলিত হয়ে যায়। কাঁধে অসম্ভব যন্ত্রণা। ব্যালান্স সামলাতে না পেরে সে সটান আছড়ে পড়ল পথের ওপরই। "স্যার!" -

আত্রেয়ী তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে অর্ণবের কাছে। তার কাঁধ বেয়ে রক্ত পড়ছে। অর্ণব অতিকষ্টে দেখল, আততায়ীও দাঁড়িয়ে পড়েছে। লোকটা বুঝতে পেরেছে, তার আর দৌড়নোর দরকার নেই। অর্ণব স্পষ্ট শুনতে পেল তার সেই রক্তজল করা খিক খিক হাসি। সে হাসতে হাসতেই তর্জনী তুলল অর্ণবের দিকে, "তোমাকে তো দেখে নেবই।"

(১৮)

এরপর রুদ্ধশ্বাস বাহাত্তর ঘণ্টা কাটল।

সি আই ডি হোমিসাইডে থমথমে পরিবেশ। কারোর মুখে কথা নেই। গোটা ডিপার্টমেন্ট অজানা আশঙ্কায় আছে। কিন্তু হাল ছাড়েনি। বরং প্রবল উদ্যমে বেবো ব্রিগ্যানজা এবং শেয়াল পন্ডিতকে খুঁজছে। সকলেই জানে যে তাদের হাতে বিশেষ সময় নেই। একটা অ্যাটাক অলরেডি হয়ে গিয়েছে। টিম অধিরাজ এখন রীতিমতো পালটা আঘাত করার জন্য ফুঁসছে। ব্যুরোর ফোনগুলো সবসময়ই বাজছে। খবরিরা আকাশ পাতাল এক করে বেবো আর সুমঙ্গলকে খুঁজতে ব্যস্ত। সব কেস ফেলে এখন 'সার্জিক্যাল স' কিলারের কেসটার পেছনেই সবেগে উঠে পড়ে লেগেছে ইনফর্মার নেটওয়ার্ক। অফিসার

আত্রেয়ী দত্ত আপাতত সুকোমল পান্ডেকে শ্যাডো করছে। সুকোমল পান্ডের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকেই সে রাতারাতি নতুন প্রতিবেশী হিসেবে আপাতত ঘাঁটি গেড়েছে এবং বাপ-ছেলেকে 'গৃহপ্রবেশ' উপলক্ষ্যে রীতিমতো নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে। 'গুড নেবার'-এর প্রমাণ হিসাবে মাঝে-মধ্যেই এটা-ওটা রান্না করে ও ফ্ল্যাটে চালান দিচ্ছে আর সুযোগ পেলেই খেজুরে আলাপ করতে বসে যাচ্ছে। বুদ্ধি ও ব্যবস্থাপনা অবশ্য অধিরাজেরই। তার মতে যে কোনও মানুষের হৃদয়ে ঢুকতে গেলে আক্রমণটা আগে পেটেই করতে হয়। এবং আত্রেয়ীর রান্নার হাত খাসা। বলাই বাহুল্য, মিস দত্ত ভবিষ্যতে 'সেরা প্রতিবেশী'-শ্রী পুরস্কারটা পেতেই চলেছে! তবে খুব সাবধানে বাপ-ছেলের সঙ্গে কথা বলছে সে। অধিরাজের নির্দেশ; কিছুতেই অ্যালার্ট হতে দেওয়া চলবে না। তাই অত্যন্ত সন্তর্পণে এগোচ্ছে।

সারা শহরের যত তান্ত্রিক, যত ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান আছে, সবাই আপাতত সি আই ডি হোমিসাইডের কল্যাণে হাজতবাসী। পবিত্র এবং অন্যান্য অফিসাররা যখন তাদের গ্রেফতার করেছিল, তখন তাদের চোদ্দগুষ্টিকে শাপশাপান্ত করে ছেড়েছে তারা। একজন তো হুমকিই দিয়ে ফেলে, "তোর সমূহ সর্বনাশ হবে। নরকের আগুনে পুড়বি।"

পবিত্রও ছাড়ার পাত্র নয়। লোকটার ঘাড় ধরে শূন্যে প্রায় একফুট উচ্চতায় নেংটি ইঁদুরের মতো তুলে ধরে বলেছিল, "আমি পরে পুড়বো। আগে তোকে পুড়িয়ে ভর্তা বানাই। তারপর দেখা যাবে।"

বত্রিশ বছর আগের যত গ্যাংস্টাররা বর্তমানে বেঁচে আছে, তাদেরও কিলোদরে পিটিয়ে পাট পাট করছে সি আই ডি, হোমিসাইড। অধিরাজের ধারণা, সম্ভবত অফিসার দাশগুপ্তকে শেষ করার জন্যই এই নৃশংস সিরিয়াল কিলিং শুরু হয়েছিল। তাই তৎকালীন হিস্ট্রিশিটারদের রীতিমতো তাদের গর্ত থেকে টেনে বের করে বেধড়ক মার মারছে তারা। সি আই ডি, হোমিসাইড যতখানি নিষ্ঠুর হতে পারে, ততখানিই হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ মুখই খুলছে না। সবারই এক কথা, "আমি কিছু জানি না"।

শহরে যত সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের দোকান ছিল, অন-লাইন, অফ-লাইন, প্রত্যেকটা জায়গাতেই রেড অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়েছে। নাইফ অ্যান্ড টুল শার্পনারের বিক্রির ওপরেও নজর রাখছে সি আই ডি। হসপিটালগুলোকেও সচেতন করা হয়েছে। খুনীর হাতে যাতে কোনওমতেই নতুন সার্জিক্যাল স বা শার্পনার না পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। ফরেনসিকও চেষ্টা করছে অন্তত একটা লিড বের করার। বত্রিশ বছরের পুরনো যত ফরেনসিক রিপোর্ট ছিল, তৎকালীন তোলা মৃতদেহগুলোর ছবি, মামলা চলাকালীন নিহতদের জামাকাপড় থেকে শুরু করে আরও যা যা জিনিসপত্র এক্সিবিট হিসাবে রাখা হয়েছিল, সব আমদানি হয়েছে ফরেনসিক ল্যাবে। আহেলি মুখার্জী পুরনো প্রমাণ ও রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। আর ডঃ চ্যাটার্জী পনেরোটি কুকুর-বিড়াল শাবক ও শ্যামলের পোস্টমর্টেমে ব্যস্ত। ক্লান্তি, শ্রান্তি নামক বস্তুটাই যেন নেই! দু'জনেই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অন্তত কিছু একটা লিড বের করার। কারণ দুই ফরেনসিক এক্সপার্টেরই জানা আছে; হাতে সময় নেই! খুনী অধিরাজকে একবার প্রায় কবজা করেই ফেলেছিল, দ্বিতীয়বার ছেড়ে কথা বলবে না। মিডিয়ার মধ্যেও এই অদ্ভুত সংগ্রাম প্রচণ্ড উত্তেজনার উদ্রেক করেছে। নিউজ পেপারের হেডলাইনে, নিউজ চ্যানেলের বুলেটিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সার্জিক্যাল স কিলারের বিষয়ে আলোচনা চলছে। মনস্তত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন, 'খুনী বদ্ধ

উন্মাদ। এবং সে নটোরিটি চাইছে। তার পক্ষে চূড়ান্ত নৃশংস হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।' কী করে কে জানে, খুনীর নৃশংস কাউন্টডাউন, স্লটার-হাউজের রহস্য জেনে গিয়েছে সাংবাদিকরা। গোটা শহর প্রচণ্ড আতঙ্কে প্রহর গুণছে। আমজনতার বুকের মধ্যে দুরুদুরু 'কী হয়... কী হয়' ভাব। অন্ধকার সরু গলির মধ্য দিয়ে কোনও অজানা মানুষকে চলে যেতে দেখলেও ভয় পাচ্ছে আমজনতা! দু'একজন হতভাগ্য পথিক শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সার্জিক্যাল স কিলার সন্দেহে তাদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনতা। নেহাৎ স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে গণপ্রহারে মারা যায়নি তারা, তবে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন জনতাকে শান্ত হওয়ার আর্জি জানাচ্ছে। নয়তো তাদের হাতেও কিছু নির্দোষের প্রাণ যাবে!

এদিকে রিপোর্টাররা আপ্রাণ চেষ্টা করছে অধিরাজের বাইট নেওয়ার। যেখানে আবার বত্রিশ বছর পর 'সার্জিক্যাল স' কিলার একইরকম বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের বাইটও জরুরি। কিন্তু আপাতত অধিরাজ পর্দানসীন। অর্থাৎ প্রেসের সামনে আসছেই না। তার অ্যাসোসিয়েটদের মধ্যে অফিসার পবিত্র আচার্য ও অর্ণব সরকারকে দেখা যাচ্ছে ঠিকই; কিন্তু তারাও একটি সংক্ষিপ্ত বুলিই আওড়াচ্ছে, "নো কমেন্টস।"

অধিরাজের মনের অবস্থা একমাত্র অর্ণবই জানে। যেদিন খুনীর সঙ্গে প্রকাশ্য এনকাউন্টার হয়েছিল, সেদিন থেকেই সে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছে। অর্ণবের একটাই আফসোস, ছুরির আঘাতে পড়ে না গেলে হয়তো লোকটাকে মেরেই ফেলত! অন্তত অমন হাত ফস্কে পালিয়ে যেতে পারত না।

সেদিন জখম, রক্তাক্ত কাঁধ নিয়েই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল অর্ণব। সঙ্গে আত্রেয়ী। পবিত্র বুদ্ধি করে ডঃ চ্যাটার্জীকে ফোন করেছিল বলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই চলে এসেছিলেন। অর্ণবের অবস্থা দেখে প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, "এ কী! তুমি তো ব্লিড করছ! এক্ষুনি হসপিটালে চলো।"

অর্ণব চোয়াল শক্ত করে মাথা নেড়েছিল। সে অধিরাজের দিকে তাকায়। এখনও অজ্ঞান হয়েই পড়ে আছে মানুষটা! শিশুর মতো অসহায়, বিপন্ন! এখন মরে গেলেও তার

পাশ থেকে কিছুতেই নড়বে না সে।

"আরে, অন্তত উন্ডটা দেখতে তো দাও! অ্যাট লিস্ট দেখি জখম কতটা গভীর।"

ডঃ চ্যাটার্জীর অনুরোধও কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে অর্ণব। নিজের আঘাত নিয়ে একটুও মাথাব্যথা নেই তার। বরং সে আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। অধিরাজের অত লম্বা দেহটাকে টেনেটুনে বিছানায় তুলেছে পবিত্র। জানলাগুলো সব খুলে দেওয়ার ফলে টিয়ার গ্যাসের প্রভাব নেই। তা সত্ত্বেও অধিরাজ বিছানায় ভারী অবিন্যস্তভাবে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। যেন তার কোনও কষ্ট হচ্ছে। অর্ণব পরম মমতায় তাকে ঠিক করে শুইয়ে দিল। সযত্নে তার মাথার তলায় বালিশও গুঁজে দেয়। তারপর গায়ের বেডকভারটাকে টেনেটুনে ঠিক করে গুছিয়ে দিয়েছে। ডঃ চ্যাটার্জী নীরবে অর্ণবের কাণ্ডই দেখছিলেন। সেও এবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের দিকে তাকায়। তার কণ্ঠে কাতর জিজ্ঞাসা, "স্যার, ওঁর এখনও জ্ঞান ফিরছে না কেন?" "অর্ণব, ওর মাথাটা যে এখনও ধড়ের ওপরেই আছে, আর আর্টারিগুলো কেটে ফর্দাফাঁই হয়ে যায়নি, এজন্যই ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ দাও। সেন্স ফিরবে ঠিকই। এ খুনী বিষ দেয় না।"

অর্ণব একটু ইতস্ততঃ করে। যেন প্রশ্নটা করবে কি না ভাবছে। ডঃ চ্যাটার্জী কি অন্তর্যামী! তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা যেন বুঝে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গেই। নীচুস্বরে বললেন, "নো। হি ইজ নট রেপড। বাট...।"

অর্ণব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে। তিনি সখেদে মাথা নাড়লেন, "কিন্তু সেক্সুয়ালি মলেস্টেড তো বটেই। তুমি আসার আগেই আমি চেক করেছি। দ্যাট সোয়াইন কিসড হিম ভেরি প্যাশনেটলি অ্যান্ড রিপিটেডলি। বেচারির গায়ে সাকিং এর ছাপ পর্যন্ত পড়েছে। সর্বাঙ্গে একটা জায়গাও বাকি নেই যেখান থেকে জনসনস বেবি ক্রিমের গন্ধ আসছে না! কনসেন্ট না নিয়ে এগুলো করাও অবশ্য রেপের পর্যায়েই পড়ে। আর যেখানে ভিকটিম আনকনশাস সেখানে কনসেন্টের গল্পই নেই। বাট টেকনিক্যালি, রেপড নয়।" বলতে বলতেই একটু সচকিত হয়ে বললেন, "পুরোপুরি শিওর না হলেও মনে হচ্ছে, ওকে হাই ডোজের প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামও ইঞ্জেক্ট করা হয়েছে। যার জন্য কিছু করতে পারেনি। নয়তো খুনীর চোয়ালটা চুমু খাওয়ার জন্য আস্ত থাকত না।"

“প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম!”

- “মনে হচ্ছে ওটাই।” ডঃ চ্যাটার্জী অধিরাজকে দেখিয়ে বললেন, “লাস্ট যখন দেখেছিলাম তখন ওর ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছিল। এখন দেখো, খুব শান্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে।”

অর্ণব লক্ষ্য করল সত্যিই তাই। এখন অধিরাজের বুকের ওঠাপড়া একদম স্বাভাবিক। আগের টেনসনটা নেই।

- “রাজা যখন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে যায় বা স্ট্রেসড হয়, তখন ওর মাসলগুলোও স্বাভাবিকভাবে টেনসড হয়ে যায়। বুকের পেশীগুলোয় ক্র্যাম্প ধরে, স্প্যাজম হয় যার ফলে সমস্ত চাপ গিয়ে পড়ে লাংসের ওপর। যেহেতু লাংসটা এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠার সময় পায়নি, তাই চাপটা নিতে পারে না; ব্রিদিং ট্রাবল হয়।” তিনি বুঝিয়ে বলেন, “কিন্তু প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম মাসল রিল্যাক্সিং ড্রাগ যার জন্য ওর মাসলগুলোও রিল্যাক্সড হয়ে গিয়েছে। ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে না।”

“কিন্তু এভাবে উনি কতক্ষণ অসাড় হয়ে পড়ে থাকবেন!” অর্ণবের চোখে প্রায় জল চলে আসে, “আমি ওঁকে এরকম হেল্পলেস অবস্থায় আর দেখতে পারছি না!”

— “এমনিতে প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের প্রভাব কাটতে দেড় ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে। তবে তোমার ভয়ের কিছু নেই। একটু দাঁড়াও।” বলতে বলতেই তিনি ফরেনসিক কিট ব্যাগ থেকে একটা সিরিঞ্জ আর একটা ভায়াল বের করে আনলেন, “আমার মনে হয়েছিল যে প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের প্রয়োগ ঘটার চান্স প্রবল। আহেলিকে এমনি এমনি পাঠাইনি। ও সঙ্গে প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের অ্যান্টিডোট এনেছিল। কিন্তু দেওয়ার সুযোগ পায়নি। পরিস্থিতি এমনই যে কেউ কিছু করতে পারেনি। তবে এখন করা যাবে।”

“এটা কী?” -

তিনি অভ্যস্ত হাতে ভায়াল থেকে তরল টেনে নিলেন সিরিঞ্জে। ইঞ্জেকশনটা পুশ করতে করতে বললেন, “নিওস্টিগমাইন। প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের অ্যান্টিডোট। মাসল রিল্যাক্সিং ড্রাগকে এটা এনকাউন্টার করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসলগুলো কাজ করতে শুরু করবে।

ওষুধটাকে একটু সময় দাও। ততক্ষণে তুমি আহেলিকে বলো অ্যাটলিস্ট তোমার কাঁধের কিছু ব্যবস্থা করতে। আমি আর পবিত্র এখানে আছি।"

অর্ণব তবু অধিরাজকে ছেড়ে যেতে চায় না। সে এখন মানুষটাকে আর কারোর হাতে ছাড়তেই রাজি নয়! ডঃ চ্যাটার্জী বাধ্য হয়েই এক ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি যদি বাইরে না যাও, তবে আমি আহেলিকে লজ্জার মাথা খেয়ে এখানেই ডাকব। আর রাজা যদি জানতে পারে ও যখন আনকনশাস হয়ে প্রায় হাফ এক্সপোজড অবস্থায় পড়ে ছিল, তখন আহেলি ওর বেডরুমে ঢুকেছে; তবে তোমার মুণ্ডুপাতই আগে করবে।" এবার ওষুধ কাজ করল। অর্ণব একটিও কথা না বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফের এসে হাজির। তার শার্টের তলায় উঁকি মারছে সাদা ড্রেসিং। আহেলি ঘরে না ঢুকে বাইরে থেকেই নীচু স্বরে জানায়, "আমি উন্ড পরিষ্কার করে ড্রেসিং করে দিয়েছি। তবে স্টিচ দিলে বেশি ভালো হত।"

"নো... নো...!"

আহেলি আরও কিছু বলার আগেই অধিরাজের মাথা আস্তে আস্তে দু'পাশে নড়ল। হাতের আঙুল কাঁপল। ডঃ চ্যাটার্জী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন, সে এমনভাবে মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছে, যেন কাউকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। একমুহূর্ত স্থির থেকেই ফের ছটফট করে উঠল, "নো! লিভ মি!"

"ব্যস।" চাপা স্বরে বললেন তিনি, "এই ভয়টাই ছিল। ও সব ফিল করতে পেরেছে!"

অর্ণব আফসোসে চোখ বুজে ফেলল। সে বুঝতে পেরেছে, এই ব্লান্ডারটা কিছুতেই চাপা যাবে না! অধিরাজের হাবেভাবেই স্পষ্ট, সে কাউকে বাধা দিতে চাইছে। অর্থাৎ অত্যাচারের কিছুটা ঠিকই টের পেয়েছে।

"অর্ণব।" ডঃ চ্যাটার্জী উঠে দাঁড়ালেন, "এবার সব তোমার হাতে বস। লক্ষ্য রেখো যেন বেশি উত্তেজিত না হয়ে ওঠে। আমাদের কারোর কথা শোনার লোক ও নয়। হি ইজ অল ইওর্স নাও! কিন্তু একটা মারাত্মক ব্লাস্টের জন্য প্রস্তুত থেকো।"

তিনি আরেকবার অধিরাজের দিকে তাকালেন। সে এখন যেন কোনও অনভিপ্রেত অস্তিত্বের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করছে। একটা ঝুঁকে পড়া অদৃশ্য মুখকে

হাত দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইছে। ডঃ চ্যাটার্জী একটু থেমে বললেন, "আমার সিক্সথ সেন্স বলছে ও প্রথমেই লাফ মেরে উঠে বসতে চাইবে। স্প্যাজম হলে কিন্তু মুশকিল। ওকে শান্ত করার দায়িত্ব তোমার! কারণ যখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তখন তার জ্বালাকে একমাত্র সমুদ্রই ঠান্ডা করতে পারে। কাব্যিক হওয়ার জন্য সরি। কিন্তু বোধহয় বুঝতে পেরেছ; কী বলতে চাইছি।"

"নোটেড স্যার।"

"তোমার ডাক্তারি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে না? ইঞ্জেকশন দিতে পারো?" অর্ণব মাথা নাড়ে। সে তার বাবাকে প্রায়ই ইনসুলিন দিয়ে থাকে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার অভ্যাস তার আছে।

এটা রাখো। সেডেটিভ।" ডঃ চ্যাটার্জী একটা সিরিঞ্জ রেডি করে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "যদি দেখো, পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে, তবে কোনওরকম ভাবনা চিন্তা না করে বসিয়ে দেবে।" ডঃ চ্যাটার্জী আর পবিত্র আচার্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অর্ণব অধিরাজের পাশে বসে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অসীম ধৈর্য আর নীরবতার সঙ্গে অপেক্ষা করছে, কখন সে হুঁশে ফিরবে। তার অস্থিরতা আস্তে আস্তে বাড়ছে। কাঁধের, হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। অস্পষ্ট শব্দগুলো স্পষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ নিওস্টিগমাইন কাজ করছে।

"নো... ইউ স্কা-উ-ড্রে-ল!"

"তবে

বলতে বলতেই অবিকল ডঃ চ্যাটার্জীর কথা মতোই লাফ মেরে বিছানার ওপর উঠে বসতে চাইল অধিরাজ। তার আগেই তাকে ধরে ফেলেছে অর্ণব, "স্যার! প্লিজ, রিল্যাক্স।"

তার যা রি-অ্যাকশন হল তা অভাবনীয়। অধিরাজ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো প্রায় ছিটকে গেল অর্ণবের আলিঙ্গন থেকে। যেন কোনও ভয়ঙ্কর মানুষের কবল থেকে বেরোনোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। বিহ্বল ও উদভ্রান্তভাবে বলল, "কে! কে!"

অর্ণব আস্তে আস্তে বলে, "আমি অর্ণব।"

-"অর্ণব!" তার অর্ণবের দিকে লক্ষ্যই নেই। সে উন্মত্তের মতো এদিক ওদিক তাকায়, "ঐ স্কাউড্রেলটা কোথায়! পেছন থেকে অ্যাটাক করেছিল শয়তানটা। ব্লাডি কাওয়ার্ড! কোথায় গেল!" -

"স্যার। ও এখন এখানে নেই।" অর্ণব তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল, কিছু হয়নি। আমরা সবাই এখানে আছি।" -

"কিচ্ছু হয়নি মানে! হতে কী ...কী বাকি আছে! আর কী বাকি!" উন্মত্ত রাগে কাঁপছে অধিরাজ, "ওই নোংরা লোকটা আমায়...ও আমায় ছু ছুঁ... ছুঁয়েছে। ঘেন্নায় মরে যাচ্ছি আমি...! আই উইল কিল দ্যাট সান অফ আ...!"

"স্যার। প্লিজ। আমার কথা শুনুন!"

রাগের চোটে শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না অধিরাজ। অর্ণব তার অবস্থা দেখে তাকে আবার ধরতে গেল। কিন্তু অধিরাজ এবার জোরালো একধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়েছে! গর্জন করে উঠে বলল, "ছোঁবে না! একদম ছোঁবে না! আমি... আমি...! ইচ্ছে করছে নিজেকেই আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই! লোকটা আমায়... আমায়...!"

বলতে বলতেই এতক্ষণে তার দৃষ্টি অর্ণবের কাঁধের দিকে পড়েছে। সে যেন এবার একটু থমকে যায়। সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, "তোমার কাঁধে রক্ত কেন!"

অর্ণব মুখ নীচু করে বসে থাকে। অধিরাজকে এমনিতেই এখন অপ্রকৃতিস্থ লাগছে। উস্কো খুশকো চুলে, মুখের হিংস্রতায়, চোখের অস্থিরতায় তাকেই মানসিক রোগী মনে হয়। ভয় হয়, এখনই কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে। সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "এক্সপ্লেইন মি অর্ণব!"

অর্ণব আস্তে আস্তে সব কথা খুলে বলল। অধিরাজের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। সে খণ্ডমুহূর্ত অর্ণবের দিকে তাকিয়ে থাকে। অর্ণব সভয়ে দেখল তার দু'চোখ আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। যেন চোখের ভেতরে রক্ত জমছে। কপাল আর ঘাড়ের শিরা ফুলে ফুলে উঠছে। অর্ণবকে কে মেরেছে, কেন মেরেছে সব শুনে গুম মেরে গেল। কিন্তু মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট যে তার মাথায় প্রচণ্ড রাগ দানবের মতো নাচছে।

- "স্যার। আমি ঠিক আছি। আপনি প্লিজ রেস্ট...।"

অর্ণব আরও কিছু বলার আগেই তার গালে ঠাস করে সপাটে এক চড় এসে পড়ল! এই প্রতিক্রিয়ার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিল না সে। অধিরাজ আজ পর্যন্ত কখনও তাকে একটা কড়া কথাও বলেনি, মারা তো দূর ! অথচ এবার কষিয়ে এক থাপ্পড় মেরে দিল!

"তুমি নিজেকে কী ভাবো!" কানের কাছে যেন বাজ পড়ল, "ওরকম একটা শয়তানের পেছনে একা একা দৌড়চ্ছিলে! ছুরিটা যদি কাঁধে না লেগে বুকে লাগত!"

"একা নয়!" অর্ণব অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে, "মিস দত্তও ছিলেন তো।"

"হ্যাং ইওর মিস দত্ত ! মিস দত্ত ছুরিটাকে ঠেকাতে পেরেছেন! তোমার কিছু হলে মিস দত্তের কী! মরতে কেন ফিরে এসেছিলে তুমি?"

– "নয়তো লোকটা আপনাকে...!"

– "কী করত! মেরে ফেলত!" অধিরাজের উত্তেজনা বিপদ সীমা ছুঁয়ে ফেলেছে, "মরে যেতে দিতে! তাতে কারোর কোনও ক্ষতি হত না। কিন্তু তোমাকে মাঝখানে আসতে কে বলেছে? অর্ণব! ইউ স্টু-পি-ড!"

রাগের মাথায় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ফের আরেকটা চড় মারতেই যাচ্ছিল সে। অর্ণব এক ফোঁটাও নড়ল না। শুধু চোখ খুঁজে ফেলল। তাকে একডজন চড় মেরেও যদি লোকটা শান্ত হয়, তবে তাই সই। কিন্তু আশ্চর্যের বিয়, আর কোনও আঘাত এসে পড়ল না! বরং একটা উষ্ণ স্পর্শে সে বিশিষ্ট হয়ে চোখ খুলে তাকাল। অধিরাজ বাচ্চা ছেলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার কাঁধে মুখ গুঁজে আবেগে থরথর করে কাঁপছে। যেন কাঁদতে চাইছে, অথচ পারছে না ।

"স্যার!"

"অর্ণব! ইউ ফু-ল!" অধিরাজ নিজেকে সামলানোর প্রচণ্ড চেষ্টা করতে করতে বলল, "বোকার মতো কী করে বসলে তুমি! আমি জানতাম এটাই হতে চলেছে। ঐ খুনী তখনও টের পায়নি যে আসল বাধা বাবু বা শ্যামল নয়। কখনই ছিল না! যে লোকটা দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের মতো ওর পথ আটকে রেখেছে, সে শুধু তুমি! আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারবে তুমিই সবচেয়ে বড় থ্রেট, অমনিই

তোমাকে সরানোর চেষ্টা করবে। ও ভীষণ নৃশংস অর্ণব। অসংখ্য প্রাণ নিয়ে নিয়েছে! সেইজন্যই তোমাকে প্রায় গালাগালি দিয়ে তাড়াতে বাকি রেখেছিলাম। আর এখন ও তোমাকে চিনে গিয়েছে! যতদূর ওকে বুঝেছি, এরপর তোমার নম্বর আসছে! ও কাউন্টার অ্যাটাক করবেই। আমি কী করব!... আমি এখন কী করব...!" অধিরাজ ফের ছেলেমানুষের মতো অস্থির হয়ে ওঠে। তার দু'চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, "এটা কী করলে তুমি! ওঃ অর্ণব!" ঐ "ওঃ" শব্দটার মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত উদ্বেগ, সমস্ত স্নেহ, মমতা ঝরে পড়ল। অর্ণব তাকে সামলানোর চেষ্টা করে।

"আমি ওকে ভয় পাই না।"

"কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি! এখন তুমি ওর টার্গেট! আমায় ওকে আটকাতে হবে! যে করেই হোক...!" বলতে বলতেই সে প্রায় টলেই পড়ে যাচ্ছিল। দরদর করে ঘামছে। অর্ণব তাকে ধরে ফেলে সযত্নে শুইয়ে দেয়। অধিরাজের দেহ ফের শিথিল হয়ে আসছে। এতখানি উত্তেজনা নিতে পারেনি। চোখ ভারী হয়ে আসছে। তবু সে অতিকষ্টে অর্ণবের হাত চেপে ধরে, "কখনও আমার চোখের আড়াল হবে না অর্ণব। পৃথিবী গোল্লায় যাক। তুমি চব্বিশ ঘণ্টা আমার সঙ্গে থাকবে। তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তবে আমি তো এমনিই...!"

সম্ভবত বাক্যটা তো এমনিই মরে যাব।' কিন্তু তার আগেই থেমে যায় অধিরাজ। অত্যন্ত ক্লান্তিতে তার চোখ বুজে এসেছে। কিন্তু অসমাপ্ত পংক্তিটার অর্থ উদ্ধার করতে অসুবিধে হয়নি। আগে কখনও এই মানুষটা তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেনি। আজ আবেগঘন ও দুর্বল মুহূর্তে যেটুকু বেরিয়ে এল, তাতেই স্পষ্ট অর্ণবের স্থান হৃদয়ের ঠিক কোথায়। অর্ণব তার কপালে সযত্নে হাত রাখল। তার চোখ ভিজে এলেও একটু হাসার চেষ্টা করল, "আপনি রেস্ট নিন স্যার। আমি এখানে আছি। কোথাও যাচ্ছি না। স্পেশ্যাল ওয়ান, ডু ইউ রিমেম্বার?"

অধিরাজের ঠোঁটে একটু ম্লান হাসি ভেসে ওঠে। স্খলিত স্বরে জানাল, "ইয়েস, আই ডু!"

তারপরই ফের আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসে তার। অর্ণব আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর শ্বাস টানার শব্দ শুনে বুঝল, অধিরাজ ঘুমিয়ে

পড়েছে। সে উঠে দাঁড়াতেই যাচ্ছিল, তার আগেই বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ডঃ চ্যাটার্জীর গোলাকার মুণ্ডু উঁকি মারে, "তালি তো দু'হাতেই সমান বাজছে দেখছি।"

অর্ণব একটু লাল হয়ে উঠলেও জবাব দিল না। বুড়ো তার মানে এতক্ষণ কান পেতে সব শুনছিল। তিনি এবার বিন্দুমাত্রও অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছেন, "বসের পারমিশন তো পেয়ে গিয়েছ! এখন আমার ভিসাটাও পটিয়ে পাটিয়ে বের করো দেখি।"

"মানে!" অর্ণব চোখ কপালে তুলে ফেলেছে, "আপনিও...!"

- "হ্যাঁ হ্যাঁ!" বিরক্ত হয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ো, "আমিও তোমাদের সঙ্গে লিভ টুগেদার করছি। আপাতত ল্যাবে যাচ্ছি। কিন্তু কাজ হয়ে গেলেই ফিরে আসব। সময় হাতে প্রায় নেই। রাজা যখন জেদ ধরেছে তখন সিকিউরিটি তুলেই ছাড়বে। অবশ্য যা অপদার্থ সিকিউরিটি দেখছি, তাতে থাকার চেয়ে না থাকাই মঙ্গল। আহেলি, মিস দত্ত আর পবিত্রকে ও অ্যালাউ করবে না। কিন্তু আমি সিরিয়াসলি বুঝতে পারছি একজন ফরেনসিক এক্সপার্টের এখানে থাকা দরকার। প্রথমত, তুমিও জানো, আমিও জানি যে যথেষ্ট সময় হাতে নেই। দ্বিতীয়ত, একবার প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের প্রয়োগ ঘটে গেলেও দ্বিতীয়বার যে ঘটবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। তৃতীয়ত...।" ডঃ চ্যাটার্জী ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করেছেন, "তোমাদের দু'জনের মধ্যে যা প্রেম দেখছি তাতে একটুও বিশ্বাস নেই! একেই ফাঁকা বাড়ি, তার ওপরে দু'জনেই হয়তো এক রুম শেয়ার করবে। তাই আমি কাবাবের মধ্যে হাড্ডি হয়ে জমিয়ে বসছি। গট মাই পয়েন্ট?"

"ইয়েস স্যার।"

অর্ণব এবার অধিরাজের ওয়ার্ডরোব হাতড়ে হাতড়ে একটা সিল্কের স্লিপিং গাউন বের করে এনেছে। ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি একটু স্যারকে তুলে ধরার চেষ্টা করুন। আমি এটা পরিয়ে দিই।"

"মানে!" বুড়ো প্রায় তিড়িং করে ওঠে, "এই আইফেল টাওয়ারকে তুলতে গেলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না অর্ণব। তার চেয়ে তুমি বরং বুলডোজার আনাও।"

অর্ণব কথা না বাড়িয়ে অধিরাজকে বেশ খানিকটা টেনে তুলল। তারপর একরকম ডঃ চ্যাটার্জীর কোলে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলল, "ধরে রাখুন।"

ডঃ চ্যাটার্জীর ঘাড়ে ছ'ফুট চার ইঞ্চির সবল ভারী একখানা জবরদস্ত শরীর! চাপের চোটে প্রায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কোনওমতে হেঁচকি তুলে বললেন, 'তোমাদের প্রেমপর্বে বাধা দিচ্ছি বলে এমন রিভেঞ্জ নিচ্ছ!"

"ভিসা চাই কি না!"

ডঃ চ্যাটার্জীর মুখের ভাব ফের অ্যাংরি বার্ড গোছের হলেও মুখে কিছু বললেন না। অর্ণব মনে মনে হাসতে হাসতেই অধিরাজকে গাউনটা পরিয়ে দেয়।

ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বোধহয় একটু ভয়ে ভয়েই ছিলেন যে হয়তো অধিরাজ তাঁকেও তাড়ানোর জন্য তেড়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ঘটল না। বরং সে অর্ণবের কাছে তাঁর দরবার শুনে খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "ফাইন। থাকুন।"

সিকিউরিটি যথারীতি সরে গেল। বাড়ির কুককেও কিছুদিনের জন্য আসতে বারণ করা হল। অধিরাজের বাবা যথেষ্ট ধনবান হলেও চূড়ান্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী। তাই চাকর বা দাসদাসী রাখার ঘোরতর বিরোধী। নেহাৎ অধিরাজের মায়ের চোখ রাঙানির সামনে জব্দ হয়ে কুক রেখেছেন। নয়তো সেটাও হত না। ছেলের বডিগার্ড আর গেট কীপারদেরও নেহাতই বিপদে পড়ে সহ্য করেছেন। তাদেরও সবার ছুটি হল। এইমুহূর্তে আর কোনও লাশ চায় না অধিরাজ।

তবে অধিরাজের বাবা-মা এই মুহূর্তে বাড়িতে উপস্থিত না থাকলেও দিন রাত ছেলেকে ফোন করছেন। অধিরাজ যে কী পদার্থ তা তারা ভালোই জানেন বলে দু' মিনিট ছেলের সঙ্গে কথা বলেই বলছেন, "ফোনটা অর্ণবকে দে তো।" আপাতত তাদের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে অর্ণবের নাভিশ্বাস উঠছে। কিন্তু সে স্বভাবগত ধৈর্য আর স্থৈর্যে তাদের যতখানি অভয় দেওয়া যায়, দিচ্ছে।

খুনী আর কোনও লাশ ফেলেনি। কিন্তু সে যে কাউন্টডাউন চালিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল পাঁচিলের গায়ে রঙিন আট, সাত, ছয় লেখায়। অধিরাজের ডিডাকশন সঠিকই ছিল। খুনী কোনওরকম বাধা না পাওয়ার ফলে আর কোনও হত্যা করেনি। তবে অধিরাজ পর্যন্ত পৌঁছনোর বিশেষ চেষ্টাও করছে না। চেষ্টা করলেও সফল হত না। কারণ

এই মুহূর্তে একটি মানুষ রিভলবার হাতে নীরব সংকল্পে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষটিকে টপকে যাওয়া অত সহজ নয়।

অধিরাজের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন সবারই চোখে পড়েছে। কেউ তাকে অতর্কিতে স্পর্শ করলেই অদ্ভুতভাবে রিঅ্যাক্ট করছে। ডঃ চ্যাটার্জী একবার পেছন থেকে তার কাঁধে হাত রেখেছিলেন। সে তড়িৎগতিতে ছিটকে সরে গিয়েছিল। শুধু ডঃ চ্যাটার্জীই নন, যে কোনও মানুষ অতর্কিতে তার ধারে কাছে গেলেও এমনভাবে আঁতকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে যাচ্ছে যেন মানুষ নয়, কোনও রাক্ষস তেড়ে আসছে।

“আশ্চর্যজনকভাবে সে ভীষণ চুপচাপও হয়ে গিয়েছে। অনেক খোঁচাখুঁচি করার পর একটা উত্তর দিলেও বেশিরভাগ সময়ই সেটা ‘হুঁ’ আর ‘হ্যাঁ’-এর বেশি কিছু হয় না। শ্যামলের মৃত্যু আর তার ওপর আক্রমণের পরদিন একটু সুস্থ হয়েই সে সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে বসে গিয়েছিল। এখনও বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটাই দেখছে। বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে একই ফুটেজ দেখে কিছু একটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। বৈঠকখানায় শ্যামলের খুনটা তাকে করতে দেখাও গেছে, কিন্তু কোনওমতেই লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ফুটেজ দেখে অর্ণব স্তম্ভিত। অধিরাজ খুব নিস্পৃহভাবে শ্যামলের হত্যাকাণ্ড দেখছে। কিন্তু অর্ণব কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। এ কীরকম খুনী! সিসিটিভিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটা অবিকল ইঁদুরের মতো গুঁড়ি মেরে পাইপ বেয়ে, কার্নিশ টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে! সে এতদিন জানত, এই স্পেশ্যালিটিটা শুধুমাত্র অধিরাজেরই আছে। এখন জানল, খুনীও কম যায় না। এতটাই সতর্ক যে একবারের জন্যও তার মুখ দেখা যায়নি। মাস্টার বেডরুমে কোনও সিসিটিভি নেই। সুতরাং অধিরাজের বেডরুমের ফুটেজ পাওয়া যায়নি। সত্যিই জেরি! ভয়ঙ্কর এক বুদ্ধিমান ইঁদুর!

(১৯)

“এ পাবলিক - যদি বত্রিশ বছর আগের লোকটাই হয়ে থাকে, তবে তার কমপক্ষে এখন আপনার বয়েসি হওয়ার কথা স্যার।” অর্ণব ডঃ চ্যাটার্জীকে উদ্দেশ্য করে বলে, “তাহলে এতখানি ফিটনেস কী করে সম্ভব?”

“আমায় আনফিট বলছ!” তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন, “শোনো চাঁদু, তোমাদের মতো মুগুর ভাঁজা বডি না থাকলেও আমি এখনও একাই দশজনকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিতে পারি।”

অধিরাজ নির্লিপ্তভাবে বলে, “একটু বেশিই হল না!”

“আচ্ছা ঠিক আছে।” ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন, “অ্যাট লিস্ট পাঁচজন...!” কথাটা শেষ করার আগেই দেখলেন অধিরাজ পূর্ণদৃষ্টিতে তাকেই দেখছে। তার দৃষ্টিতে বিরক্তি স্পষ্ট।

“ওকে ফাইন! আমি পারব না। কিন্তু এই লোকটা পারে। পাগল আর শয়তানের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনওরকম ধারণা নেই তোমার অর্ণব।” ডঃ চ্যাটার্জী উত্তর দিলেন, “এ লোক যে ঠিক কোন লেভেলের পাগল আর শয়তান তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।”

অধিরাজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চোখ কুঁচকে তাকায়। ডঃ চ্যাটার্জী তার হাতে একগাদা ফটো ধরিয়ে দিয়েছেন, “কুকুর আর বিড়ালছানার কাটা মাথাগুলো লক্ষ্য করে দেখো। একটারও গোঁফ নেই! লোকটা বসে বসে সব গোঁফ কেটেছে! এখন বুঝতে পারছ; এ কী জিনিস! ওর পক্ষে সব সম্ভব।”

“বিড়ালছানার গোঁফ থাকে!” অর্ণব অবাক, “বড় বিড়ালের থাকে জানি। কিন্তু বাচ্চারও...।”

“না! থাকে না! বিড়ালছানারা রীতিমতো রেজার আর ফোম দিয়ে শেভ করে।” ডঃ চ্যাটার্জী খ্যাঁক করে ওঠেন, “অসহ্য! রাজা, তোমার রিভলবারটা দাও দেখি!” -

অধিরাজ তাঁর দিকে একটু বিরক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকায়, “কী হবে?”

“হয় অর্ণবের মাথায় গুলি মারব, নয় নিজের টাকে!” তিনি গরগর করেন, “বিড়ালছানাদের গোঁফ থাকে না; এ থিওরি শোনার আগে সুইসাইড করাই ভালো।”

অন্যসময় হলে অধিরাজ হেসে ফেলত। অথচ এখন তার মুখের একটি পেশীও প্রসারিত হল না। সে শীতল কণ্ঠে বলে, “কোনও কাজের কথা আছে? বিড়ালের গোঁফ ছাড়া অন্য কোনও টপিক?”

- “হ্যাঁ”। তিনি মাথা ঝাঁকালেন, “তোমার সন্দেহই সঠিক। আমি আর আহেলি রীতিমতো জুম করে করে আগের লাশগুলো দেখেছি। প্রথম পাঁচটা খুন ট্রায়ালই ছিল। খুনীর হাত প্রথম দু'জনের ক্ষেত্রে বেশ কেঁপেছে। স্ট্রোক ঠিক করলেও একদম ক্লিন নয়। একটু এদিক ওদিক আছে। বত্রিশ বছর আগে ফরেনসিক এক্সপার্টরা এটা ওভারলুক করেছিলেন। কিন্তু তিন নম্বর লাশটায় কাটাটা খানিকটা ক্লিয়ার। চার আর পাঁচ একদম পারফেক্ট। ফরেনসিক ‘কাট’ এর জায়গাটা ওভারলুক করলেও এটা বলেছে যে প্রথম দু'জনের ক্ষেত্রে দুবার ইঞ্জেকশনের দাগ পাওয়া গিয়েছে। মানে খুনীকে দুবার ইঞ্জেক্ট করতে হয়েছে। পরের তিনজনের ক্ষেত্রে একবারই। অর্থাৎ শুধু স’ নয়; প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের সঠিক ডোসেজের ট্রায়ালও চলছিল। সম্ভবত লোকটা র‍্যান্ডামলি ভিকটিম সিলেক্ট করেছিল।”

“না।” এবার আপনমনেই মাথা নাড়ল সে, “ব্যাপারটা অত সহজ নয় ডক। ইনভেস্টিগেটিং অফিসাররা প্রত্যেকেই ম্যানলি। অফিসার দাশগুপ্ত ছোটখাটো চেহারার হলেও স্কেলিটন স্ট্রাকচার বেশ চওড়া। আর তার আগের পাঁচজনকে দেখুন। প্রত্যেকেরই একইরকম স্কেলিটন স্ট্রাকচার। সার্জিক্যাল স’টা এই জাতীয় চওড়া বা গাঁট্টাগোট্টা মানুষকে কাটতে পারবে কি না, কিংবা প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের কতটা ডোজ তাদের অবশ করার জন্য যথেষ্ট সেটা দেখার জন্যই প্রথম পাঁচজনকে সে বেছেছিল।”

বলতে বলতেই সে ভিকটিমদের ছবিগুলো তাসের মতো বিছিয়ে দেয়, “এই দেখুন, এক্স আর্মি অফিসার আর বাউন্সারের চেহারা। দু'জনেই ছ'ফুট লম্বা, ওজন প্রায় আশি-বিরাশি কেজি, ঠিক তারপরই প্রথম আর দ্বিতীয় ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে দেখুন। একদম সেম ডিল-ডল! ওজনও এক! গুন্ডা আর কুস্তিগীর দু'জনেরই দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি,

ওজন পঁচাত্তর কেজি। তৃতীয় ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের হাইট আর ওজনও সেম! ডাক্তারের হাইট পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি-ওজন সত্তর কেজি, অফিসার দাশগুপ্তও পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চি, ওজন বাহাত্তর কেজি। এতখানি মিল কি আপনার নিতান্তই কো-ইনসিডেন্স মনে হচ্ছে?"

- "কী সর্বনাশ!" ডঃ চ্যাটার্জীর মাথায় যেন বজ্রপাত হল, "তার মানে

সে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য একই ডিল-ডলের ডামি খুঁজছিল!" "রাইট। ও পাবলিক আদৌ র‍্যান্ডম প্রথম পাঁচজনকে বাছেনি। অনেক দেখেশুনে বেছেছিল। এবং তার কাছে ঐ পাঁচজনই ট্রায়াল দেওয়ার জন্য ডামি ছিল। যেমন ফাঁসি দেওয়ার আগে দড়ির ক্ষমতা দেখে নেওয়ার জন্য আসামীর হাইট আর ওয়েটের ডামি ইউজড হয়, তেমনই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে জীবন্ত ডামি বেছে নেওয়া হয়েছে। এবং তাদের ওপরই সার্জিক্যাল স এবং প্যাংক্যুয়োরোনিয়ামের ডোসেজের ট্রায়াল দিয়েছে।"

– "ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন রাজা!" ডঃ চ্যাটার্জী কোনওমতে বললেন, "একটাই আশার কথা, তোমার হাইটের ডামি পেতে ওর প্রাণ যাবে।"

- "আমি তো পরে ডক!" অধিরাজের কপালে চিন্তার ভাঁজ, "খুনীকে যতটুকু বুঝেছি সে এবার ডেলিবারেটলি অর্ণবের হাইটের ডামি খুঁজবে। অবশ্য খোঁজার দরকারই নেই, অলরেডি ওর ডামির ওপর সে ট্রায়াল দিয়েও ফেলেছে।"

"হোয়াট! কী বলছ!"

— "ঠিকই বলছি।" সে আস্তে আস্তে বলল, "আমি খুনীকে কিছুটা হলেও বুঝতে পারছি। সে অত্যন্ত রিভেঞ্জফুল। আমাকে সে প্রায় মেরে ফেলতেই যাচ্ছিল। অন্তত আধমরা করেই ছেড়েছিল। কিন্তু অর্ণব মাঝখানে পড়ে সব ভেস্তে দিল। শুধু তার প্ল্যান বরবাদই করেনি, লোকটাকে তাড়া করেছিল, ফায়ারও করেছিল। ও অর্ণবকে ছাড়বে না। আমার মন বলছে, ও এবার অর্ণবকেই অ্যাটাক করবে। আর অর্ণবের হাইট আর ওয়েট, ডিল-ডল সবটাই গুন্ডা, কুস্তিগীর আর তৃতীয় ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সঙ্গে মেলে। মানে খুনীর আর ডামির দরকার নেই। ও অলরেডি হাত পাকিয়ে ফেলেছে। এখন শুধু আক্রমণের অপেক্ষা।"

এরকম ভয়ঙ্কর প্রত্যাঘাতের আশঙ্কায় প্রায় হতবাক হয়ে গেলেন ডঃ চ্যাটার্জী। স্খলিতস্বরে বললেন, "তুমি আর কী কী বুঝতে পেরেছ একটু বলবে?"

"খুব বেশি কিছু যে বুঝতে পেরেছি তা বলতে পারছি না। তবে এইটুকু ক্লিয়ার যে লোকটার মেইন টার্গেট আদৌ ঐ পাঁচজন ছিলই না। ওটা শুধু ট্রেলার। দুটো কারণে এই লোকগুলোকে মারা হয়েছে।" অধিরাজ ছবিগুলো সরিয়ে রেখে বলল, "প্রথমত লোকটা পাগলই হোক, কী শয়তান; সে উইদাউট এনি ট্রায়াল কোনও কাজ করে না। তার বুদ্ধির তারিফ নাও করে পারছি না। সে রীতিমতো বসে বসে ডামি বেছেছে। এর থেকে দুটো জিনিস বোঝা যায়। সে রীতিমতো বুদ্ধিমান মানুষ। নয়তো শুধুমাত্র একটা লোককে চোখে দেখে তার ডিল-ডল, হাইট, ওয়েট আন্দাজ করা মুশকিল। খুনী নিশ্চয়ই প্রত্যেক ভিকটিমকে মিজারিং টেপ দিয়ে বা ওজন মাপার যন্ত্রে তুলে মাপেনি। চোখের আন্দাজেই নিখুঁত বুঝে নিয়েছে যে ভিকটিমের হাইট, ওয়েট কত হতে পারে। এক্সপার্ট আইজ। এবং প্রত্যেকটি ভিকটিমের কাছে তার অ্যাক্সেস ছিল। ডাক্তার আর এক্স আর্মি অফিসার বা কুস্তিগীরের অ্যাক্সেস যে কোনও সাধারণ মানুষের থাকতেই পারে, কিন্তু গুন্ডা, আর বার বাউন্সার! এই দু'জনের অ্যাক্সেস পাওয়া অত সহজ নয়! কিন্তু আমাদের খুনীর গতিবিধি সেসব জায়গাতেও অবাধ যেখানে অন্তত উনিশশো সাতাশি সালে খুব কম লোকই পৌঁছতে পারত। তখন নাইট ক্লাব বা বার থাকলেও সাধারণ মানুষের সেখানে যাওয়ার প্রবণতা ছিল না। হ্যাবক চান্স আছে, লোকটার আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে কোনও কানেকশন আছে। অথবা...!"

"অথবা?"

ডঃ চ্যাটার্জীর প্রশ্নটা শুনে অধিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "অথবা পুলিসের সঙ্গে কানেকশন আছে। নাইটক্লাব ভিজিট করা বা বারের বাউন্সারের সঙ্গে আলাপ করা, একজন হিস্ট্রিশিটারের ডিটেলস পাওয়া শুধু দু'জনের পক্ষেই সম্ভব। প্রথমত, একজন আন্ডারওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিশিটার বা ড্রাগ পেডলার যার কাজটাই এমন যেখানে নাইটক্লাবে বা বারেই বিজনেস ডিলিং হয়। একজন হিস্ট্রিশিটার

অন্য হিস্ট্রিশিটারকে চিনবেই। সে ডাক্তারকেও চিনবে, আর্মি অফিসার আর কুস্তিগীরকেও চেনা খুব কঠিন নয়।”

অর্ণব অস্ফুটে বলল, “বেবো ব্রিগ্যানজা বা সুপারি কিলার সুলেমান!”

“বেবো ব্রিগ্যানজার দিকেই সন্দেহটা বেশি যাচ্ছে। সুলেমান সুপারি কিলার হলেও সমকামী নয়। বেবোর কিন্তু গে’ হওয়ার চান্স প্রবল। উপরন্তু মেডিক্যাল হলেও প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম একধরনের ড্রাগই। বেবোর ড্রাগ নিয়েই ওঠাবসা। আমেরিকা থেকে বে-আইনিভাবে ড্রাগ আনানো তার বাঁ হাতের কাজ। সুকোমলের লিঙ্ক আগেই বলেছি। এ লোকটা খুনীর প্রোফাইলে বসছে।”

“আর পুলিস? ইউ মিন, এডিজি শিশির সেন!” ডঃ চ্যাটার্জী স্তম্ভিত, “তোমার মনে হয় উনিই খুনী! এডিজি সেন তোমায় মেঝের ওপর বেহুঁশ করে ফেলে রেপ করার চেষ্টা করবেন! ইম্পসিবল! অসম্ভব!”

“ওঃ!” অধিরাজ বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ায়, “পুলিসের কানেকশন থাকা মানেই অফিসার হতে হবে তা বলেছি আমি? বাট, হোয়াট অ্যাবাউট ইনফর্মার? আপনি এই অ্যাঙ্গেলটা ছেড়ে যাচ্ছেন ডক!”

অর্ণবের মুখ দিয়ে নামটা বেরিয়েই গেল, “শেয়াল পন্ডিত!”

“কারেক্ট। একজন পুলিস অফিসারকে দেখলে কোনও হিস্ট্রিশিটার এগিয়ে আসবে না, উলটে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু একজন খবরি, বিশেষ করে ফ্যান্টম ইনফর্মার সবার কাছেই ইজিলি পৌঁছতে পারে। কারণ ইনফর্মাররা পুলিসের সঙ্গেই কাজ করে, অথচ কেউ তাদের চেনে না। সে হয়তো নিঃশব্দেই হিস্ট্রিশিটারদের ঘাঁটিতে ঢুকেছে, হয়তো ড্রাগ পেডলারদের সঙ্গে একই বোতল থেকে মদ খেয়েছে। বা কাউকে ফলো করতে করতে পৌঁছে গিয়েছে কোনও বারে বা নাইটক্লাবে। হয়তো বাউন্সারের সঙ্গে আলাপও জমিয়েছে তার ওপর আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো অর্ণব...।” অর্ণব সচকিতে অধিরাজের দিকে তাকায়। অধিরাজ অন্যমনস্কভাবেই বলল, “যে অফিসাররা মারা গিয়েছেন, তাদের খুব সহজে হাতের কাছে পাওয়া একমাত্র একজন সুদক্ষ খবরির পক্ষেই সম্ভব। পুলিস অফিসাররা নিজেদের সহযোগী ছাড়া আর যে জাতিটাকে চোখ বুজে বিশ্বাস করে, তারা

হল ইনফর্মার! অফিসার দাশগুপ্তের ক্ষেত্রে তো আরও সুবিধা! তাছাড়া নীরবে ফলো করা, মেক-আপে পারদর্শী। প্যাটার্নটা ইনফর্মারের মতো নয় কি?"

"তার মানে সাসপেক্ট দু'জনে এসে ঠেকল!" ডঃ চ্যাটার্জী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন অধিরাজের দিকে, "আই মিন, আইদার বেবো ব্রিগ্যানজা অর সুমঙ্গল পন্ডিত বা শেয়াল পন্ডিত।" -

"হ্যাঁ। বাকি পাঁচজনকে বাদ দিতেই পারেন। এ কাজ সুকোমলের নয়। খুনী এত বোকা নয়। কিন্তু অধর্মপুত্র কিছু তো চেপে যাচ্ছেই।" অধিরাজ বলল, "শিশির সেনকেও বাদ দিতে পারেন। আপনার সঙ্গে আমি সহমত। কিন্তু উনিও কিছু বলছেন না। কিন্তু সেটা কী?"

"তুমি বলছিলে, খুনী পাঁচটা খুন করেছিল দুটো কারণে। একটা তো বুঝলাম। ডামি হিসাবে ব্যবহার করে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয়টা কী?" ডঃ চ্যাটার্জীর কথায় মাথা ঝাঁকাল সে, "পুলিসকে চ্যালেঞ্জ করা। তার আসল লক্ষ্য পুলিস অফিসাররাই ছিলেন। সে যে-ই হোক, পুলিসের ওপর তার ভয়ঙ্কর রাগ!"

"সেটা কী করে বোঝা গেল?" -

"দেখছেন না, লাশগুলো একদম পুলিসের নাকের সামনে ডাম্প করেছে! পুরোদস্তুর চ্যালেঞ্জ; পারলে ধরে দেখা। এবং এরপর যারা খুন হলেন, তারা সবাই ইনভেস্টিগেটিং অফিসার! বত্রিশ বছরে আর একটিও সাধারণ মানুষকে সে মারেনি। ওরকম জাঁদরেল লোকগুলোকে রীতিমতো রেপ করে, কেটে কুটে, মাথা কেটে আবার মাথায় হাঁড়ি পরিয়ে ডাম্প করা হল। খুনীর খুন করার স্টাইলই বলে দিচ্ছে যে পুলিসদের সে কী চোখে দেখে। আপনিই বলুন, মাথা কাটার দরকার ছিল, মাথা কেটেই ফেলে দিতে পারত। স্টাইল মেরে মাথায় হাঁড়ি বসানোর কী দরকার ছিল?"

অর্ণব এবং ডঃ চ্যাটার্জী দু'জনেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অধিরাজ ফের বুক পকেট হাতড়াচ্ছে দেখে অর্ণব মৃদু স্বরে বলল, "নো।"

"ওকে, ওকে।" অধিরাজ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়, "হাঁড়ি বসানোর একটাই অর্থ। সে স্পষ্ট জানাল, এই হতভাগ্যদের মাথায় একফোঁটাও বুদ্ধি নেই। ওদের মাথা একটা শূন্যগর্ভ

হাঁড়ির মতোই ফাঁকা। মানে মাথাটা জাস্ট ফর শো, আসলে সেটা একটা ফাঁকা হাঁড়ি। খুনী রীতিমতো জাহির করছে; এগুলোর মাথায় ঘিলু নামক বস্তুটাই নেই! আমরা খামোখাই তান্ত্রিকদের ধরে টানাটানি করছি মনে হয়। ব্যাপারটার মধ্যে ব্ল্যাক ম্যাজিকের "ব'-ও নেই।"

"তাহলে অমাবস্যা কেন?"

ডঃ চ্যাটার্জীর প্রশ্নের উত্তরে একটু অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকায় সে, "এখনও সঠিকভাবে জানি না। হতে পারে পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য। অথবা অন্য কিছু অর্থ আছে যেটা এখনও বুঝতে পারছি না। কিন্তু কোনওভাবেই ব্ল্যাক ম্যাজিক নয়। ব্ল্যাক ম্যাজিক হলে বত্রিশ বছর ধরে মাথাগুলো শোকেসে সাজিয়ে রাখার কোনও অর্থ হয় না। সে মাথাগুলোকে কোনও কাজেই লাগায়নি। স্রেফ শোকেসে সাজিয়ে রেখেছে। অথচ মাথাগুলো তার কাছে সবচেয়ে দামি। আপনি তো শোকেসটা চেক করেছেন ডক। ওর মধ্যে আর কিছু ছিল?"

"নাঃ।" ডঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, "পুরো ভোঁ ভা। নটা স্কাল ছাড়া শোকেসের ভেতরে জীবনেও কিছু ছিল না।" -

"তাহলেই ভেবে দেখুন, মাথাগুলো তার কাছে ঠিক কতটা দামি।" অধিরাজ বলল, "লোকটা যে করেই হোক বুঝেছিল যে স্লটার-হাউজে রেড পড়তে চলেছে। সে নাইফ শার্পনার বা নিজের কৃতকর্মের প্রমাণগুলো নিয়ে পালাল না! লোপাটও করল না! নিয়ে গেল শুধু সার্জিক্যাল সটা আর ন' খানা মাথা! স্কালগুলো তার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। ফের সেই প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে। ন'টা মাথা কোন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগবে। করোটিগুলো তার কাছে এত ইম্পর্ট্যান্ট কেন!" -

"করোটির মধ্যে ড্রাগ ভরে চালান দিচ্ছে না তো!"

বাহাত্তর ঘণ্টা পরে এই প্রথম স্বাভাবিকভাবে হো হো করে হেসে উঠল অধিরাজ, "ডক, ঐ ন'টা করোটির মধ্যে ড্রাগ ছিল কী না জানি না! আপনার করোটির মধ্যে যে মিস অগ্নিকুন্ড ঘুরছেন তা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। ড্রাগ চালান দিতে হলে নিরীহ কিছুর মধ্যে ভরেই চালান দেবে! কেউ স্কালের ভেতরে ড্রাগ রাখে? স্কাল জিনিসটা পাচার করাই

বে-আইনি! আর ঐ ফাঁকা খুলিতে ড্রাগের প্যাকেট লুকোবে কোথায়!" ডঃ চ্যাটার্জী মুখটা প্রায় হাঁড়ির মতো করেই বললেন, "ওঁর নাম মোটেই অগ্নিকুন্ড নয়, ওঁর নাম...!"

"জানি।" সে বাধা দিয়ে বলে, "আমার মনে হচ্ছে, এ লোকটা 'গে' হলেও ছোটবেলায় নির্ঘাৎ সেক্সুয়াল অ্যাবিউসের শিকার হয়েছিল।"

"বাপ রে! এত কিছু বুঝে ফেললে কী করে বাপ আমার!" -"কারণ তার অ্যাকশনগুলো বাচ্চাদের মতোই। এই যে প্যাংকঝুয়োবোনিয়াম ইউজ করছে, কেন!"

"আশ্চর্য!" এবার চটে গেলেন ফরেনসিক বিশারদ, "আমি কী করে জানব! আমি হলে প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম ব্যবহার করতামই না। একদম ফুল অ্যানাস্থেশিয়া দিতাম! ফুল সেন্সলেস হয়েই ফৌত হয়ে যেত।"

"আর মিস অগ্নিকুন্ড হলে ফ্রুট জুসের মধ্যে গাঁজা মিশিয়ে খাইয়ে দিতেন। তাতেই কেল্লা ফতে হত।"

– "অ্যাই! খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু।" পুরো ফুটবলের মতো দু'খানা বাউন্স মারলেন ডঃ চ্যাটার্জী, "সবসময় মহিলাকে ধরে টানাটানি করবে না বলছি। ফ্রুট জুস মোটেই খারাপ জিনিস নয়।"

অধিরাজের মুখে পরিচিত ছেলেমানুষী হাসিটা ঝিলিক মারতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অর্ণব। ডঃ চ্যাটার্জীর এজন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য। কিছুটা অবশ্য মিস অগ্নিকুণ্ডেরও কৃতিত্ব আছে। অন্তত মানুষটা ট্রমাটা কাটিয়ে উঠছে! অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচায়, "ঐ দ্যাখো। তোমার চেয়েও পজেসিভ প্রেমিক।"

"বাজে কথা ছেড়ে আসল কথায় এসো।"

ভদ্রলোক গরগর করেন, "যত্তসব ফাজিল ছোঁড়া। বুড়োমানুষকে নিয়েও ফিচলেমি করছে।"

"ফাইন। একটা বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট, লোকটার মনস্তত্ত্বটা এখনও শৈশবেই আটকে রয়েছে। জনসনস বেবি ক্রিম, পাউডার, কার্টুনই তার প্রমাণ। এবার একটা জিনিস বুঝুন, ফুল অ্যানাস্থেশিয়া, বা সেডেটিভ দিলে তার ভিকটিমরা পুরোপুরি সেন্সলেস হয়ে যেত। কিন্তু সেটা সে চায়নি -দেখুন, লোকাল অ্যানাস্থেশিয়াও নয়। লোকাল

অ্যানাস্থেশিয়াও তো মানুষকে কিছুটা অবশ করে। অথচ বেছে বেছে প্যাংকুরোনিয়ামের মতো মাসল রিল্যাক্সিং ড্রাগ কেন? কারণ সে চেয়েছিল, তার এই সেক্সুয়াল অত্যাচারটা ভিকটিমরা ফিল করুক। সেন্সলেস হয়ে গেলে, বা সাড়হীন হয়ে গেলে তো অত্যাচারটাই টের পাবে না! কিন্তু প্যাংকুরোনিয়ামের ক্ষেত্রে সেটা টের পাবে। ভিকটিম যেটা আপ্রাণ চাইছে না, বুঝতে পারছে রেপড হচ্ছে, তার ওপর একটা লোক যা খুশি অত্যাচার করে যাচ্ছে; অথচ বাধা দিতে পারছে না, হাত পা-ই কাজ করছে না! ইনফ্যাক্ট এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হওয়ার পর আমি আরও বেশি বুঝেছি। প্রচণ্ড এম্ব্যারাসিং অভিজ্ঞতা। ও কী করছে সেটা একটু একটু হলেও বুঝতে পারছিলাম। কিছু বোধহয় বলছিলও মাঝেমধ্যে। তবে এত নীচু গলায় যে শুনতেই পাইনি। কিন্তু পুরোপুরি হেল্পলেস, এক্সপোজড, ভালনারেবল! এই স্টেজটাকে কী বলবেন? হেল্পলেস অ্যান্ড ভালনারেবল লাইক আ...?"

"চাইল্ড!" ডঃ চ্যাটার্জী কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন, "হোলি - শিট!"

"সম্ভবত লোকটা নিজেও এই অত্যাচারের শিকার হয়েছিল।" অধিরাজের মুখে বিষণ্নতা, "চাইল্ড অ্যাবিউজারদের আমার মতে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা উচিত। শৈশবে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে অনেকেই এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। অনেকের মধ্যেই পরবর্তীকালে তার এফেক্ট দেখা যায়। কিন্তু এই লোকটার মাথাটাই গেছে। ও রিভেঞ্জ নিচ্ছে। এটাই ওর প্রতিশোধ নেওয়ার স্টাইল। যখন ওর ওপর অত্যাচার হয়েছিল, তখন বেচারি কিছুই করতে পারেনি। এখন পালটা প্রতিশোধ নিচ্ছে। ভিকটিমদের ঠিক ততটাই হেল্পলেস, ভালনারেবল করছে, যতটা ও নিজে ছিল। একটা শিশু বুঝতে পারে তার সঙ্গে অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারে না। ওর মানসিক গঠনটাই এমন দাঁড়িয়েছে, যা ওর সঙ্গে ঘটেছিল; ঠিক সেটাই ফেরত দিচ্ছে!" সে আক্ষেপে মাথা নাড়ে, "এ লোকটাকে ঘৃণা ছাড়া কিছু করা যায় না! কিন্তু ওর ট্র্যাজেডিটাও অস্বীকার - করতে পারছি না। অন্তত অভিজ্ঞতা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে আমি স্বয়ং কিছুটা হলেও টের পেয়েছি।"

"তাহলে এগুলো প্রতিশোধ বলছ?"

- "না। শুধু চাইল্ড মলেস্টেশনের রিভেঞ্জ নয়। সম্ভবত আরও কিছুর রিভেঞ্জ মিলে মিশে আছে।" অধিরাজ একটু ভেবে জবাব দেয়, "ওর মনস্তত্ত্বটা চাইল্ডিশ; কিন্তু জটিল ডক। আমার ধারণা এই লোকটা ছোটবেলায় যে অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল, তার সঙ্গে পুলিসের কোনও না কোনও যোগাযোগ আছে। গে' হওয়ার জন্য হয়তো পরেও অনেক টর্চার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সে এটা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে যে তাঁহা তাঁহা পুলিস অফিসারদের চেয়ে সে অনেক বুদ্ধিমান। অনেক বেশি এগিয়ে | এমন নয়তো যে লোকটা পুলিস হতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে?"

—"গুড পয়েন্ট।" ডঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, "হতে পারে। কিন্তু এখন কী করণীয়?"

-"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।" অধিরাজ একটু চিন্তিত মুখে বলল, "বেবো বা সুমঙ্গলের কোনও খোঁজ নেই। মিস দত্তও কোনও আপডেট দেননি। এই অবস্থায় একটা লোকই হেল্প করতে পারে।"

"কে?"

অর্ণব ও ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় একসঙ্গেই বলে ওঠেন। অধিরাজ তাদের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, "অফিসার রথীন দাশগুপ্ত।"

(২০)

বাড়িটাকে এই মুহূর্তে চতুর্দিক থেকে কুয়াশা ঘিরে রেখেছে। একফালি চাঁদ ঠিক বাড়ির পেছন থেকে অতি সন্তর্পণে উকি মারছে। চট করে দেখলে মনে হয়, হয়তো অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। চতুর্দিকে আগাছার জঙ্গল। নীলাভ ফিকে জ্যোৎস্না আর কুয়াশা মাখা বাড়িটাকে প্রায় প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গগুলোর মতোই দেখাচ্ছিল। অত্যন্ত শক্তিশালী তার গঠন। বত্রিশ বছর পরেও সমান ঔদ্ধত্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার নীরবতার মধ্যেও যেন অজানা এক হাহাকার ভেসে আসে। হিমেল হাওয়ায় কাদের যেন ফিসফিসানি!

আশেপাশের ঝোপঝাড়গুলো অন্ধকারে কালো কালো ছায়া ছায়া হয়ে স্থির হয়ে আছে। তাদের গায়ে বিন্দু বিন্দু সবুজাভ আলো। জোনাকির দল! কোনও এক সঙ্কেতে বারবার জ্বলছে, নিভছে। কুয়াশার মধ্যে খুব মৃদু, আবছা টিম টিমে স্ফুলিঙ্গ। শস্প-গুল্মের বন্য গন্ধ নাকে এসে ক্রমাগত ঝাপ্টা মারছে। শব্দ বলতে, একটানা ঝিঁঝির ডাক। ঝিঁঝির শব্দও ভারী রহস্যময় মনে হয়। প্রাণীটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু কোথায় আছে বোঝা দুষ্কর। তাকে তাকে দেখা যায় না, শোনা যায়।

বত্রিশ বছর ধরে এই বাড়িটা শূন্যতা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই কিলো দরে ফ্ল্যাটবাড়ির জমানায় এখনও যে টিকে আছে তার অস্তিত্ব, তার দুটোই কারণ। প্রথমত, বাড়ির মালিকের বীভৎস মৃত্যু! অফিসার দাশগুপ্তের ভয়ঙ্কর মৃত্যু এতটাই ভীত করে তুলেছিল সবাইকে যে আর কেউ এ বাড়ির ত্রিসীমানায়ও আসেনি। বাড়িটা 'অভিশপ্ত' হিসাবে এতটাই কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল যে ভাগ্যে কোনও খরিদ্দারও জোটেনি। লোকের ধারণা এখনও রথীন দাশগুপ্তের অতৃপ্ত আত্মা এখানেই ঘুরে বেড়ায়। তাই ধারে-কাছেও কেউ ঘেঁষে না। দ্বিতীয়ত, শিশির সেনের হস্তক্ষেপ। যেহেতু অফিসার দাশগুপ্তের কোনও পরিবার বা ওয়ারিশ ছিল না, শিশির সেন তাঁর প্রিয় 'স্যারের' বাড়িটাকে দায়িত্ব নিয়ে আগলে রেখেছেন। বত্রিশ বছর আগে যেমন ছিল, অবিকল তেমনই রয়েছে। বাইরের আগাছা ছাড়া আর একটিও আঁচড় পড়েনি বাড়িটায়। এমনকি তালাটাও বত্রিশ বছর

আগেরই। এডিজি সেন আর বদলাননি। এবং যেহেতু স্বয়ং সি আই ডি, হোমিসাইডের এক জাঁদরেল অফিসার বাড়িটার দখল নিয়েছেন, সেহেতু ল্যান্ড মাফিয়া, প্রোমোটাররাও বাড়িটাকে কবজা করার চেষ্টা করেনি।

অধিরাজ যখন এডিজি সেনের কাছে এ বাড়ির খবর নিচ্ছিল, তিনি তখনই জানিয়েছেন; বাড়িটা বত্রিশ বছর আগের অভিশপ্ত দিনটায় যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। কোনওকিছুই নিজের জায়গা থেকে সরেনি। জীবনের শেষদিন অবিকল যেমনভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন অফিসার দাশগুপ্ত, প্রত্যেকটা জিনিসই আজও সেখানেই তাঁরই জন্য অপেক্ষারত।

কথাটা শুনে অধিরাজ বিস্মিত হলেও অর্ণব হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয় সহমত হয় না। শিশির সেন জানেন যে তাঁর 'স্যার' কখনও ফিরবেন না। কিন্তু মন মানেনি। হয়তো আজও বিবেক দংশনে জর্জরিত হন । হয়তো এখনও নিজের বোকামির জন্য আফসোসে প্রতি মুহূর্তে মরছেন।

অর্ণব নিজের কোমরের বেল্টে হাত ছোঁওয়ায়। তার মুখ শক্ত। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে পরিবেশটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করে। দেখার চেষ্টা করে কুয়াশা মেখে কোনও তৃতীয় রহস্যময় অস্তিত্ব আশেপাশে ওঁত পেতে আছে কি না! লোকটাকে এখনও সঠিকভাবে দেখতে পায়নি অর্ণব। কিন্তু যতটুকু দেখেছে, তাতেই স্পষ্ট যে সে মানুষই! অথচ যখনই তাকে কল্পনা করে, তখনই তার মুখের জায়গায় এক রাক্ষসের মুখ দেখতে পায়। একটা বীভৎস মুখ, ক্রূর-নিষ্ঠুর দুটো দপদপে চোখ! কখন শিকার ফাঁদে পড়বে সেই অপেক্ষাতেই তার লকলকে জিভ বের করে বসে আছে, আর নখে দাঁতে শান দিচ্ছে।

তার মনে পড়ে গেল ডঃ চ্যাটার্জীর কথা, "রাজা, এত রাতে বেরোনো ঠিক নয়! ও পাবলিকের সেক্স হরমোন এখন মাথায় উঠে গেছে। আরেকবার নাগালে পেলে ছাড়বে না।"

সে আগ্নেয়াস্ত্রটাকে বের করে এনে শক্ত করে চেপে ধরে। কাঁধের জখম এখনও সেরে ওঠেনি। কিন্তু বন্দুক ধরতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ছুরিটা আঘাত করলেও তার মার অতটা মারাত্মক ছিল না। সে একটা জোরালো শ্বাস টেনে আশপাশটা ভালো করে দেখে

নিল। মনে মনে অজানার উদ্দেশ্যে বলল, “জানি না তুমি এখানে আছ কি না। যদি থেকে থাকো, তবে একটা কথা ভালোভাবে বুঝে নাও। যেমনভাবে হেতালের লাঠি নিয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন চাঁদ সদাগর, তেমন আমিও এই দাঁড়ালাম। দেখি, কী করতে পারো!”

“লোকটা আমাদের ফলো করেনি অর্ণব।” অর্ণবের সতর্কতা দেখে আস্তে আস্তে বলল অধিরাজ, “আমি সারা রাস্তা লক্ষ্য করতে করতে এসেছি। আজ ও আমাদের স্টক করছে না। রাতে কোনও ট্র্যাফিক থাকে না। তাই ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়া সহজ নয়। দিনের বেলা ফলো করা খুব সহজ। কিন্তু এত রাতে শিকারকে বুঝতে না দিয়ে ফলো করা ইম্পসিবল। তাই ইচ্ছে করেই এই টাইমটা বেছেছি।”

অর্ণব তবু আশ্বস্ত হয় না। সে রিভলবারটাকে শক্ত করে ধরে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যায় রথীন দাশগুপ্ত’র বাড়ির দিকে। অধিরাজও দেরি না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল সেদিকেই।

রথীন দাশগুপ্ত’র বাড়ির চাবি শিশির সেনই দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই বিরাট-আকৃতি প্রাচীন তালা কোনও বাধা দিল না। কিন্তু যেরকম শব্দ করে উঠল তাতে যে কোনও সাধারণ মানুষ ঘাবড়ে যাবে। দরজাও ক্যাঁচ করে একখানা জোরালো প্রতিবাদ ছুঁড়ে দেয়। অবিকল হরর ফিল্মের সাউন্ড এফেক্ট!

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ! অন্ধকারে কিছুই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকার। এ অন্ধকারের বোধহয় কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। তবে শিশির সেন বলেছিলেন এ বাড়িতে ইলেক্ট্রিসিটি আছে । তিনিই স্বয়ং বত্রিশ বছর ধরে ইলেক্ট্রিক বিল দিয়ে আসছেন। অধিরাজ টর্চ জ্বেলে সুইচবোর্ড খুঁজে বের করল। বড় বড় গোল সুইচের নব খটাং করে তুলে দিতেই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ঘর আলোকিত হয়ে উঠল। সম্ভবত এটাই অফিসার দাশগুপ্তর বসার ঘর। বড়সড় হলঘর বলাই যায়। কিন্তু ডেকোরেশন দেখে চক্ষু চড়কগাছ দুই অফিসারের। একেবারে নাকের সামনেই দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে একজোড়া জব্বর শিং! শিঙের মালিকও অবশ্য উপস্থিত। স্টাফড মোষের আস্ত একখানা মাথা!

"স্যার"। অর্ণব বলল, "যমরাজ দেখছি শিং ছাড়া কথাই বলতেন না! ফেভারিট মোষের শিং শুদ্ধ মাথা দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছেন।" অধিরাজ কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল মোষের মাথাশুদ্ধ শিঙের দিকে! আস্তে আস্তে বলল, "প্রাণীটা বাফেলো বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু মোষের শিংটা একটু অদ্ভুত নয়!"

"শিং তো শিঙের মতোই হবে স্যার!"

"না। মোষের শিঙ আরও বড় হয়। একদম পাকানো শিং বলতে পারো। কিন্তু এই মোষের শিংটা স্ট্রেট উঠে গিয়েছে। জেনারেলি মোষের শিং একটু বাঁকানো হয়! তবে যমরাজের মোষের মাথায় এরকম উদ্ভট শিং ?"

কেনবলতে বলতেই সে এগিয়ে যায় মোষের মাথাটার দিকে। তার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠছে। চোখ কুঁচকে প্রাণীটার মাথার দিকেই তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে এর মধ্যে আদৌ কোনও রহস্য আছে কি না! আত্মমগ্নভাবেই বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

"উনি শিঙের মধ্যেই কিছু কারিকুরি করেননি তো স্যার!"

"দেখো তো।" অধিরাজের কণ্ঠে সন্দেহ, "মাথাটা নামিয়ে আনতে পারবে?"

"ইয়েস স্যার।"

মোষের মাথাটার ঠিক নীচেই সোফা। অর্ণব সোফার ওপর উঠে দাঁড়াতেই সোফাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে প্রতিবাদ উঠল। সে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে মোষের মাথাটা খুব সহজেই নামিয়ে আনে। অধিরাজ খুব মনোযোগ দিয়েই সেটাকে পরীক্ষা করছে। বেশ কয়েকবার শিং ধরে টানাটানিও করল। তারপরই হতাশভাবে মাথা নাড়ে, "নাঃ, শিং বিন্দুমাত্রও নড়ছে না। রিমুভেবল নয়! এর মধ্যে কোনও রহস্য বা ক্লু আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সত্যিই উদ্ভট দেখতে।"

– "কে জানে! হয়তো যমরাজের মোষের শিঙ স্পেশ্যালভাবে বানানো হয়েছে!" কিছু একটা বলতে গিয়েও হেসে ফেলল অধিরাজ। মাথা নেড়ে বলল, "এখন যমরাজের ঘোষের শিং ধরে টানাটানি করাটা পন্ডশ্রম অর্ণব। বরং কিছু খুঁজি। যদি কিছু পাওয়া যায়।"

অন্য বসার ঘরে এখনও টেবিলের ওপর পড়ে আছে চায়ের কাপ। বত্রিশ বছর আগে এই কাপ থেকেই শেষবারের মতো চা খেয়েছিলেন আফসার দাশগুপ্ত। অধিরাজ কাপটাকে নেড়েচেড়ে দেখছে। মনে মনে শিশির সেনের প্রশংসা না করে পারল না। অসাধারণভাবে মেইনটেইন করেছেন বাড়িটাকে। টেবিলের ওপর একফোঁটাও ধূলো নেই।

অর্ণব দেওয়ালে টাঙানো রথীন দাশগুপ্ত'র ছবিগুলো দেখছিল। রঙীন ছবি কমই আছে। বেশিরভাগই সাদা-কালো। তরুণ অফিসার দেওয়ালে অতীত হয়ে মিষ্টি হাসছেন। মৃত্যুর আগে তিনি প্রায় বছর ত্রিশের যুবক ছিলেন। ম্যানলি চেহারা না হলেও মানুষটাকে দেখতে ভারী ভালো লাগে। অদ্ভুত একটা লাবণ্য আছে তাঁর মুখে। তার সঙ্গে অদ্ভুত তেজ! ফর্সা ক্লিন শেভড মুখ। গালে নীলাভ আভা। ডঃ চ্যাটার্জী ঠিকই বলেছিলেন, লোকটা দেখতে যতটা নিরীহ হোক না কেন, চোখ দুটো অসম্ভব নির্ভীক।

"হি ওয়াজ কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ।"

অর্ণবের পেছনে অধিরাজ এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখও অফিসার দাশগুপ্তের ছবির ওপর নিবদ্ধ, "সুপুরুষ না হলেও সুদর্শন তো বটেই। এর নাম আবার যমরাজ রেখেছিল হিস্ট্রিশিটাররা! ভাবা যায়!"

অর্ণবের চোখ বাকি ছবিগুলোর ওপর পড়ল । অফিসার দাশগুপ্তর শৈশবের ছবিও আছে। চা-বাগানে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কিশোর রথীন। কখনও বা মায়ের সঙ্গে।

"দার্জিলিঙের চা বাগান?" -

অর্ণবের কথার উত্তরে মাথা নাড়ল সে, "নাঃ। আসাম। ঐ দেখো চা বাগানে একটা বোর্ড উকি মারছে। বাংলা হরফে অহমিয়া শব্দ। অফিসার দাশগুপ্তের বাবা নির্ঘাৎ আসাম রেজিমেন্টের আর্মি অফিসার ছিলেন।"

অর্ণব এই অদ্ভুত তথ্য শুনে বিস্মিত! শিশির সেন অফিসার দাশগুপ্তের ফ্যামিলি সম্পর্কে তেমন কিছুই খুলে বলেননি। শুধু এইটুকুই জানিয়েছেন যে তার বাবা এবং মা অকালেই প্রয়াত হওয়ায় অফিসার দাশগুপ্তের পরিবার বলতে কেউ ছিল না। তিনি নিজেও বিয়ে করেননি। কিন্তু তাঁর বাবা কে ছিলেন, কোথায় ছিলেন; কিছুই জানাননি।

উপরন্তু ছবিতে বাবার গায়ে উর্দিও নেই! অর্ণব মুগ্ধতা প্রকাশ করতেই যাচ্ছিল। তার আগেই সে আঙুল তুলে দেওয়ালের একটি হুঁকে টাঙানো একটি টুপির দিকে দেখায়, "অত ইমপ্রেসড হওয়ার কিছু নেই। ঐ টুপিটা দেখো। ওটা হচ্ছে আসাম রেজিমেন্টের স্পেশ্যালিটি। ওটাকে রাইনো হ্যাটও বলে। ওপরে গন্ডারের লোগোও আছে। টুপিটা অফিসার দাশগুপ্তের হতেই পারে না। কারণ তিনি আর্মি নয়, পুলিস অফিসার ছিলেন। অথচ তিনি নিজের ঘরে টুপিটা সযত্নে ও সগর্বে সাজিয়ে রেখেছেন। ওটা ওঁর বাবার ছাড়া আর কার হতে পারে? প্রতিবেশীর টুপি নিশ্চয়ই সাজিয়ে রাখবেন না।"

অকাট্য যুক্তি। অধিরাজ বিড়বিড় করল, "অন্তত এইটুকু বোঝা গেল যে এনকাউন্টার এক্সপার্ট তাঁর অকুতোভয় চরিত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন।" বসার ঘরে আর বিশেষ কিছু নেই। অফিসার দাশগুপ্তের মূর্তি কেনার খুব শখ ছিল। কিন্তু সেখানেও খুনোখুনী কেস! টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে কতগুলো বামনাকৃতি মানুষের ব্রোঞ্জের মূর্তি। সে কী মূর্তি! দেখলেই ভয় করে। তার ওপর হাতে আবার কী সব অস্ত্রশস্ত্র! এগুলো কেউ সাজিয়ে রাখে! অধিরাজকে বলতেই সে ঠান্ডা স্বরে বলল, "এর নাম আর্ট। তোমার আমার মাথায় ঢুকবে না!"

"ঐ মূর্তিগুলোর মুখ দেখুন। পুরো ভূতের মতো!" অধিরাজ কপাল চাপড়ায়, "তোমার কী হবে অর্ণব! এগুলো ট্রাইবাল আর্ট। আমার মামাবাড়িতে গাদাগুচ্ছের আছে। আমার মামা আর্টিস্ট ছিলেন। তিনি অবিকল এরকম ভূতের মতো গুচ্ছ মূর্তি কিনে এনে স্টুডিও ভর্তি করে ফেলেছিলেন। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন ওঁর স্টুডিওতে ঢুকতে ভয় পেতাম। আমার তখন অভ্রান্ত ধারণা ছিল, এগুলো সত্যিই ভূত!"

- "স্যার, যা দেখলে ভয় করে, সেটা কী জাতীয় আর্ট!"

"বুঝবে না!" অধিরাজ অর্ধনিমীলিত চোখ করে ফেলেছে, "এসব হচ্ছে উঁচুদরের শিল্প। তাছাড়া যিনি তথাকথিত যমরাজ, তিনি ভূতের মূর্তি দিয়ে ঘর সাজাবেন না তো কি পরীর মূর্তি দিয়ে সাজাবেন! আমি ভদ্রলোকের চরিত্রটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। শুধু এনকাউন্টার নয়, ভয় দেখাতেও ভদ্রলোক এক্সপার্ট ছিলেন।"

হলঘর ছাড়িয়ে একটু এগোতেই ডানদিকে আরও একটা ঘর পড়ল। সেটা দেখে দুই অফিসারের বিস্ময় আরও বাড়ল। এ তো স্টুডিও! তার সঙ্গে অ্যাটাচড ডার্করুম। ডার্করুমে বিশেষ কিছুই নেই। কোনও ছবির নেগেটিভও পড়ে নেই। স্টুডিওতে নানারকম দামি দামি ক্যামেরা, অসাধারণ সব ছবি ডিসপ্লেতে সাজানো রয়েছে। ভদ্রলোকের ফটোগ্রাফির শখ ছিল। বেশিরভাগই ওয়াইল্ড লাইফ। নানারকম দুষ্প্রাপ্য পাখির ছবি সাজানো।

অধিরাজ চোখ প্রায় কপালে তুলে বলল, "সবকটা পাখিই মারাত্মক! গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড, রেড হেডেড ভালোচার, হিমালয়ান কুয়েল, স্পুন বিল্ড স্যান্ডপাইপার, হোয়াইট বেলিড হেরন, বেঙ্গল ফ্লোরিকান! এদের তো খুঁজেই পাওয়া যায় না! ফটো তুললেন কী করে ভদ্রলোক! এরা তো সহজে দেখাই দেয় না! অথচ ছবিতে বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে!" অর্ণব হাঁ করে স্টুডিওরুমটা দেখছিল। শুধু ফটোগ্রাফিই নয়, অফিসার ছবি আঁকতেও ভালোবাসতেন। যে কয়েকটা পেইন্টিং চোখে পড়ল, সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় তাঁর আঁকার হাত যথেষ্ট ভালো ছিল। এখনও টেবিলের ওপর ব্রাশ, আর পেইন্ট পড়ে রয়েছে।

"অ্যাক্রিলিক পেইন্টিং!" অধিরাজ পেইন্টিংগুলোর দিকে একঝলক তাকিয়ে বলল, "তারিফ না করে পারছি না। তুমি এতক্ষণ ভূতের মূর্তি নিয়ে কমপ্লেন করছিলে। এগুলো দেখে কী বলবে?"

"অপূর্ব!" রুদ্ধশ্বাসে বলল অর্ণব, "সবই নেচারের ছবি। এককথায় এক্সেলেন্ট!" - -

"কিন্তু নেচারের মধ্যে রাবণ কী করছেন?" -

অধিরাজ আস্তে আস্তে স্টুডিও'র এককোণে রাখা একটা অসম্পূর্ণ ছবির দিকে এগিয়ে গেল। অর্ণব এতক্ষণ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেই ডুবেছিল। এবার সচকিত হয়ে অসম্পূর্ণ ছবিটার দিকে তাকায়। সেখানে রাবণই দাঁড়িয়ে রয়েছেন বটে! ছবিটা অসমাপ্ত। কিন্তু ছবির নায়ককে চিনতে ভুল হয় না। দশটা মাথা নিয়ে যে লোকটা বুকটান করে দাঁড়িয়ে আছে, সে স্বয়ং দশানন ছাড়া অন্য কেউ নয়!

অধিরাজ বেশ কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে রাবণের ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টি এক্স-রে'র মতো ছবিটাকে রীতিমতো স্ক্যান করছে। ছবিটা শেষ হয়নি। তার মানে মারা যাওয়ার আগে এই ছবিটাই আঁকছিলেন অফিসার দাশগুপ্ত। এত কিছু ছেড়ে রাবণ কেন!

"অর্ণব।" সে চাপা উত্তেজিত স্বরে বলল, "এই ছবিটাকে তুলে নাও তো। আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা পেয়েছি।" "রাবণের ছবিটা স্যার?" -

-"হ্যাঁ"। অধিরাজ অন্যমনস্ক, "রাবণের দশটা মাথা আমায় হন্ট করছে! এদিকে আমাদের খুনী অলরেডি ন'টা মাথা জোগাড় করে দশ নম্বরের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। রাবণ অসম্ভব বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। দশটা মাথা শুধু মাথাই নয়, তার দশ রূপকেও রিপ্রেজেন্ট করে। রাবণের মতো বহুরূপ ধরতে ওস্তাদ লোক খুব কম ছিল। এবং তাঁর মতো রিভেঞ্জফুল লোক যে কী পর্যায়ে যেতে পারে গোটা রামায়ণই তার সাক্ষ্য দেয়। কোথাও আমাদের খুনীর সঙ্গে মিল পাচ্ছ না?" বলতে বলতেই সে একটু অন্যমনস্কভাবে অর্ণবের দিকে তাকায়, "কেস ফাইলের ছবিগুলো আছে অর্ণব?"

"হ্যাঁ স্যার। আপনার কাঁধের ব্যাগে।"

অর্ণবের কাঁধ জখম বলে কেস ফাইলের ব্যাগটা অধিরাজের কাঁধেই ঝুলছিল। সে এবার একটু লজ্জিত হেসে বলল, "আরে হ্যাঁ! ব্যাগটা তো আমার কাছে। আরেকটু হলেই ভুলে মেরে দিচ্ছিলাম।" অর্ণব কোনও উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল। মনে মনে অবশ্য বলল, "আমি আছি কী করতে!"

অধিরাজ অফিসার দাশগুপ্তের মৃতদেহের ছবিটা নাকের সামনে তুলে ধরে৬ খুব মন দিয়ে কী যেন দেখছে। তারপর একটু আত্মমগ্নভাবেই ছবিটা অর্ণবের দিকে এগিয়ে দিল, "লক্ষ্য করো অর্ণব, অফিসার দাশগুপ্তের লাশের হাতে নীল রঙের কিছু একটা লেগে আছে। নীল কালিও হতে পারে, নীল রঙও হতে পারে। এই ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালো আর নীল রঙ মিশিয়ে আঁকা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো উনি কিছু লিখেছিলেন। তখনকার দিনে ফাউন্টেন পেনের খুব চল ছিল। হয়তো পেন লিক করে হাতে কালি লেগে গিয়েছিল। আমি কোনও ডায়রি বা চিঠিপত্র এক্সপেক্ট করছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, পুরো পসিবিলিটি আছে, উনি মৃত্যুর আগে এই ছবিটাই আঁকছিলেন যার নীল রঙ ওঁর

হাতে লেগে আছে। আপাতত আমার সন্দেহ এই ছবিটার দিকে যাচ্ছে। ওটা নীল কালি না হয়ে নীল রঙও হতে পারে।"

অর্ণব কোনও কথা না বাড়িয়ে ছবিটা তুলে নেয়। যদিও তার মনে কিছু প্রশ্ন আছে। কিন্তু বেশি প্রশ্ন করা তার স্বভাব নয়। তাই নির্বিবাদে গ্লাভস পরে নিয়ে ছবিটাকে রোল করে এভিডেন্স ব্যাগে পুরল।

"কিছু তো আছেই এই ছবিটায়। অফিসার দাশগুপ্ত'র মতোন লোক এমনি এমনি রাবণের ছবি আঁকবেন বলে মনে হয় না। যমরাজের ছবি হলে তবু বুঝতাম! কিন্তু রাবণ! সামথিং ফিশি।" বলতে বলতেই গটগট করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল অধিরাজ। পিছন পিছন রাবণের ছবি হাতে অর্ণবও।

একতলায় বিশেষ কিছু আর দেখার নেই। স্টোররুম একটা আছে অবশ্য। একঝলক দেখেই বোঝা যায়, সেখানে কিছু থাকার সম্ভাবনা কম। মাকড়সার জাল, ঝুল ভর্তি স্টোররুমে আজ পর্যন্ত মানুষ তো দূর, একটা ইঁদুরও ঢুকেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, অধিরাজ অত্যন্ত নাছোড়বান্দা লোক। সে স্টোররুমটাও রীতিমতো ঘেঁটেঘুঁটে দেখল। স্টোররুমের দেওয়াল, করিডোর এমনকি একতলার টয়লেটের দেওয়ালও ঠুকে ঠুকে দেখল কোথাও ফাঁপা কোনও স্পেস আছে কি না। হলঘর আর স্টুডিও ও বাদ গেল না। কিন্তু কিছুই না পেয়ে শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে বলল, "নাঃ। এখানে আর কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। দোতলায় চলো।"

অর্ণব জিজ্ঞাসা করতেই যাচ্ছিল 'আর কিছু' তো দূর, আদৌ কি কিছু পাওয়া গেল! শুধুমাত্র একটা অর্ধ সমাপ্ত রাবণের ছবিতে কি খুনীর পরিচিতি পাওয়া যাবে? কিন্তু অধিরাজের মুখের অবস্থা দেখে বেমালুম চেপে গেল। তার চোখ চিন্তামগ্ন। মাঝে-মধ্যেই আপন মনে কী যেন বিড়বিড় করছে। তার ভাবসাব দেখে অর্ণব আর কোনও কথা বাড়ায় না। দোতলায় উঠতেই যথারীতি বিরাট করিডোর। অর্ণব মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। এত গাদাগুচ্ছের করিডোরের কী দরকার ছিল! তার ওপর দেওয়ালগুলো এত চওড়া যে এখানে আদৌ সূর্যের আলো ঢোকে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এবং গঠনটাও কেমন প্রাচীন দূর্গগুলোর মতো। অফিসার যেখানেই ফাঁকা পেয়েছেন, সেখানেই হয় একগাদা লম্বা

লম্বা কতগুলো শ্বেতপাথরের থাম, নয়তো মূর্তি, নয়তো আর্চ বসিয়ে দিয়েছেন! এ কী জাতীয় ভদ্র সভ্য প্ল্যানিং!

অধিরাজকে সে কথা বলতেই সে হেসে বলল, "ওটা খাস আর্মি ম্যানের রক্তের বদভ্যাস অর্ণব। আমি লক্ষ্য করেছি, সমস্ত আর্মি ম্যানেরা যখন কোয়ার্টারে থাকেন, তখন কোয়ার্টারকেই বর্ডার বানিয়ে ফেলেন। আর স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে ক্যাডেট। এবং যখন নিজের বাড়ি বানান তখন ভাবেন ফোর্ট বানাচ্ছেন। একেই আর্মি ম্যানের সন্তান, তার ওপর এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট! তাঁর কাছে কী এক্সপেক্ট করো তুমি? লক্ষ্য করে দেখো, বাড়িটার প্ল্যানিংটাই বেশ গোলমেলে! চট করে কেউ ভদ্রলোকের নিজের ঘরটা খুঁজে পাবে না। ইনফ্যাক্ট করিডোরগুলোই মাঝে-মধ্যে কনফিউশনে ফেলে!"

"তা ঠিক স্যার।"

"কিন্তু তা সত্ত্বেও খুনী তাঁরও বেডরুমে পৌঁছে গিয়েছিল।" অধিরাজের কণ্ঠস্বর চিন্তান্বিত, "ওঁর নিজেরই তোলা ছবিতে বেডরুমের আয়নায় কাউন্টডাউন লেখা ছিল।"

অফিসার দাশগুপ্তের বেডরুমটা এখনও বত্রিশ বছর আগের মতোই আছে। আকারে বিশাল। মাথার ওপর পেল্লায় একটা ঝাড়বাতি! যদিও এখন মলিন!

কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা যায় যে ভদ্রলোক বাদশাহী মাত্রার শৌখিন ছিলেন। নয়তো বেডরুমে এমন রাজকীয় ঝাড়বাতি কেউ টাঙায় না! বেডকভারটা ধুলোয় নোংরা হয়ে গিয়েছে। বালিশের অবস্থাও অনুরূপ! কিন্তু দেখলে অন্তত চেনা যায়। এখানেও যথারীতি প্রাচীন যোদ্ধাদের মূর্তি দিয়ে ছয়লাপ করেছেন ভদ্রলোক! অর্ণব আর অবাক হয় না। একেই একা মানুষ। তার ওপর এত বড় বাড়িতে থাকতেন। নির্ঘাৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগত বলে মূর্তি দিয়েই ভরিয়ে রেখেছিলেন। এখানে অবশ্য সেই বেঁটে বেঁটে মূর্তি নেই, বরং ব্রোঞ্জের বেশ কিছু লম্বা লম্বা স্ট্যাচু! কয়েকটা আবার গোল্ডেন! যথারীতি সকলের হাতেই অস্ত্র শস্ত্র! কারোর হাতে বর্শা, কারোর হাতে ছুরি। সব মিলিয়ে ছ'টা। এত অস্ত্রশস্ত্র হাতে রাখা মূর্তিও কি আর্মিওয়ালা শখ! নিরীহ মূর্তি-টূর্তি কি পছন্দ ছিল না অফিসার দাশগুপ্তের? সব যোদ্ধাদের মূর্তিই রাখতে হবে!

"অফিসার দাশগুপ্ত'র দেখছি হিস্ট্রি আর অ্যানথ্রোপলজি ফেভারিট - সাবজেক্ট।"

বিছানার ঠিক পাশেই বুক র‍্যাকে থরে থরে সাজানো বই। বেশিরভাগই ইতিহাসের এবং অ্যানথ্রোপলজির। অধিরাজ সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে। আপনমনেই বলল, " নাঃ! কোনও ডায়রি দেখছি না। এমনকি চিঠিপত্রও নয়! তবে ওঁর আই পি এস পরীক্ষার সাবজেক্ট হিস্ট্রি, অ্যানথ্রোপলজি হলে আশ্চর্য হব না! শিশির সেনের বায়োলজি আর ম্যাথ ছিল।"

"বায়োলজি তো আমারও ছিল।"

অর্ণব একটু কুণ্ঠিত স্বরে জানায়। অধিরাজ তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে; "তুমি তো হবু ডাক্তার ছিলে। নেহাৎ পাঁচিল টপকে পালিয়ে এসেছিলে। নয়তো এতদিনে ডঃ চ্যাটার্জীর মতো আধপাগল টাকলু ডাক্তার হতে। বায়োলজি তো তোমার বাঁ হাতের খেল...!"

বলতে বলতেই আচমকা থমকে গেল সে। যেন এক ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে উঠে বসল। স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই তো!"

"কি হলো"

অর্ণব একটু ঘাবড়েই গেল। তার ডাক্তারি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল মনে পড়তেই অধিরাজ এরকম ধাক্কা খেল কেন!

- "কিছু না।" সে যেন একটু বিব্রত, "দাঁড়াও, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।" ছবিটা অবশ্য বত্রিশ বছর আগে তোলা। কিন্তু দৃশ্য হুবহু একই। সেই বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না। তার পাশে বিছানা। পার্থক্য মাত্র দুটো। যখন ছবিটা তোলা হয়েছিল তখন এই আয়নায় রঙ দিয়ে 'দুই' সংখ্যাটা লেখা ছিল। আর ঠিক উল্টোদিকের টিভিটা খোলা ছিল। ছবিতে টিভির স্ক্রিনের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট ধরা পড়েছে। এই মুহূর্তে কোনও নম্বর আয়নায় লেখা নেই, এবং টিভিটাও বন্ধ–

"১৯৮৭ এর অক্টোবরে কোনও ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছিল নাকি?" অধিরাজ ছবির সঙ্গে অকুস্থল মিলিয়ে দেখতে দেখতে বলে, "আয়নায় টিভির স্ক্রিনের একটা স্কোর কার্ড দেখছি।"

"১৯৮৭ তে ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছিল স্যার।" অর্ণব জানায়; "আটই অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল আটই নভেম্বরে।"

- "আই সি!" -

অধিরাজ ছবিগুলো যথাস্থানে রেখে বলল; "বাকি কাউন্টডাউনগুলো জানলায় বা পাঁচিলে লেখা ছিল। চলো, একবার সেই জায়গাগুলোও দেখে...!"

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই একটা অদ্ভুত সন্দেহে থেমে গেল অধিরাজ। তার মাথার চুলে ফুরফুরে হাওয়া খেলা করছে। সে তড়িৎগতিতে পেছনে ফেরে! বেডরুমের একটা জানলা খোলা! ঘরে ঢোকার সময় খেয়াল করেনি। পর্দাটানা ছিল বলে সেদিকে নজরও যায়নি। এখন জোরালো শীতল হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়তেই টের পেল!

সে পা টিপে টিপে জানলাটার দিকে এগিয়ে যায়। গরাদহীন কাচের জানলা। শিশির সেন এ বাড়িতে এলেও জানলা দরজায় বিশেষ হাত দেন না। যদি দিতেন, তবে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ভ্যাপসা বদ্ধ গন্ধটা আসত না। তবে জানলাটা খুলল কে! কবেই বা খুলল?

অধিরাজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, তারা ছাড়া এই বেডরুমে আরও কেউ আছে। তার তীব্র অনুভূতিতে অন্য একজনের উপস্থিতি ধরা পড়ছে। সে সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা একবার দেখে নিল। একগাদা স্থির মূর্তি ছাড়া আর কেউ নজরে পড়ল না। অধিরাজ বিদ্যুৎগতিতে ঝুঁকে পড়ে খাটের তলাটাও চেক করে। নাঃ, কেউ নেই!

"অর্ণব। টেক পজিশন।" সে ফিসফিস করে বলল, "সামথিং ইজ রং।"

অর্ণব বুঝে গেল কী করতে হবে। অধিরাজ ব্যানার্জির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ পর্যন্ত কখনই ভুল ইঙ্গিত দেয়নি। সে হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটাকে তুলে ধরে পজিশন নিল। অধিরাজের দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে আছে সামনের আলমারির দিকে। ওটাই একমাত্র আত্মগোপনের জায়গা! একমাত্র ওখানেই তৃতীয় পক্ষের থাকার সম্ভাবনা! তার তীক্ষ্ণ চোখ বুঝে নিল যতখানি দৃঢ়বদ্ধ থাকার কথা পাল্লাদুটোর, ততটা নেই। চট করে দেখলে বোঝা অসম্ভব, কিন্তু অভ্যস্ত নজরে ধরা পড়ল, পাল্লাদুটো সামান্য শিথিল!

অধিরাজের হাতেও চকিতে উঠে এসেছে রিভলবার। সে একেবারে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল আলমারির দিকে। তার ঠিক পাশেই অর্ণব। কিন্তু দু'জনেই এমন

পজিশনে দাঁড়িয়ে যাতে আলমারির ভেতর থেকে আকস্মিক আক্রমণ এলেও কভার নিতে পারে। অধিরাজ লিড করছে, অর্ণবের কভারের দায়িত্ব। অধিরাজ অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে, বিদ্যুৎবেগে টান মেরে খুলে ফেলল আলমারির পাল্লা!

শুধুমাত্র পাল্লাদুটো খোলার অপেক্ষা! সঙ্গে সঙ্গেই আলমারির ভেতরের ব্যক্তিকে দেখা গেল। আলমারির গায়ে ঠেস দিয়ে কোনমতে দাঁড়িয়েছিল। পাল্লা খুলতে না খুলতেই একেবারে হুড়মুড়িয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। এক দাড়িওয়ালা পুরুষের নগ্ন দেহ! পিঠের ওপর ক্ষতের দাগ। পিঠে স্ট্যাব করা হয়েছে!

অধিরাজ ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়েছিল। নয়তো লোকটা তার ঘাড়ের ওপরই উলটে পড়ত। কিন্তু এবার শশব্যস্তে এগিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ গ্লাভস পরে ফেলেছে দু'জনেই। দেহটাকে চিৎ করে ফেলতেই কয়েক হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিক শক! মৃত ব্যক্তি তাদের অতি পরিচিত! এবং তার বুকের ওপর ফের ছুরির আঘাতে লেখা আছে একটাই সংখ্যা! পাঁচ! ছুরির ক্ষতস্থান ও ছুরির আঁকিবুকির ওপর থেকে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

"ওঃ ঈশ্বর!" অধিরাজ অভ্যাসবশত বসে পড়ে লোকটার নাকের কাছে হাত রেখে পরীক্ষা করে। ঘাড়ের রগ আর পালস দেখে প্রচণ্ড হতাশায় মাথা নাড়ল সে;"ডেড লাইক আ ডোডো!"

অর্ণব তখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না! মৃতদেহটাকে না চেনার কোনও কারণই নেই। বেশ কয়েকবছর ধরেই ওয়ান্টেড লিস্টে আছে। এবং সম্প্রতিই তার হুলিয়া জারি হয়েছে। এই লোকটাকে আকাশ পাতাল এক করে খুঁজে চলেছে সি আই ডি, হোমিসাইড! সে কোনওমতে উচ্চারণ করল, "বেবো ব্রিগ্যানজা!"

অধিরাজ কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে বেবো ব্রিগ্যানজার লাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সতর্ক। মন এখন বিপদ সঙ্কেত দিচ্ছে। তার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় শুনতে পেল কোনও ধারালো অস্ত্রের হাওয়া কেটে আসার সাঁই সাঁই শব্দ!

- "অ:র্ণ:ব!"

সে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই বিদ্যুৎগতিতে ডাইভ মারল অর্ণবের দিকে। তাকে জাপ্টে ধরেই ভল্ট খেয়ে সরে গেল আলমারির সামনে থেকে। ঘটনার আকস্মিকতায় অর্ণব কিছুই বুঝতে পারেনি। এবার সভয়ে দেখল একটা তীক্ষ্ণ ছুরি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে বিঁধল আলমারির গায়ে। যেখানে সে বসেছিল, ঠিক সেই উচ্চতায়! অর্ণব কিংকর্তব্যবিমূঢ়! অধিরাজ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওখান থেকে তাকে সরিয়ে না নিত তবে এতক্ষণে তার কণ্ঠনালী এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাওয়ার কথা! নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ভগবানও বাঁচাতে পারতেন না। অধিরাজ তাকে মেঝেতে ফেলে রেখেই এবার দুরন্ত রিফ্লেক্সে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে সে ট্রিগার টিপল মূর্তিগুলোকে লক্ষ্য করে। পরপর দুটো ব্রোঞ্জের মূর্তির মাথায় বুলেট লেগে মূর্তিগুলো প্রবল ধাতব শব্দে উলটে পড়েছে। তৃতীয়টা সম্ভবত মাটির বা প্লাস্টার অব প্যারিসের ছিল। গুলির আঘাতে চুরমার হল। ফায়ারিঙের চোটে টেঁকা দায়। মূর্তিগুলোর ধাতব ধ্বনিতে পড়ার শব্দ বা ফেটে যাওয়ার জোর আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম। কিন্তু অধিরাজ থামল না। সে চোখের পলক পড়ার আগেই মূর্তিগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি করে চলেছে।

পাঁচ নম্বর মূর্তিটা ফেটে চৌচির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছ'নম্বরের সোনালি মূর্তিটা ফট করে চোখ মেলে তাকাল! সোনালি ঠোঁট প্রসারিত হল। তার ফাঁক দিয়েই ঝিলিক মারল নৃশংস দন্তপংক্তি। অর্ণব স্পষ্ট শুনতে পেল, মূর্তিটা বলছে...!

"ব্রিলিয়ান্ট!"

অধিরাজ তার দিকে রিভলবার তাক করতেই সোনালি মূর্তি বুঝি সোনালি বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল। দেহটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে সপাটে এক কিক বসিয়ে দিল।

এই অবধি দেখেই অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অধিরাজ যেভাবে কিকটা ডজ করল সেটা দেখে বুঝল বিস্ময়ের শেষ তো দূর, সবে শুরু হয়েছে! সে অত বড় লম্বা দেহটাকে এমনভাবে পিছন দিকে হেলিয়ে দেয় যে মোক্ষম কিকটা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। অর্ণবের মনে হল, অধিরাজের কোমরে কোনও হাড়ই নেই! বরং তার বদলে বোধহয় স্প্রিং ফিট করা! দুর্দান্ত ব্যালান্সড দেহটা কিছু বোঝার আগেই অবিকল স্প্রিঙের মতোই ক্ষিপ্রতায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার মুখে বজ্রমুষ্টির

মোক্ষম পাঞ্চ! লোকটা তাৎক্ষণিক ও দ্রুত প্রত্যাঘাত নিতে না পেরে একেবারে ছিটকে পড়ল!

অর্ণব উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে বন্দুক তাক করল। অধিরাজের হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র। অসম্ভব রাগে তার মুখ ইস্পাত কঠিন। এই লোকটা তাকে বাগে পেয়ে কী কী না করেছে! বিনা কারণে কতগুলো মানুষের প্রাণ নিয়েছে! নরখাদক রাক্ষস! লজ্জিত, অপমানিত, ক্রুদ্ধ অধিরাজ একটি কথাও না বলে ট্রিগারের ওপর আঙুল রাখল।

লোকটা একেবারে কোণ ঠাসা ইঁদুরের মতো দু'জনের দিকে তাকায়। বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে অধিরাজকে সম্মুখ সমরে হারানো অত সহজ নয়। সে মাছের মতো নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে সজোরে হেসে উঠল!

দুই অফিসার এবার একটু ঘাবড়ে গিয়ে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে। পাগলটা এভাবে হাসছে কেন! সন্দেহে অধিরাজের ভুরু কুঁচকে যায়। লোকটা নির্ঘাৎ কিছু ফন্দি এঁটে রেখেছে! যতটা তাকে বুঝেছে তাতে এ খুনী নিখুঁত প্ল্যানিং না করে কিছু করে না। অতএব নিশ্চয়ই কিছু প্ল্যান আছে, যেটা অপ্রত্যাশিত। কিন্তু কী! কিছু গোলমাল তো আছেই!

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল অর্ণব একদম ঝাড়বাতিটার তলাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওদিকে লোকটার হাতের কাছেই ভাঙা মূর্তির হাতের একটা ব্রোঞ্জের পুরনো বল্লম পড়ে আছে। ওটাতে মানুষকে এফোঁড় ওফোঁড় না করা গেলেও ঝাড়বাতির পুরনো ছেঁড়া ছেঁড়া দড়িটা কাটা যাবে।

সর্বনাশ! অধিরাজ প্রায় পাগলের মতোই ছুটল অর্ণবের দিকে। অর্ণব ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে খুনীকেই দেখছে। অন্যদিকে খেয়ালই নেই! আততায়ী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিপ্রহাতে বল্লমটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে ঝাড়বাতির দড়ি লক্ষ্য করে। নিখুঁত টিপ। অভ্রান্ত লক্ষ্য! বহুদিনের প্রাচীন ঝাড়বাতি মুহূর্তের মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মেঝেতে! কাচ ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দে বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল।

তার মধ্যেই অবশ্য অর্ণবকে একটান মেরে ঝাড়বাতির নীচ থেকে সরিয়ে নিতে পেরেছে অধিরাজ। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে দুই অফিসারই জড়াজড়ি করে উলটে পড়ল। খুনী দৃশ্যটা দেখে ফিক করে হাসে, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে গরাদহীন খোলা জানলা দিয়ে এক লাফ! পড়ে থাকা অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে অধিরাজ ফায়ার করেছে। কিন্তু মিস হল। খুনী নিরাপদেই ল্যান্ড করল কার্নিশে। তারপরই দ্রুত পাইপ বেয়ে নেমে গিয়ে দৌড়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

অর্ণব পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো তাকিয়ে আছে খোলা জানলাটার দিকে! একটুর জন্য আজ মরতে মরতে বেঁচেছে! এ লোকটা ঠিক কী জিনিস! ঠিক কে! "আর ইউ ওকে অর্ণব?" —

অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে অর্ণব কোনওভাবে মাথা নাড়ে। মনে হচ্ছে তার হৃৎপিণ্ডটা এবার ফেটেই যাবে। সে এখনও ভাবতেই পারছে না, তাদের চোখের সামনে দিয়ে খুনী ফের পালিয়ে গেল! দুই অফিসারই শুনতে পেল বাইকের জোরালো শব্দ! অর্থাৎ, ফের হাতছাড়া হয়ে গেল দুর্বৃত্ত।

লোকটা তখন বাইক চালাতে চালাতে নিজের জয়ের আনন্দে খিকখিক করে হাসছিল। এমন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়েও মজা! অন্য কেউ হলে জীবনেও ধরতে পারত না যে মূর্তির মধ্যেই নিখুঁত মেক-আপ করে বসে আছে খুনী! আর কী স্টাইল! একেবারে মূর্তিগুলোকে শ্যুট করতে শুরু করে দিল। তাকে চুপচাপ লুকিয়ে থাকার সুযোগই দিল না। সামনে আসতে কীভাবে বাধ্য করল লোকটা! সেক্সি স্টাইল!

এত রাগ কেন প্রিয়তম? একটু আদর করেছি বলে এত রাগ। তবে ফুলশয্যার দিন কী করবে? সেদিন আমায় আটকাবে কী করে? খুনী ঠোঁট কামড়াল। তবে তোমায় রাগলে আরও সেক্সি লাগে! সসস! সিজলিং হট! দাঁড়াও, আরও রাগাবো। এনকাউন্টার করার দরকার কী? নিজের রূপ আর যৌবন দেখাও আমায়। আমি তো এমনিই মরে যাব।

লোকটা সজোরে হেসে উঠল। আপনমনেই বলল, "আসছি সোনা। আর তো ক'টা দিন! এবার এসপার কী ওসপার!"

(২১)

“হারাধনের ছেলে কমতে কমতে মাত্র দুটোতে এসে ঠেকেছিল। তার মধ্যে একটা আবার টপকে গেল! অন্যটা কোথায় কে জানে!” মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে বসেছিলেন ডঃ চ্যাটার্জী। কেসের গতিপ্রকৃতি দেখে তাঁর ব্লাডপ্রেশার বেড়ে গিয়েছে। ডাঙায় তোলা মাছের মতো হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন, “বেবো ব্রিগ্যানজাও গেল। তাহলে বাকি রইল কে? শিশির সেন? জাস্টিস গাঙ্গুলি? না আমি? অর্ণব, ঠিক করে বলো, তুমি নও তো?... ”

হয়তো আরও কিছু বলতেন তিনি। তার আগেই দেখলেন, অধিরাজ কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ' একটা ঢোঁক গিলে বললেন, “না... মানে, আজকে ডিনারে কী খাবার অর্ডার করেছ?”

“তার আগে মেনু তো বলুন ।” অধিরাজ এবার ভ্রূকুটি করেছে, “শ্যামল আর বেবো ব্রিগ্যানজার ফরেনসিক রিপোর্ট কী বলছে?”

“আরে! ওই ভুরু পাকানো তো আমার এক্সপ্রেশন!” ডঃ চ্যাটার্জী মিনমিন করে বললেন, “তুমি দিচ্ছ কেন?” ""

অর্ণবের মনে হল এখন ডঃ চ্যাটার্জী অবিকল আহেলি মুখার্জীর এক্সপ্রেশন দিচ্ছেন। অধিরাজ বিরক্ত হয়ে বলল, “এক্সপ্রেশনের কি কপিরাইট আছে? না আমার ভুরু নেই!”

ডঃ চ্যাটার্জী গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, “তেমন বিশেষ কিছু বলার নেই। বাবুকে যেমন এক ঘায়ে মেরেছিল, বাকি দু'জনকেও তাই মেরেছে। শ্যামলকে বুকে স্ট্যাব করেছে। বেবোকে পিঠে। শ্যামলের তুলনায় বেবোর মরতে বড়জোর পাঁচ সাত সেকেন্ড বেশি লেগেছে। দু'জনের উন্ডেই স্ট্যাবিঙের ক্লিয়ার ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। নিঃসন্দেহে মার্ডার ওয়েপন নাইফই। শেফস নাইফ। উন্ড যথারীতি ছ' ইঞ্চি লম্বা! দেড় ইঞ্চি চওড়া। একদম ক্লিয়ার শট। কোথায় ছুরিটা বসালে কাজ হবে, সে বিষয়ে খুনীর কোনও দ্বিধা ছিল না। তবে ডিফারেন্স একটাই। শ্যামলের ব্লাডে প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম ছিল। বেবোর ব্লাডে প্যাংকুয়োরোনিয়াম নেই, তবে প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল আর কোকেন ছিল। মরার

আগে সে মদ খেয়েছিল। সত্যি কথা বলতে, বেবোর ব্লাডে যে পরিমাণ কোকেন পেয়েছি, তুমি আমি নিলে নির্ঘাৎ এমনিই ফেঁসে যেতাম! ছুরি মারার আর দরকার কী!”

“বেবো ড্রাগ স্মাগলার ছিল ডক।”

- “সেজন্যই তো আরও বেশি আশ্চর্য হচ্ছি!” ডঃ চ্যাটার্জীর কপালে . সত্যিই চিন্তার রেখা, ‘‘সচরাচর ময়রারা নিজেরা মিষ্টি খায় না। কিন্তু বেবো রেগুলার ড্রাগ নিত। এবং তোমার আন্দাজ সঠিকই ছিল। হি ওয়াজ আ গে। বিশ্বাস করবে না, লোকে যে কথায় কথায় বলে, পশ্চাদ্দেশে বাঁশ ঢুকিয়ে দেব; এই হুমকিটা বেবোর ক্ষেত্রে চলত না।”

“কেন?”

অর্ণব কথার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলে। অধিরাজ উত্তরে কী বলবে বুঝতে না পেরে কপালে হাত দিয়ে বসেই পড়ল। ডঃ চ্যাটার্জী এবার পেটেন্ট ভ্রূকুটিটা করেই ফেলেছেন, “কারণ ওর পশ্চাদ্দেশে শুধু বাঁশ নয়, আস্ত বাঁশবাগানটাই ঢুকবে! ইনফ্যাক্ট তার সঙ্গে তুমি, রাজা, পবিত্র, মিস দত্ত, আমি, মিস মুখার্জী মায় খুনী পর্যন্ত ওর পেছনে ঢুকে টুকি টুকি খেলতে পারি! সমকামীদের অ্যানাল সেক্স করার কেস জানো না! এ কে রে! এইমাত্র আঁতুড়ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে এলে নাকি?”

অর্ণব মারাত্মক একটা বিষম কোনওমতে চেপে গেল। অধিরাজ একটু বিরক্ত হয়েই বলল, “আঃ! সবাইকে সব জানতে হবে এমন কোনও কথা আছে? শ্যামল আর বেবোর ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয়েছে?”

“শ্যামলের ক্ষেত্রে রেপ হয়নি। ইনফ্যাক্ট নট আ সিঙ্গল কিস। বেবোর ক্ষেত্রে সিমেন ট্রেস পাইনি। কিন্তু রেপিস্ট যদি কন্ডোম পরে রেপ করে তাহলে আমি কেন, আমার বাপ ঠাকুর্দা চোদ্দপুরুষেরও সাধ্য নেই তা ডিটেক্ট করার! প্লিজ অর্ণব, এবার ‘কেন’ প্রশ্নটা করবে না!” -

অর্ণব অবিকল চোরের মতো ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে জুলজুল করে তাকায়। তিনি গরগর করে ওঠেন, “তুমি ঐ নিষ্পাপ পাপ্পি আইজ নিজের কাছেই রাখো। আমি ওতে গলছি না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমি তোমাকে একদম প্র্যাকটিক্যালি ফান্ডাটা বুঝিয়ে দেব। যত্তসব।”

অধিরাজ এবার সদয়ভাবেই বুঝিয়ে দেয়, "যে কোনও পুরুষ বা মহিলা যদি সেক্সুয়ালি অ্যাকটিভ থাকেন তবে তার প্রাইভেট পার্টসের স্পেস বেড়ে যায়। যারা অ্যানাল সেক্স করেন, তাদের ক্ষেত্রেও সেম ঘটনা। বেবোর অ্যানাস ডেলিবারেটলি সেক্স করার ফলে এতটাই চওড়া হয়ে গিয়েছে যে রেপ হলেও ধরা যাবে না। ডঃ চ্যাটার্জী সিমেন ট্রেস যখন পাননি, তখন না হওয়ার চান্সই বেশি। ও পাবলিক যে সময়ের লোক, তখন কন্ডোম খায় না মাথায় টুপি হিসাবে পরে তা অনেকেরই জানা ছিল না। এই বয়েসে নতুন করে আর রিসার্চ করবে বলে মনে হয় না। ও লোকের যে সব পার্টসই পারফেক্ট আছে; এটাই আশ্চর্যের।"

অর্ণব এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুখে পিঠে দেয়। এ বিষয়ে মরে গেলেও আর একটি শব্দও সে উচ্চারণ করছে না। -

"আমি খুনীর এই মেন্টালিটিটাই বুঝতে পারছি না!" অধিরাজ ছটফট করতে করতে পায়চারি করে, "যে লোক সমকামী, পাগল এবং রেপিস্ট, সে বাবুকে কেন ছেড়ে দিল তা বুঝতে পারি। হয়তো পাগলটার অপরিচ্ছন্নতা, বা কুদর্শন চেহারা তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু শ্যামল যথেষ্ট ম্যানলি চেহারার লোক। চাপ দাড়ি-গোঁফে রীতিমতো হ্যান্ডসাম লাগত তাকে। বেবোকেও দেখতে সুন্দর! উপরন্তু সে নিজেই একজন গে। তবে খুনী তাদের খুন করেও রেপ করল না কেন? ছুঁয়েই দেখল না!"

– "কে জানে!" ডঃ চ্যাটার্জী আইসব্যাগটা টাক থেকে নামিয়ে বললেন, "হয়তো তার লাশগুলোর সামনে বসে ভজন কীর্তন করার প্ল্যানিং ছিল!"

"কী সব যা তা বলছেন!" অধিরাজের রাগ এবার হিংস্রমূর্তি ধরছে দেখে ঢোঁক গিললেন তিনি। মিউমিউ করে বললেন, "আরে, চটছ কেন? আমি তো খুনী নই যে সব কারণ গড়গড়িয়ে বলে দেব!"

অধিরাজ বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। সে এবার অফিসার দাশগুপ্তের আঁকা রাবণের ছবিটা খুব মন দিয়ে দেখছে। চিন্তার ঘোরে মাঝে-মধ্যেই তার চোখ অর্ধনিমীলিত হয়ে আসছে। বারবার কেস ফাইল থেকে ছবিগুলো বের করে কিছু খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তার মাথার মধ্যে নানা ছবি ভেসে ভেসে ওঠে। নানা দৃশ্য। নানা ঘটনাবলী! যে

প্রশ্নগুলো তার মাথার মধ্যে ঘুরছে, আপ্রাণ তার উত্তর জানার চেষ্টা করছে। তার মন বলে, কিছু তো ইঙ্গিত আছে। কিছু আছেই!

বেবো ব্রিগ্যানজার মৃত্যুর পর আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। সি আই ডি সবেগে সুমঙ্গল কিংবা শেয়াল পন্ডিতকে খুঁজছে। কিন্তু এক পাও অগ্রসর হয়নি। শুধু উত্তরপ্রদেশ পুলিস জানিয়েছে যে দু'দিন আগেই লখনৌয়ে সুপারি কিলার সুলেমান পুলিসের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ আরও একজন মঞ্চ থেকে বিদায় নিল। পবিত্র সেইদিন বেবোর কল রেকর্ড ঘেঁটে, লাস্ট কলগুলোকে ট্রেস করার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু বেশিরভাগ কলই শহরের বিভিন্ন পি সি ও থেকে করা! বলাইবাহুল্য, কলারকে কেউ লক্ষ্যই করেনি। আর কলগুলো এমন জায়গা থেকেই করা হয়েছে যেখানে সিসিটিভির সুবিধা নেই!

পবিত্র এবার একটু বিভ্রান্ত, "সর্বনাশিনী কেসে গোটা শহরই প্রায় সাসপেক্ট ছিল। কিন্তু এ কেসে কোনও সাসপেক্টই নেই রাজা! গোটা শহর থেকে একজন খুনীকে ধরতে হবে উইদাউট এনি ক্লু! খড়ের গাদা থেকে সূঁচ খোঁজার অবস্থা হচ্ছে যে! অথচ খড়ের গাদায় আদৌ সূঁচটা আছে কি না তাও জানি না! ব্লাইন্ড কেস ছাড়া আর কী বলব!"

-"রাইট!" অধিরাজও চিন্তিত, "যদি বা বেবো' ছিল, কিন্তু সে পাবলিকও অফ হয়ে গেল!"

"ব্যাপারটা এগজ্যাক্টলি হচ্ছে কী!" পবিত্র'র কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা, "এর মধ্যে আবার তোমার আর অর্ণবের ওপর অ্যাটাক হয়ে গেল! এ কীরকম খুনী! বেবোর লাশ ডাম্প করে কেটে পড়লেই তো হয়! গোল্ডেন পেইন্ট মেরে মূর্তি সেজে বসে থাকার কী প্রয়োজন? গো অ্যাজ ইউ লাইক কম্পিটিশন হচ্ছে নাকি?"

"বেবোকে সম্ভবত ডাম্প করা হয়নি।" অধিরাজ একটু ভেবে নিয়ে বলে, "আমরা বাইরে থেকে বাইকের শব্দ শুনেছিলাম। বাইকে করে লাশ ডাম্প করা যায় না। খুনী ডেফিনিটলি জানত যে আমরা রথীন দাশগুপ্তের বাড়িই যাচ্ছি। সে ওখানেই বেবোকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সম্ভবত ওখানেই ওকে এতটাই মদ্যপান করায় আর কোকেন দেয় যে তার আর কিছু করার ছিল না। তারপর তাকে খুন করে আলমারির ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে

আমাদের জন্য অপেক্ষাই করছিল। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, অর্ণবকে অ্যাটাক করার প্রতীক্ষাতেই বসেছিল।"

"কী আশ্চর্য! কেন!"

"কারণ তার টম অ্যান্ড জেরি খেলার শখ হয়েছে।" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "ইঁদুর বিড়ালের যুদ্ধ তার ভারী পছন্দ। আর অর্ণবকে চূড়ান্ত অপছন্দ।"

– "তার মানে সে একদম ডেফিনিটলি জানত যে তোমরা অফিসার দাশগুপ্তের বাড়িতেই যাচ্ছ।"

"অফকোর্স জানত। জানত বলেই বেবোকে ওখানে ডেকে এনে, মেরে, চমৎকার ডিজাইন করে বুকে 'পাঁচ' লিখেছিল। আমাদের শক দেওয়ার জন্যই এত কাণ্ড করেছে। সে শিওর শট জানত আমরা লাশটা খুঁজে বের করবই। আর অর্ণবকেও ওখানেই পাওয়া যাবে। সবই সে জানত পবিত্র! সে আমাদের ফলো করেনি, বরং আগে থেকেই ওখানে বসে ছিল।"

– "লোকটা জ্যোতিষী না স্বয়ং ঈশ্বর রাজা!" পবিত্র অবাক, "কী করে সে জানতে পারে যে স্লটার-হাউজে আমরা রেড করব! বত্রিশ বছর ধরে যে আইডিয়া কারোর মাথায় আসেনি, সে আইডিয়া তোমার মাথায় আসবে সে জানল কী করে? কী করে জানতে পারে যে বেবোকে আমরা খুঁজছি! জানত বলেই ওকে মেরে কাউন্টডাউন লিখেছে।"

"এগজ্যাক্টলি। ওর মনের ভাবটা অনেকটা এরকম, এত কষ্ট করে বেবোকে খুঁজছিস? এই নে! এবার বেবোকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যা।"

"ঠিক তাই। কিন্তু আমার প্রশ্ন, সে এত কিছু জানছে কী করে?

তোমরা যে অফিসার রথীন দাশগুপ্তের বাড়ি যাচ্ছ, সেটাই বা জানতে পারল কীভাবে? আর আস্ত একটা মানুষ গোল্ডেন পেইন্ট মেরে মূর্তি সেজে বসে রইল, তোমরা টের পাওনি! আলো ছিল না?"

- "আলবাত ছিল। কিন্তু মেক-আপটা কী করেছে সেটা তো দেখবে পবিত্র! গোল্ডেন পেইন্ট মেক-আপ। রঙটা এতটাই গ্লসি যে রাতের আলোয় ঝলমল করে। ব্রোঞ্জ হলে তবুও মুখের ভাঁজ বা রিঙ্কল বোঝা যায়। কিন্তু গোল্ড রঙটাই এত গ্লেজি যে চড়া আলোয়

ঠিকরে পড়ে। মেটালিক কালার চোখকে বিভ্রান্ত করতে ওস্তাদ। আর গোল্ড মেটালিকের চূড়ান্ত। মুখে মাখলে গোটা মুখটাই ধাতুর তৈরি মনে হয়। চোখে দেখে পার্থক্য বোঝা মুশকিল।”

“কিন্তু তোমরা অন্তত ও ঘরে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ছিলে। সেই সময়টুকুতেও সে সামান্যও নড়েনি! একটা নিঃশ্বাসও নেয়নি! একটা জীবিত লোক একই পোজে, দমবন্ধ করে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কী করে! যেখানে আশেপাশে দু'দুটো পুলিস অফিসার হেঁটে বেড়াচ্ছে সেখানে একটুও উত্তেজিত না হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! লোকটার নার্ভ ঠিক কী দিয়ে তৈরি রাজা?”

– “সেটা তো আমারও প্রশ্ন পবিত্র। একের পর এক প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু এখনও কোনও উত্তর নেই।” সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “তুমি বরং সুমঙ্গল বা শেয়াল পন্ডিতকে খুঁজে বের করো প্লিজ। ও লোকটাও যদি পটল তুলে থাকে তবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া ছাড়া আর আমার কোনও উপায় থাকবে না।”

“কিপ ইওর ফিঙ্গার ক্রসড! খুনী যেভাবে তোমার ব্রেইন ম্যাপিং করছে তাতে শেয়াল পন্ডিতের পটল তোলার চান্সটাই প্রবল।” - হতাশ হয়ে ফোন কেটে দিয়েছিল অধিরাজ। তারপর থেকেই তার মেজাজ আবার বিগড়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই প্রায় খ্যাঁক করে তেড়ে আসছে। অর্ণব তার ঘরেই আপাতত ঘাঁটি গেড়েছে। সে বেচারি বালিশ-ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে অধিরাজের বেডরুমের সোফায় শোওয়ার তাল করছে দেখে ফের চটে গেল অধিরাজ, “তুমি আবার সোফাতে শুতে যাচ্ছ কোন আনন্দে! এত বড় ডাবল বেড আছে কী করতে! আমি একা শুয়ে শুয়ে ভলিবল খেলব? তুমি ফিল্মের নায়ক নাকি যে হিরোইনের সতীত্ব রক্ষা করার জন্য বিছানা ছেড়ে সোফায় যাচ্ছ!”

অর্ণব আমতা আমতা করে জানতে চায়, “আমি আপনার সঙ্গে এক বিছানায় স্যার...!”

“কেন? আমি তোমায় রেপ করব?”

এরকম উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর কী দেওয়া যায় তা বেচারা বুঝে উঠতে পারল না। অধিরাজ আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, “আর রইল আমার ভার্জিনিটির প্রশ্ন! সে তো......।” বলতে বলতেই সে ফুঁসে উঠে দেওয়ালে এক ঘুষি মারল; “লোকটা আমায় মেরেই ফেলল না

কেন! ওঃ! যে ছুরিটা তোমায় মেরেছে, সেটাই আমার গলায় বসাতে কী হয়েছিল!" অর্ণব নীরব সহানুভূতিতে তার হাত দুটো ধরে ফেলে। অধিরাজ রাগে, ঘৃণায় যন্ত্রণা জর্জরিত কণ্ঠে বলল, "তুমি বুঝবে না অর্ণব! আমার সঙ্গে যা হয়েছে, তা জানলে সবাই হাসবে। মেয়েদের মলেস্টেশন, রেপ এখন প্রায় রেগুলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন মেয়ের ওপর অত্যাচার হলে সবাই তাকে সহানুভূতি দেখায়, দুঃখ পায়, তার ওপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। কিন্তু একজন পুরুষের ক্ষেত্রে কী! অত্যাচারিতের কোনও জেন্ডার হয় না, তা আমাদের সমাজ মানে না। পুরুষদের ওপরও যে সেক্সুয়াল মলেস্টেশন বা অ্যাবিউজিং হতে পারে তা কেউ মানতেই রাজি হবে না, সহানুভূতি তো দূর। কিন্তু পুরুষরা কি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের শিকার হতে পারে না? আমি তো হয়েছি। কিন্তু কাউকে বললে সে স্রেফ হাসবে বা ব্যঙ্গ করবে। আমি কোনওদিন কাউকে এ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করতে পারব না। কাউকে কোনওদিন জানাতে পারব না কী ভয়ঙ্কর ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে গিয়েছি! আজীবন এই চূড়ান্ত ঘৃণ্য, লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা আমায় গোপন রাখতে হবে! আদারওয়াইজ, আই উইল বি আ ক্লাউন টু সোসাইটি!"

"স্যার।" অর্ণব শান্তস্বরে বলে, "প্লিজ, ওসব আর মনে করবেন না।"

"কী মনে করব না!" অধিরাজ প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে, "সবসময় আমার মনের মধ্যে ঐ লোকটাই হেঁটে বেড়াচ্ছে! তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন থেকে ছুঁলে আমার মনে হয়, ঐ লোকটাই নয়তো! কিচ্ছু বলতে পারছি না, তোমরা সবাই আমায় হাসির খোরাক বানাবে, এই ভয়ে চুপ করে থাকি। কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি ভয় পাচ্ছি অর্ণব। কোনও পুরুষের ছায়া দেখলেও আঁতকে উঠছি। মনে হচ্ছে ও আমাকে ফের..." বলতে বলতেই দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরল সে। মাথার চুল টেনে ধরে বলল, "আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি! যত ভাবছি ভুলে যাব, কিন্তু পারছি না...! আমি এবার পাগল হয়ে যাব অর্ণব...!"

উপায় নেই! অর্ণবের কাছে ডঃ চ্যাটার্জীর দেওয়া সেডেটিভটা তখনও ছিল। সে আর একটা কথাও না বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল। অধিরাজ বিস্মিত, মর্মান্তিক দৃষ্টিতে তাকায়, "এ কী!"

"সরি স্যার!"

সে অধিরাজের দু'কাঁধে চাপ দিয়ে তাকে শুয়ে পড়তে বাধ্য করল, "আপনার এখন রেস্ট দরকার।"

"কিন্তু...!"

"প্লিজ স্যার। ঘুমোনোর চেষ্টা করুন।" যতক্ষণ না অধিরাজ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ততক্ষণ তার পাশেই স্থির হয়ে বসেছিল অর্ণব। তার মুখে চরম আক্ষেপ। সত্যিই এই বিশ্রি ঘটনাটা ক্রমাগতই অধিরাজের মনের মধ্যে জাঁকিয়ে বসছে। এমনকী সেডেটিভ দেওয়া সত্ত্বেও ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠছে সে। বারবার মাথা নেড়ে বলছে, "না।...না! না!"

অর্ণব আর থাকতে না পেরে অবস্থাটা ডঃ চ্যাটার্জীকে ডেকে এনে দেখায়। তিনি অধিরাজের ঘর্মাক্ত, ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "এটা হওয়াই স্বাভাবিক অর্ণব। আর এ ট্রমা থেকে সহজে বেরোতেও পারবে না। আমি একটি ছেলেকে দেখেছিলাম যে শৈশবে মলেস্টেড হয়েছিল। যখন ঘটনাটা ঘটে তখন তার বয়েস মাত্র সাত কী আট। কিন্তু সে ছেলে জীবনেও বিয়ে করেনি। লজ্জায় অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলতেও পারেনি। কিন্তু, রাজাকে টাচ করলে ও যেমন ছিটকে যায়, সে ছেলে একদম কোল্ড হয়ে যেত! সেক্স জিনিসটাই তার কাছে একটা দুর্বিষহ জিনিস হয়ে উঠেছিল। ভালোবাসার মানুষকে সে চুমু খেতে পারত না, স্পর্শ করতে পারত না; কারণ সে ভাবতেই পারত না যে সেক্স জিনিসটাও সুন্দর হতে পারে। ওর কাছে 'সেক্স' আতঙ্কের আরেক নাম! ফোবিয়া! আর কনজুগাল লাইফ অত্যাচার! সেই ছোট্ট শিশুগুলোর কথা একবার ভেবে দেখো, যাদের ওপর এই জিনিস হয়। বাচ্চা মেয়েদের ক্ষেত্রে তবু ছাড় আছে, কারণ তারা মেয়ে। কিন্তু বাচ্চা ছেলেগুলোর কথা কে শুনবে? লজ্জার মাথা খেয়ে কাউকে কিছু বলতে পারে না। যদি বা সহ্য করতে না পেরে বলেও ফেলে; ছেলের রেপের কথা শুনে লোকে হাসবে ভেবে বাবা-মায়েরাও 'চুপ চুপ' করে বেচারিকে চুপ করিয়ে দেন। ছেলেগুলো নিজের মনে মনে গুমরে মরে! এটাই আমাদের সমাজ অর্ণব। আর এই মুহূর্তে সেই সামাজিক ব্লান্ডারের সুদূরপ্রসারী ফলাফলই তুমি দেখছ! রাজা ঠিকই বলেছে। এ ক্রিমিনালের পাস্ট হিস্ট্রিতে নির্ঘাৎ সেক্সুয়াল মলেস্টেশন আছে।"

"স্যারের ক্ষেত্রেও কি এরকম ফোবিয়া.........?"

ডঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়েন, "হতে পারে। একেই সর্বনাশিনী কেসে বেচারি প্রিয়া বাজাজের ধাক্কাটা হজম করে উঠতে পারেনি, তার ওপর শিশির সেনও বেছে বেছে এই কেসটাই দিয়েছেন। ওর মনের অবস্থা আমরা কেউ ভাবতেও পারছি না অর্ণব। সেই ছেলেটির মতো ও স্পর্শকাতর অবস্থাতেই আছে। তাড়াতাড়ি টেনে না বের করলে এর এফেক্ট অনেকদূর যাবে।" বলতে বলতেই চাপা গলায় বললেন, "কিন্তু তুমি আমি আছি কী করতে? চেষ্টা করব। তুমি কফি খাবে?"

"কে বানাবে? মিস দত্তও তো এখানে নেই!" বেচারি অর্ণব কিছু না ভেবেই কথাটা বলেছিল। কিন্তু শোনামাত্রই ডঃ চ্যাটার্জী ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে বললেন, "কেন? নতুন লেডি অফিসারের হাতের কফি না হলে মুখে রুচছে না তোমার! আমি কফি বানাতে পারি না?"

– "না... না! ঠিক আছে।" -

অর্ণব প্রসঙ্গটাই ঘুরিয়ে দেয়, "কিন্তু আপনি কফি খাবেন কেন?"

"বাঃ। রাত জাগতে হবে না?" তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে নিজের লাইসেন্সড রিভলবারটা বের করে এনে দেখালেন, "এটা ইউজ করার সময় এসে গিয়েছে। রাজার সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে ও পাবলিক সহজে পেরে উঠবে না। কিন্তু রাতটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। ওর যা অবস্থা দেখছি, সেডেটিভের ডোজ না দিলে ঘুমোতে পারবে না। আর ওকে না হয় তুমি বাঁচাবে, কিন্তু তোমায় বাঁচাবে কে?"

অর্ণব কিছুক্ষণ হাঁ করে ডঃ চ্যাটার্জীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আমতা আমতা করে বলে, "আপনি ওটা চালাতে পারেন তো"

তাকে সটান গানপয়েন্টে রেখে বললেন ভদ্রলোক, "ডেমো দেখাব?"

সেদিন রাত থেকে দু'জনেই সশস্ত্র প্রহরী হয়ে সতর্ক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। গোটা বাড়িতে এক তরুণ আর এক প্রৌঢ় সারারাত হাতে গুলি ভরা রিভলবার নিয়ে পাহারা দিয়ে বেড়ায়। দু'জনেরই মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রাণ থাকতে কিছুতেই আততায়ীকে অধিরাজের ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেবে না। তার জন্য অন্তত তাকে আরও দুটো যুদ্ধ করতে হবে। অর্ণব বা ডঃ চ্যাটার্জীর জানা নেই যে সেডেটিভের ডোজ দেওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় মানুষটা

মধ্যরাতে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। যখন তারা দু'জন টহল দিতে ব্যস্ত, তখন সেও বিছানায় বালিশ, কোলবালিশ দিয়ে নকল মানুষ সাজিয়ে, ব্ল্যাঙ্কেট চাপা দিয়ে রিভলবার নিয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। নিশ্চুপে দীর্ঘদেহী মানুষটা অর্ণব আর ডঃ চ্যাটার্জীর ওপর ওদের অলক্ষ্যেই সতর্ক নজর রাখছে। ওদের কারোর ওপর আততায়ীর অভিশপ্ত দৃষ্টি পড়তে দেবে না সে! জান কবুল! কাউন্টডাউন অবশ্য থেমে নেই। বেবোর রক্তাক্ত লাশে 'পাঁচ' সংখ্যাটার পর, ফের বাড়ির মূল দরজায় লাল রঙ দিয়ে লেখা 'চার', আর গেটের ওপর কালো দিয়ে 'তিন' সংখ্যাটা দেখা গেল। অপরাধী বাড়ির ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে না ঠিকই; অথচ প্রতি মুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে। মিডিয়ায় উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। অধিরাজ বিরক্ত হয়ে ফোন অফ করে রেখেছে। কিন্তু অর্ণবের ফোন দিন রাত পাগলের মতো বাজছে। বিশেষ করে রোজ ভোরের আলো ফোটার আগেই অধিরাজের মায়ের কান্না জড়ানো স্বর ভেসে আসে ফোনের ওপ্রান্ত থেকে, "আমার ছেলেটা বেঁচে আছে তো

অর্ণব খুব চাপা স্বরে বলে, "উনি ঠিক আছেন কাকিমা। ঘুমোচ্ছেন।"

"তুমি ওর সঙ্গে আছ তো?"

মায়ের মন ক্ষণিকের শান্তি পেলেও, স্থির থাকে না। তাই পরদিন আবার ফোন, আবার সেই একই প্রশ্ন, ছেলেটা বেঁচে আছে তো?"

"এই আটচল্লিশ ঘণ্টা যে কীভাবে কেটেছে তা শুধু এই তিনটে মানুষই জানে! অর্ণবের বুকের ভেতরে যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে। আবার আজ রাতে, কিংবা ভোরে কেউ চুপি চুপি এসে লিখে যাবে আরেকটা সংখ্যা, দুই'!

'ওদিকে অধিরাজ তখনও চিন্তামগ্ন । তার চোখ বুজে এসেছে। আঙুলগুলো স্থির। মাথার মধ্যে পবিত্র'র প্রশ্নটা এসে ধাক্কা মারছে – "লোকটা জ্যোতিষী না স্বয়ং ঈশ্বর রাজা!"

অর্ণব আর ডঃ চ্যাটার্জী বেশ কিছুক্ষণ মগ্ন মৈনাক হয়ে বসে রইলেন। এখন কোনও কথা বললেই অধিরাজ নির্ঘাৎ খ্যাঁক করে উঠবে। ওদিকে ফরেনসিক এক্সপার্টের আবার চুপ করে বসে থাকা স্বভাবেই নেই। তিনি অর্ণবকে ফিসফিস করে বললেন, "কে খাবার অর্ডার করেছে? তুমি করলে ঠিক আছে। রাজা করলে আজ কপালে হরিমটর...!"

অর্ণব ইশারায় তাঁকে আশ্বস্ত করে যে ডিনার সে-ই অর্ডার করেছে। আপাতত তিনি যেন চুপ করেন। নয়তো কপালে দুঃখ আছে।

"অর্ণব।"

এতক্ষণ সোফায় দেহটাকে শিথিল করে বসেছিল অধিরাজ। এবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মতো প্রায় লাফ মেরে উঠে বসেছে, "রাবণের ছবিটায় কোনও অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছ ।"

ঘুরে ফিরে সেই রাবণেই এসে কাঁটা আটকাল! অর্ণব অবাক, "না তো স্যার!"

– "এত বড় গোলমালটা দেখোনি!" অধিরাজ উত্তেজিত, "আজ পর্যন্ত কোনও ছবিতে রাবণকে গোঁফলেস দেখেছ?"

- "হে রা-ম!" ডঃ চ্যাটার্জী টাক চাপড়ালেন, "এখানে তো রাবণের মুখই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, গোঁফ কী করে দেখব!"

"ন'টা মাথায় দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐ কোণের মাথাটা দেখুন।" সে আঙুল দিয়ে সর্বশেষ মাথাটা চিহ্নিত করে। ঐ মাথাটায় খানিকটা হলেও রাবণের মুখ দেখা যাচ্ছে। ডঃ চ্যাটার্জী আর অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল সত্যিই দশ নম্বর মাথায় রাবণের গোঁফ নেই!

"একটা মাথায় যখন গোঁফ নেই, তখন বাকি ন'টা মাথাতেও নেই।" অধিরাজ বলল, "আর আমাদের কিলার যতগুলো মানুষকে অত্যাচার করে মেরেছে তাঁদের কারোরই গোঁফ নেই। ডাক্তার, এক্স আর্মি অফিসার থেকে শুরু করে অফিসার দাশগুপ্ত অবধি সবার ছবি দেখুন। সবাই ক্লিন শেভড়! আর এজন্যই সে বাবু, শ্যামল আর বেবোকে খুন করলেও ছুঁয়ে দেখেনি। কারণ ঐ তিনজনেরই দাড়ি গোঁফ ছিল! বিড়ালছানার গোঁফ কাটার রহস্যটা বুঝেছেন এবার!"

-"পোগোনোফোবিয়া!" ডঃ চ্যাটার্জীর চোখ বিস্ফারিত, "লোকটার দাড়ি গোঁফে ভয় আছে! দাড়ি গোঁফওয়ালা পুরুষ তাকে অ্যাট্রাক্ট করে না। ইনফ্যাক্ট দাড়ি গোঁফ তার চূড়ান্ত অপছন্দের।" ,

"এখন বুঝতে পারছি! বুঝতে পারছি!..." অধিরাজের কণ্ঠস্বরে প্রবল উত্তেজনা, "সব মিলে যাচ্ছে। সব একটু একটু করে মিলে যাচ্ছে!"

- "মা-নে!"

ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় লাফ মেরে ওঠেন, "সব বুঝে গিয়েছ? কে এসব করছে তা ও বুঝেছ? কী মিলছে?"

– "কিছুটা বুঝেছি। একটু কনফিউশন আছে। আশা করছি, সেটাও বুঝে যাব"। অধিরাজ বলে, "আপনি শুধু এই পেইন্টিংটা কাল ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট দিন। জিজ্ঞাস্য বিষয় একটাই। ছবিতে কার কার হাতের ছাপ আছে!"

এই ডঃ চ্যাটার্জী কোনও প্রশ্ন না করেই বাধ্য ছেলের মতোই মাথা নাড়লেন। বুঝতে পেরেছেন ঘটনা এবার শেষের পথে মোড় নিয়েছে।

— "অর্ণব, রাইটিং প্যাড। কুইক!" অধিরাজ দ্রুতহাতে বুক পকেট হাতড়াচ্ছে দেখে অর্ণবের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে। কিন্তু অধিরাজ তার অসন্তোষকে পাত্তা না দিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে। ইশারায় তাকে কথা বলতে বারণ করে। অর্ণব হাঁ করে দেখল, সে তার বুকপকেট থেকে রুপোলি রঙের পার্কার ফাউন্টেন পেনটাকে বের করে এনেছে। এই পেনটা সবসময়ই তার পকেটে থাকে, যদিও বিশেষ কোনও কাজে লাগে না! বাবা জন্মদিনে আদর করে এই বিশেষ পেনটা গিফট করেছিলেন বলে অধিরাজ অষ্টপ্রহর এই পেনটাকে বুকপকেটে নিয়ে ঘোরে। 'শো' আর ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট ছাড়া পেনটার কোনও কাজ নেই। অথচ আজ সেই পেনটাই এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন কে জানে! অর্ণব তাড়াতাড়ি রাইটিং প্যাড এনে দিল। অধিরাজ পেনটার ক্যাপ খুলে কিছু লেখার চেষ্টা করছে। কিন্তু পেন থেকে একফোঁটাও কালি পড়ল না। হিজিবিজি কাটল, নিজের নাম লেখার চেষ্টা করল। অথচ পেনের মুখে কালির 'ক'ও নেই! সে এবার পেনটাকে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। এবার অর্ণবের চোখেও পার্থক্যটা ধরা পড়ল। পেনটার গায়ে সূক্ষ্মভাবে অধিরাজের নামের আদ্যাক্ষর দুটো লেখা থাকে। এ বি। এই পেনটায় নেই! ডঃ চ্যাটার্জী ভেবে পেলেন না অধিরাজ খামোকা এই সাধারণ পেনটার পেছনে পড়েছে কেন! এরকম পার্কারের কলম মার্কেটে হাজার হাজার মেলে। আর শীতে কলমের কালি হয় শুকিয়ে গিয়েছে, নয়তো কালি নেই। এতে এত উত্তেজিত হওয়ার কী হল! তিনি অধৈর্য হয়ে কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই মাথা নেড়ে বারণ করল অধিরাজ। ইশারায় বলল, "চুপ!"

সে এবার ফাউন্টেন পেনটাকে খুলে ফেলেছে। কিন্তু পেনের ভেতরটা দৃশ্যমান হতেই যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! কী সর্বনাশ! কোনও কালির টিউব নেই তার ভেতরে। বরং ওটা কোনওরকম পেনই নয়। হাই ডেফিনিশনের ওয়্যারলেস স্পাই মাইক্রোফোন! অথচ বাইরে থেকে দেখলে অবিকল পেন! পার্থক্য বোঝার উপায়ই নেই!

ডঃ চ্যাটার্জীর মাথায় হাত। তাঁকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই অধিরাজ দ্রুতবেগে নিজের বেডরুমের দিকে দৌড়ল। পাঁচ মিনিট পরে যখন ফিরে এল, তখন তার হাতে পেনটা আর নেই। ডঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ কোনও কথা না বলতে পেরে হাঁসফাঁস করছিলেন। এবার ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন, “কথা বলতে পারি?”

“নিশ্চিন্তে বলুন।” এবার অধিরাজ হেসে নিজেই বলে ওঠে, “ওটা এখন আমার বন্ধ বেডরুমের, বন্ধ আলমারির লকারের মধ্যে কাপড় দিয়ে জড়ানো আছে। আপাতত কাজ করবে না।”

“এতক্ষণে বুঝলাম, লোকটা ফলো না করেও সব জানতে পারছিল কী করে! ইনফ্যাক্ট ফলো করার দরকারই নেই। ও বাড়িতে বসেই সব জানতে পারছিল।”

অর্ণবের

প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসছে, “কিন্তু প্ল্যান্ট করল কখন!” – “আমাদের সেই ইভটিজারের সুন্দরী শিকারটিকে মনে আছে তোমার? যখন ডঃ চ্যাটার্জীর জরুরি তলব পেয়ে আমরা ফরেনসিক ল্যাবের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন মাঝরাস্তায় সেই বাইক আরোহী, আর সুন্দরী মেয়ের সিনটা মনে আছে?” -

অর্ণবের চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা! এক বাইক আরোহী একটি মেয়েকে রাস্তায় অশ্লীল গান গেয়ে টিজ করছিল! মেয়েটা জড়িয়ে ধরেছিল অধিরাজকে...!

অর্ণবের মনে হচ্ছিল সে এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। এইজন্যই সেই সুন্দরী একেবারে সাপ্টে ধরেছিল অধিরাজকে। তখনই পেনটা পাল্টানোর সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। অথচ দৃশ্যটা এতটাই স্বাভাবিক, মেয়েটির মনস্তাত্বিক দিক থেকে ও মানবিক দিক দিয়ে এতটাই স্বতঃস্ফূর্ত যে একটুও সন্দেহ হয়নি! কী মারাত্মক প্ল্যানিং!

“তার মানে... ঐ ইভটিজারই...!” বিস্ময়ের পর বিস্ময়। অর্ণব আর কথা বলতে পারে না। তার সব শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। অধিরাজ হাসছে, “না। তিনি নন। তিনি তো তখন বাবুর মেক-আপে বসেছিলেন। তবে তার অত্যন্ত গুণ মুগ্ধ সাগরেদ, অথবা ভাড়া করা প্রোফেশনাল অ্যাকটর অ্যাকট্রেস! অ্যাকটিরটি মোক্ষম পাঞ্চখানাও সহ্য করেছেন। কী ডেডিকেশন! ও ছেলে যদি হাজতে না যায় তবে অস্কার জিতবেই।”

- “মানে!...মানে...!” অর্ণব এককথায় স্পিচলেস!

অধিরাজ মাথা নাড়ল, “গোটা সিনটাই বানানো ছিল। আমাদের অপরাধীর প্যাটার্ন দেখো। সে পাগল হোক, হিংস্র হোক; ফুল প্রুফ প্ল্যানিং ছাড়া মাঠেই নামে না। শিশির সেন যেদিন প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন; সেদিন থেকেই সম্ভবত আমরা তার রাডারে ছিলাম। কিন্তু তার ফলো করার প্যাটার্নটা আগের অফিসাররা ধরতে পারেননি বলে সে সেফ ছিল। কিন্তু অফিসার দাশগুপ্তের কল্যাণে তার এই স্পেশ্যালিটিটা এখন সর্বজনবিদিত। তাই বত্রিশ বছর পরে চান্সই নেয়নি। এমন একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করাল যে আমরা ফেঁসে গেলাম। সে নির্ঘাৎ আমাকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছিল। দেখেছিল এই পেনটা সবসময়ই বুকপকেটে থাকে। তার ভাড়া করা দেবা-দেবী দু’জনেই সমানতালে অস্কার উইনিং অভিনয় করেছেন। ব্যস, সেদিন মেয়েটা আমার বুক পকেটের অ্যাক্সেস পেয়েই পেন রিপ্লেস করেছিল। আর পায় কে! আমরা এখানে বসে ভেবে মরছি, সে ব্যাটা কোথা থেকে সব ইনফর্মেশন পাচ্ছে! সবসময় সতর্ক থাকছি, কোথা থেকে ফলো করছে! ওদিকে বাবু ইয়ারসেট লাগিয়ে দিব্যি সব শুনছেন!” সে মাথা নাড়ে, “লোকটাকে কী বলব ভাবছি, ডেঞ্জারাস না জিনিয়াস!”

- “তার মানে সেদিন যে ভার্মিলিয়ন রেডের কেসটা হয়েছিল সেটা পুরো অ্যাকটিং! ওটা আসলে স্পাই মাইক্রোফোন লাগানোর প্ল্যানিং ছিল! পুরো আস্ত স্ক্রিপ্ট লিখে ডিরেকশনও দিয়েছে।” ডঃ চ্যাটার্জী একটা সজোরে শ্বাস টানলেন, “এ তো সর্বগুণে রাধিকা দেখছি!”

“মেয়েটার মুখ বা লোকটার মুখ তোমার মনে আছে অর্ণব?” অর্ণব পেন্ডুলামের মতো দু'দিকে মাথা নাড়ে। এমন হিস্ট্রিশিটার আর তাদের শিকারকে তো প্রায়ই দেখছে। দুনিয়ায়

ইভটিজার আর বিপন্ন মেয়ের অভাব নেই। কতজনকে মনে রাখবে! তাছাড়া ল্যাম্পপোস্টের আলোয় কতটুকুই বা দেখা যায়! -

"মেয়েটা তো নিজের বাড়ির ডিরেকশনও দিয়েছিল।"

"ডিরেকশন দিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু কার বাড়ির সেটা জানা নেই। মেয়েটাকে আমরা বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়েছিলাম। ও বাড়িতে ঢুকেছিল কিনা দেখিনি।"

"কিন্তু লোকটাকে তো থানায় ডাম্প করেছিলাম।" অর্ণব উত্তেজিত, "সেখানে কেউ না কেউ তো দেখবে।"

"নিশ্চয়ই দেখেছে। কিন্তু হুলিয়া জানতে যাওয়া পন্ডশ্রম। তুমি লক্ষ্য করোনি, কিন্তু আমি দেখেছি লোকটার গালে দাড়ি ছিল। নকল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।"

- "কিন্তু লোকটাকে আমি নিজে আলিপুর পুলিস স্টেশনে বসিয়ে দিয়ে এসেছিলাম!"

অর্ণবের তবু বিশ্বাস হয় না। অধিরাজ ফের সোফায় এলিয়ে পড়ে পা টিক টিক করে বলল, "আলিপুর পুলিস স্টেশনে ফোন করে খোঁজ নাও লোকটা সেখানেই আছে না কেটে পড়েছে? আমার ধারণা সে এখন ফাটকে নেই।"

অর্ণব পুলিস স্টেশনে ফোন করল। এস আই সাহেব ফোন তুললেন এবং সবিনয়ে জানালেন যে, যে ইভটিজারকে তারা থানায় রেখে এসেছিল, কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং অভিযোগকারিণী সুন্দরী মেয়েটি তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। মেয়েটির বক্তব্য, ছেলেটি তার প্রেমিক। দু'জনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি আর রাগারাগির ফলেই নাকি এরকম ঘটনা ঘটেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে টাইট দিতে চেয়েছিল। উপস্থিত অফিসাররা অর্ণব বা অধিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই যাচ্ছিল। মেয়েটি প্রায় পায়ে পড়ে ক্ষমা চাওয়ায় তারা আর ওদের ডিস্টার্ব করেনি।

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র! অর্ণব স্পষ্ট বুঝল আসলে কে কাকে টাইট দিয়েছে। মুখে বলল, "ছেলেটি বা মেয়েটির কোনও ছবি আছে আপনাদের কাছে? বা সিসিটিভি ফুটেজ?"

"সিসিটিভি ফুটেজ আছে স্যার।"

অর্ণব সবে বলতেই যাচ্ছিল, "আমি এখনই আসছি।" কিন্তু তার আগেই তার মোবাইলটা কেড়ে নিয়ে অধিরাজ বলল, "থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফর্মেশন অফিসার। অ্যাকচুয়ালি ঐ মেয়েটিকে অর্ণবের বিশেষ পছন্দ হয়েছে। সেজন্যই খোঁজ খবর নিচ্ছিল। আর কোনও কারণ নেই। গুড নাইট।"

একে বলে মহা গুগলি! অর্ণব হাঁ। কোনওমতে বললেন, "এ কী করলেন স্যার! ছেলেটা আর মেয়েটার ফুটেজ ওখানে ছিল। ওদের ধরা যেত।"

– "তুমি মাটি করবে দেখছি!" অধিরাজের মেজাজ এবার কিঞ্চিৎ লঘু, "ছেলেটা আর মেয়েটার খোঁজ পড়লে আমাদের শ্রীমান জেনে যাবেন না যে তার প্যাঁচটা আমরা ধরেছি? আমি এই মুহূর্তে তাকে মোটেই জানাতে চাই না।" -

"কিন্তু ধরলে কী করে সেটা একটু বলবে!" ডঃ চ্যাটার্জী বলেন, "আমার মাথাতেও - এই সম্ভাবনা আসেনি।" —

– "আমার মাথাতেও যে খুব সহজে এসেছে, সেটা বলতে পারি না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম, লোকটা আমাদের সবসময় ফলো করছে না। নয়তো কখনও না কখনও চোখে পড়তই। যদি ফলোও করে থাকে, তবেও স্লটার-হাউজের রেডের কথা, আমি যে তোমাদের প্রায় গালাগালি দিয়েই তাড়িয়েছি, বাড়িতে একা আছি বা বেবো ব্রিগ্যানজাকে খোঁজার কথা তার জানার কথাই নয়। কারণ এর মধ্যে সব কটা হয় আমি নিজের বাড়িতে বা এডিজি সেনের বাড়িতে বসে বলেছি, নয়তো গাড়িতে। ফলো করলে লোকগুলোকে দেখা যায়, তাদের কথা শোনা যায় না। কিন্তু ও মক্কেল আমাদের কথা শুনছে। আর তার ক্রাইম করার ধরনে যেরকম

স্পাইঙের প্যাটার্ন দেখা যায় তাতে একখানা বাগের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব ছিল না।"

- "কিন্তু সে বাগ তো যে কোনও জায়গাতেই থাকতে পারত। পেনই কেন! সে তোমার বেডরুম অবধি হানা দিয়েছিল। সেখানেও ফিট করতে পারত।"

"মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন ডক।" অধিরাজ সপ্রশংসভাবে ভুরু নাচায়, "কিন্তু মুশকিল হচ্ছে খুনী তখন থেকেই আমাদের অ্যাকশনের কথা শুনতে পাচ্ছে যখন আমার লিভিংরুমে বা বেডরুমে সে ঢোকেনি। স্লটার-হাউজের ডিডাকশনটা আমি বাবুর মৃত্যুর

ঠিক পরেরদিনই করেছিলাম। আর তার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পবিত্র আর মিস দত্ত অকুস্থলে পৌঁছেছিলেন। ওদের চোখ এড়িয়ে খুনী নিশ্চয়ই ঢোকেনি কারণ ওরা কনস্ট্যান্ট স্লটার-হাউজের ওপর নজর রেখেছিল। তাহলে খুনী তাদের পৌঁছবার আগেই যা সরাবার, সরিয়েছে। তার মানে সেদিন থেকেই সে আমাদের কথা শুনছে, যার অর্থ হল 'বাগ'টা বাবুর মৃত্যুর দিনই প্ল্যান্ট করা হয়েছে। আর যেহেতু আগেই বলেছি, আমি নিজে একেকটা কথা একেক জায়গায় একেক সময়ে বলেছি, লোকেশন পাল্টেছে, আমার ড্রেস পাল্টেছে, সামনের লোকেরাও ক্ষেত্রবিশেষে পাল্টেছে; একমাত্র কনস্ট্যান্ট অর্ণব, কিন্তু ও খুনীর খবরি কিছুতেই হতে পারে না, এবং অর্ণবের ড্রেসও একেক সময়ে পাল্টেছে; সুতরাং বাগটা এমন কোথাও আছে যেটা কনস্ট্যান্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল ও আছে। 'বাগ' পোষাকের মধ্যে থাকতেই পারে না কারণ পোষাকও বদলেছে। শুধু দুটো জিনিস কনস্ট্যান্ট। আমার জুতো; আর বুকপকেটের পেন। জুতোয় বাগ ফিট করলে সেটা পায়ের চাপেই চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। অথবা হাঁটা বা দৌড়ের সময়ই পড়ে যাবে। হাতে রইল পেন; যেটা সবসময়েই আমার সব শার্ট বা টি-শার্টের বুকপকেটে ঝোলে, ইনফ্যাক্ট ওটা সবসময়ই থাকে সে আমি ব্লেজারই পরি বা ক্যাজুয়াল। এবং পেনই একমাত্র স্পাই গ্যাজেট যেটা আদ্যিকালের আমল থেকে চলছে। আমাদের খুনী জেমস বন্ড দ্বারা ইন্সপ্রেরিত ডক। পেনটাই ফার্স্ট প্রেফারেন্স। ওটা ফ্লপ হলে অন্যকিছু ভাবতাম।"

- "কিন্তু ঐ মেয়েটাই কেন রাজা! খুনী নিজেও তো সেদিন তোমার সামনে এসেছিল।"

"খুনী এসেছিল ডক।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "কিন্তু সে আমার বুকপকেট অবধি হাত বাড়ায়নি। সে আমার হাতে হাত রেখেছিল, কিন্তু জড়িয়ে ধরেনি। পেন রিপ্লেস করতে হলে একেবারে সপ্রেমে জাপ্টে ধরতে হয়। বাবুর ছদ্মবেশে সে যদি আমায় জড়িয়ে ধরত তাহলে আমার তিন লাফ মেরে পিছিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ওরকম একটি বিপন্ন মেয়ে যদি জড়িয়ে ধরে তবে পালাবার পথ নেই। অস্বস্তি হলেও সন্দেহ হবে না। ব্যস, দুয়ে দুয়ে চার। আই মাস্ট সে; মাস্টারস্ট্রোক খেলেছিল! বিউটিফুলি প্লেইড!"

অর্ণব কিছুক্ষণ স্থাণুবৎ বসে থাকে। তারপর বলে, "তবে তো স্যার গাড়ির ডিকিতেও বাগ ফিট করা থাকতে পারে।"

“সম্ভবত নয়। মেল অ্যাক্টরটি অ্যাক্টিং ভালোই করে। কিন্তু সেদিন পাঞ্চটা খেয়ে সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ওটা অ্যাকটিং ছিল না। তবু যদি ফিট করেও থাকে, থাকতেই দাও। ‘বাগ’ তো আর কামড়াতে আসবে না! পেনটাও তো রেখে দিলাম দেখলে না?”

“কেন?”

অধিরাজ রহস্যময় হাসল, “সে ভাবছে আমাদের থেকে এক কদম এগিয়ে আছে। আমিও ওকে সেটাই ভাবতে দেবো। মন্দ কী?”

(২২)

অবশেষে ঘন অন্ধকারের মধ্যে একফোটা আশার আলো! সি আই ডি, হোমিসাইডের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ও খবরিদের প্রাণপাত সফল হল। সুমঙ্গল পন্ডিতের ঠিকানা হাতে এল সি আই ডি'র। পরদিন সকালে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। প্রথমটা দেখার। অধিরাজের বাড়ির বাগানে একটি গাছের গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা 'দুই' সংখ্যা! দ্বিতীয়টা শোনার। সুমঙ্গল পন্ডিত, তথা শেয়াল পন্ডিতের খবর।

"পন্ডিতজির খবর পেয়েছি!"

কথাটা এমনভাবে বলল পবিত্র যেন খবর নয়, লটারি পেয়েছে, "অনেক কষ্টে ইনফর্মাররা বের করেছে লোকটার ঠিকুজি-কুষ্ঠি। তাও নতুন ছোকরা ইনফর্মাররা ট্র্যাক করতে পারেনি। একজন পুরনো ইনফর্মারই বাজিমাত করেছে। অ্যান্ড ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন; সুমঙ্গল পন্ডিত এবং শেয়াল পন্ডিত এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। ইনিই তিনি। অফিসার দাশগুপ্তের পার্সোনাল খবরি।"

"প্লিজ পবিত্র, বোলো না যে এ লোকটারও গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে!"

"তোমার ব্যাডলাকই খারাপ রাজা!" পবিত্র একটু হতাশভাবেই বলে, "এ মাল মরেনি। কিন্তু বেপাত্তা। ওর বৌ বেচারিই ওর খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। আমি ভেরিফাই করার জন্য গিয়েছিলাম। মিসেস পন্ডিতকে কোথায় আমিই জিজ্ঞাসা করব যে তাঁর মিস্টার কোথায়; তা না, তিনিই শুধিয়ে বসলেন, 'আমার ওনার কোনও খবর আছে?' কী বিপদ বলো তো! পুলিসকেই জেরা করছেন!"

"সে কী! পন্ডিতজি তবে গেলেন কোথায়?"

"ভগা জানে!" পবিত্র জবাব দেয়, "তার স্ত্রী'র বয়ান অনুযায়ী তিনি দশ বছর আগেও দিব্যি বহাল তবিয়তে ছিলেন। হঠাৎ এক রাতে বেরোলেন, আর ফেরেননি। তবে সবচেয়ে শকিং পন্ডিতজির দুই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর নাম!"

"বজ্র আর বিদ্যুৎ নাকি?"

অধিরাজের প্রশ্নটা শুনে সে হেসে ফেলল, "না না। অত বেশি ভোল্টের নামও নয়। তবে দু'জনই আমাদের পরিচিত।" অধিরাজ একটু বিরক্ত, "এই কেসে রহস্যময় ক্যারেক্টারের কি অভাব আছে যে তুমি এখন আবার রহস্য করতে বসেছ? নাম দুটো সরাসরি বলা যায় না?"

— "রফিক আসলাম নামটা মনে আছে?"

তার ডানদিকের ভুরুটা সামান্য উঠে গেল, "স্লটার-হাউজের মালিক? যিনি বত্রিশবছর ধরে বেপাত্তা?"

- "তিনিই বটে। আমাদের পন্ডিতজি তার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। দু'জনের বন্ধুত্ব বেশ প্রগাঢ় ছিল। এবং দ্বিতীয়জন হলেন...।"

- "আশা করছি অফিসার রথীন দাশগুপ্ত নন।" এবার শকড হওয়ার পালা পবিত্র'র। সে বিস্ময়াভিভূত, "বুঝলে কী করে?"

– "কারণ পন্ডিতজি তাঁরই বিশ্বস্ত ইনফর্মার ছিলেন। যে ফ্যান্টম ইনফর্মারকে কেউ দেখেনি, সে শুধু অফিসার দাশগুপ্তকেই দেখা দিত। তার সাহায্যেই অনেক বড় বড় এনকাউন্টার করেছিলেন অফিসার দাশগুপ্ত। ওঁর হিটলিস্টে তখনকার সব কুখ্যাত গ্যাংস্টার ছিল। তাদের খবর নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয় পবিত্র। তার জন্য ইনফর্মারকে নিজের প্রাণটাও হাতে নিয়ে ঘুরতে হত। এতখানি রিস্ক সে নিয়েছিল শুধুমাত্র একটি অফিসারের জন্য। জোরালো কেমিস্ট্রি না থাকলে সম্ভবই নয়। দুয়ে দুয়ে চার।"

"বুঝলাম। কিন্তু কেমিস্ট্রি আরও একটু জোরালো ও ঘোরালো। সুমঙ্গল পন্ডিত শুধু অফিসার দাশগুপ্তের বন্ধুই নয়, বাল্যবন্ধু । মানে অফিসার দাশগুপ্ত যখন পয়েন্ট টু টু বোরের রিভলবারের বদলে জলবন্দুক নিয়ে ঘুরতেন, পন্ডিতজি তখন থেকেই তাঁর পেছন পেছন রঙীন জলের বালতি নিয়ে ফলো করছিলেন।"

– "ইন্টারেস্টিং! দু'জনেই স্কুলের বন্ধু নাকি?"

"ঠিক তাই।" পবিত্র আচার্য বলে, "এক কথায় হরিহর আত্মা বলতে পারো। পুরো রাম-লক্ষ্মণ।"

"তাহলে লক্ষ্মণের লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখতেই হচ্ছে।"

“লক্ষ্মণের বিভীষণ হওয়ার চান্স আছে বলছ?”

– “বিভীষণ নয় পবিত্র, স্বয়ং রাবণ হওয়ার চান্সই বেশি।” অধিরাজ বলল, “আমাকে ওনার অ্যাড্রেস ফরোয়ার্ড করো। আর মিস দত্তকে আমার বাড়িতে চলে আসতে বলো। মহিলার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি, সঙ্গে লেডি অফিসার থাকা জরুরি।”

- “অবশ্যই নিয়ে যাও। যে রকম পাইকারি হারে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাতে পুরুষ এবং মহিলা দু'রকম বডিগার্ডই থাকা জরুরি।” -

কথাটা অধিরাজের কানে যেন তরল গরম সীসা ঢেলে দিল। পবিত্র'র রসিকতা করার টাইমিং বড়ই খারাপ। বিশেষ করে এই রসিকতাটা তার অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়। সে বিরক্ত হয়ে কোনও কথা না বলেই ফোন কেটে দেয়। মেজাজটা ফের তিতো হয়ে গিয়েছে।

“স্যার, আপনার স্নান হয়ে গেছে?”

অর্ণব এতক্ষণ ড্রয়িংরুমে বসে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে টিভিতে সকালের খবর দেখছিল। এটা তার দৈনন্দিন কাজ। এবার অধিরাজের ঘরে এসে ঢুকেছে। তার দিকে একঝলক তাকিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটা করেছিল বেচারা। কিন্তু প্রায় স্বভাব বিরুদ্ধভাবেই খিঁচিয়ে উঠল অধিরাজ, “না! বাথরোব পরে ফ্যাশন শোয়ে ক্যাটওয়াক করার ইচ্ছে হয়েছে আমার! দেখছ বাথরোব পরে আছি, মাথার চুল ভেজা, তার পরেও প্রশ্ন করছ যে স্নান করেছি কি না! কাদের নিয়ে ঘর করছি আমি! একজন বলছে আমি সানি লিওনের মেল ভার্সন, অন্যজন স্নানের খবর নিচ্ছে। কেন? আরেকবার স্নান করলে তুমিও আমার সঙ্গে করবে?”

বাঁশটা খেয়ে চুপ করে গেল অর্ণব। সে বেশ ভালোই বুঝেছে অন্য কারোর ঝাল তার ওপর এসে পড়ল। নির্ঘাৎ কারোর বেফাঁস কথা গায়ে লেগে গেছে। অর্ণব মনে মনে অধিরাজের জ্বালাটা বুঝতে পারে। সে নিজের কষ্ট প্রকাশও করতে পারছে না, আবার সহ্যও করতে পারছে না। সে আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই যাচ্ছিল, তার আগেই অধিরাজ মৃদুস্বরে বলে ওঠে, “স-রি!”

বলতে বলতেই ক্লান্তভঙ্গিতে বিছানার ওপর ধপ করে বসে পড়েছে সে। মাথা নেড়ে বলল, “জানি না, কেন এরকম করছি। আমি সিম্পলি আর পারছি না... আর পারছি না!

আমার এখন নিজের ওপরই ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। আই হেট মাইসেলফ!"

অর্ণব একদৃষ্টে তার অনুতপ্ত, ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল এ লোকটা এবার অসুস্থ হয়ে পড়বে। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করছে না, ঘুমিয়েও শান্তি নেই। সবসময়ই বিরক্ত হয়ে আছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাবে ফিরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু পারছে না। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রতি মুহূর্তে নিজের সঙ্গেই লড়াই করতে হচ্ছে তাকে। তার ওপর খুনীর কাউন্টডাউন!

অর্ণব মনে মনে অধিরাজকে হ্যাটস অফ জানায়। এই লোকটার নাম অধিরাজ ব্যানার্জী বলেই এখনও ময়দানে টিকে আছে। অন্য কেউ হলে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে হাত তুলে দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেত। এই অদম্য বর্ন ফাইটারকে শুধু এজন্যই ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। সে জিজ্ঞাসা করে, "আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি স্যার?"

"আমরা আজ মিসেস শেয়াল পন্ডিতের সঙ্গে মিটিং করতে যাচ্ছি অর্ণব।"

"মানে!" অর্ণব চমকে ওঠে, "শেয়াল পন্ডিতকে পাওয়া গেছে?" পবিত্র'র কাছে পাওয়া খবরটা অর্ণবকে বলল অধিরাজ। অর্ণব আড়চোখে দেখল ডঃ চ্যাটার্জীও কখন যেন গুটিগুটি পায়ে অধিরাজের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনিও ভুরু কুঁচকে খবরটা - শুনছেন।

"চলো, অন্তত কিংবদন্তী চলমান অশরীরীর চেহারাটা আজ স্বচক্ষে দেখে আসি।"

অধিরাজের দৃষ্টিতে চিন্তার আবেশ; "আমার বিশ্বাস, এই লোকটার এ ফিল্মে মেইন রোল আছে। দেখা যাক তার...।"

অধিরাজের কাঁধে পেছন থেকে সবে হাত রাখতে যাচ্ছিলেন ডঃ চ্যাটার্জী। তার আগেই প্রায় বিদ্যুৎবেগে পেছনে ফিরল অধিরাজ। অর্ণব ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল, একটা জোরালো ঘুষি আলোর গতিবেগে বিপজ্জনকভাবে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের চোয়ালে পড়তেই যাচ্ছে...!

"রা-জা!"

আতঙ্কে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন ডঃ চ্যাটার্জী। ঘুঁষিটা তাঁর মুখে টাইফুনের শক্তিতে আছড়ে পড়তেই যাচ্ছিল। আর একবার ওই বিধ্বংসী আঘাত পড়লে ভদ্রলোকের

চোয়ালটাকে কেউ বাঁচাতে পারত না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে থমকে গেল অধিরাজ। উদভ্রান্ত, অস্থির দৃষ্টিতে ডঃ চ্যাটার্জীকে দেখছে। অধিরাজের চোখে এখন অবিকল এক ভয়ার্ত শিশুর দৃষ্টি! দরদরিয়ে ঘামছে সে।

"আর ইউ ব্লাইন্ড!" ডঃ চ্যাটার্জী সম্ভবত হার্টফেল করতেই চলেছিলেন। কোনওমতে সামলে নিয়ে বললেন, "এটা আমি ভাই! তোমার অতি পরিচিত বাপের বয়েসী মড়াকাটা ডাক্তার। অ্যাটাকটা একটু দেখেশুনে করবে তো! অ্যাটলিস্ট দেখে তো নাও কাকে মারতে যাচ্ছ!"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অধিরাজ। তারপর আবার ধপ করে বসে পড়ল বিছানার ওপরে। কোন কথা না বলে হাত নেড়ে দু'জনকেই ওখান থেকে চলে যেতে বলল সে। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন, "ফাইন, চলে যাচ্ছি। কিন্তু এইটুকুই বলতে যাচ্ছিলাম যে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

কথাটা শেষ করেই গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অর্ণবও মাথা নীচু করে তাঁরই রাস্তা ধরল।

মিনিট পনেরো পরেই অবশ্য টপ টু বটম তৈরি হয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল অধিরাজ। ততক্ষণে আত্রেয়ী দত্তও এসে উপস্থিত হয়েছে।

সুকোমল পান্ডের থেকে বেশ কিছু তথ্য সে বের করতে পেরেছে। "সুকোমল পান্ডে বলেছে যে সে নিজে থেকে একুশে অক্টোবর লালবাজারের সামনে যায়নি।" আত্রেয়ী রিপোর্ট করে, "বরং তার বক্তব্য অনুযায়ী, সুমঙ্গল পন্ডিত তার হসপিটালে ফোন করে তাকে সেখানে আসতে বলেছিল। সুমঙ্গল আর সুকোমল দেশি মদের দোকানে একই গ্লাসের বন্ধু ছিল। বেশ কয়েকবার সুকোমলকে সে ট্রিট দিয়েছে। যার ফলে সুকোমলের ধারণা হয়েছিল যে সে অত্যন্ত ভালো ব্যক্তি। সুমঙ্গলই তাকে বলেছিল লালবাজারের সামনে দাঁড়াতে। এমনকী টাইমও বলে দিয়েছিল। কিন্তু সুমঙ্গল নিজে তো আসেইনি, উলটে কার না কার লাশ পড়ে ছিল! অন্ধকারে বুঝতে না পেরে ও লাশের গায়ে হোঁচট খেয়ে বডিটার ওপরই পড়ে যায়। তার মধ্যেই একজনকে ওদিকেই দৌড়ে আসতে দেখে পালাবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারেনি।" সে একটু থেমে যোগ করে, "সুকোমল পান্ডে

এমনিতে সহজ সরল লোক স্যার। একটু বোকা বোকা মিথ্যে কথা বলে ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি প্যাঁচালো নয়। আমি একটু হাওয়া দিতেই মনের প্রাণের কথা সব গড়গড়িয়ে বলে ফেলল। ও বেচারির দৃঢ় ধারণা ছিল সুমঙ্গল পন্ডিত এসে ওকে বাঁচাবে। কারণ সুমঙ্গল বলেছিল যে পুলিসের বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে ওর ওঠাবসা।"

"সে জন্যই সে জেরার সময়, কোর্টে বারবার সুমঙ্গলের নাম নিচ্ছিল।" অধিরাজ বলল, "প্যাথোলজিক্যাল লায়ারের যা স্বভাব। সুমঙ্গল পন্ডিতের নাম ওকে বাঁচাতে পারে এরকম একটা ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওর। যাই হোক, লালবাজারের সামনে কেন দাঁড়াতে বলেছিল তা কিছু বলেছে?" অধিরাজের প্রশ্নে মাথা নাড়ল আত্রেয়ী, "সেটা ও একেকবার একেকরকম বলছে স্যার। কখনও বলছে কোনও খুনের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছিল, কখনও বলছে সুমঙ্গলের টাকার দরকার ছিল, কখনও বলছে সুমঙ্গলের সঙ্গে...।"

বলতে বলতেই কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ওঠে লেডি অফিসারের। অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল! এই সুকোমল পান্ডেকে নিয়েও আর পারা গেল না! এ লোকটাও কাউকেই ছেড়ে কথা বলছে না। সে শান্তস্বরে বলে, "এর মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা সে হাত না ঘষে বলেছে? হাতের দিকে দেখতে বলেছিলাম মনে আছে?"

- "হ্যাঁ স্যার।" আত্রেয়ীর কুন্দশুভ্র দন্তপংক্তি ঝিলিক মারল, "ও যখন বলেছিল যে সুমঙ্গল ওকে ফোন করে স্পটে ডেকেছিল তখন হাত ঘষেনি। আর প্রত্যেকবারই হাত ঘষেছে। তবে যখন স্কুটারটার ব্যাপারে বলছিল, তখনও হাতদুটো জড়ো করে রেখেছিল।"

"স্কুটারের ব্যাপারে আবার নতুন কী বলল?"

"প্রত্যেকবারই লোকটা নতুন নতুন কথা বলে। কখনও বলে বাইক ছিল। কখনও বলে ফোর হুইলার। আবার কখনও বা স্কুটার। তবে যখন বলল স্কুটারটার মাথাটা আগুনের মতো হলুদ লাল ছিল আর বডিটা কালো, তখনও কিন্তু হাত ঘষেনি। আমি ওর ম্যানারিজম লক্ষ্য করেছি স্যার।"

"গ্রেট!" প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে বলল অধিরাজ, "ফ্যান্টাস্টিক ওয়ার্ক। অর্ণব, তোমার জুনিয়রটি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী! ভেরি ইমপ্রেসিভ!" আত্রেয়ী লাজুক মুখে অর্ণবের দিকে তাকায়। সে থাম্বস আপ দেখিয়ে নিজের জুনিয়র লেডি অফিসারকে উৎসাহিত করছে।

- "মিস দত্ত, মিসেস পন্ডিত বলেছেন যে তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। কথাটা সত্যি হতে পারে, নাও পারে। পুরো বাড়িটা ভালো করে সার্চ করবেন। কোনও কিছু সন্দেহজনক মনে হলে সোজা এভিডেন্স ব্যাগে পুরবেন। ভদ্রমহিলা আপত্তি করলেও শুনবেন না। হিস্টিরিক হয়ে গেলে সামলানোর দায়িত্ব আপনার। ডক, আপনি যাচ্ছেন যখন তখন সমস্ত এভিডেন্স নিয়ে সোজা ল্যাবে যাবেন। সময় নেই। আমি অলরেডি এডিজি সেনকে বলেছি সার্চ ওয়্যারান্ট পাঠিয়ে দিতে। ব্যুরোয় গিয়ে আগে সেটা কালেক্ট করবো, তারপর স্ট্রেট শেয়ালের ডেরায়। ওকে?"

অর্ণব লক্ষ্য করল, অধিরাজের শার্টের বুক পকেটে পার্কার পেনটা ফের শোভা পাচ্ছে।

"ওকে স্যার।"

অবিকল অর্ণবের মতোই উত্তর দিল আত্রেয়ী দত্ত!

(২৩)

"আমার স্বামীর কোনও খোঁজ পেলেন আপনারা?" প্রথম দর্শনেই এই উদ্বিগ্ন প্রশ্নটাই ধেয়ে এল। অর্ণব নীরবে সুমঙ্গল পন্ডিতের স্ত্রী বীণা পন্ডিতকে জরিপ করছিল। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারার 'ফর্সা গোলগাল বয়স্কা মহিলা। এমন কোনও বিশেষত্ব নেই যা বলা যায়। একেবারেই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের আটপৌরে স্ত্রী। পরণে সাধারণ শাড়ি। নিরাভরণা। মাথায় সামান্য একটু বাঁকা সিঁদুরের টান ছাড়া সধবা হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। জোড়া ভুরুর নীচে একজোড়া নিরীহ চোখ। স্বভাবও অত্যন্ত শান্ত। সার্চ করার কথা শুনে একটু চিন্তিত মনে হলেও কোনওরকম বাধাই দিলেন না।

সুমঙ্গল পন্ডিতের বাড়িটা নেহাতই মামুলি। বাড়িতে ঢোকার আগেই প্রতিবেশীদের একপ্রস্থ জেরা করেছে ওরা। তাদের মুখেই জানা গেল, ভদ্রমহিলা এ বাড়িতে বছর পাঁচেক ধরেই আছেন। নিজের বাড়ি নয়। হলুদ রংচটা দোতলা বাড়ির দ্বিতলে বাড়িওয়ালা থাকেন, এবং বাড়ির একতলায় ভাড়ায় থাকেন বীণা পন্ডিত। সুমঙ্গল পন্ডিতের বিষয়ে অবশ্য প্রতিবেশীরা কিছু জানাতে পারল না। তবে তার স্ত্রী বীণা পন্ডিত সম্পর্কে কারোরই কোনও অভিযোগ নেই। ভদ্রমহিলা এতটাই শান্ত স্বভাবের যে তার অস্তিত্ব প্রায় টের পাওয়াই যায় না। তিনি যে কখন থাকেন, কখন থাকেন না তাই বোঝা দায়। কারোর সঙ্গে বাদ-বিবাদ নেই। ভাড়াও সময়মতই দেন। বাড়িওয়ালা তারক মন্ডলও যথেষ্ট ভদ্র মানুষ। অন্তত টিপিক্যাল বাড়িওয়ালাদের মতো খেঁকুটে নন। বীণা পন্ডিতের কাছে যাওয়ার আগে দোতলায় তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিল অধিরাজরা। রোদে পোড়া তামাটে রঙের, শীর্ণকায় সদা হাস্যময় মিষ্টি এক বৃদ্ধ। একা থাকেন বলে কথা বলতে খুব ভালোবাসেন। ডঃ চ্যাটার্জীকে পেয়ে প্রায় খোশগল্পই জুড়ে দিলেন! ডঃ চ্যাটার্জীরও তাকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে, কারণ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মতোই তার মাথাতেও ভারী নিটোল একটি টাক চকচক করছে।

অধিরাজ গলা নামিয়ে বলল, "দেখে নাও অর্ণব। একসঙ্গে দুই পৃথিবী!" "এর মধ্যে একটা চাঁদও হতে পারে স্যার।"

– "তাহলে তো বিপদ।" অধিরাজ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলেছে, "ডক যে পরিমাণ আহ্লাদিত হয়ে উঠেছেন দেখছি, তাতে "ভাই" বলে জড়িয়ে ধরলেই গেছি। একেই ভদ্রলোকের টাকটির ওপর সূর্যের ডাইরেক্ট কৃপাদৃষ্টি আছে, তার ওপর মাঝখানে চাঁদ ঢুকলে সূর্যগ্রহণ অবধারিত! এই দিনের বেলায় অন্ধকার নামলে তদন্ত ভেস্তে যাবে।"

- "তোমরা কীসের এত কনস্পিরেসি করছ হে?" ডঃ চ্যাটার্জী খাঁউখাঁউ করে ওঠেন, "বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে ফিসফিস করে কথা বলতে নেই জানো না?"

– "তেমন কিছু নয়।" অধিরাজ খুব নিরীহভাবেই বলে, "আমরা সূর্যগ্রহণ কবে লাগবে সে বিষয়েই আলোচনা করছিলাম।"

"তুমি আবার কবে থেকে 'বেণীমাধব বেণীমাধব' গাইতে শুরু - করলে?"

অর্ণব মাথা চুলকে বলে, "কিন্তু ওটা তো জয় গোস্বামীর ডিপার্টমেন্ট। লোপামুদ্রাকে গাইতে শুনেছি। স্যার গাইবেন কেন?"

ডঃ চ্যাটার্জী ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে বললেন, "আমি বেণীমাধব শীলের কথা বলছি মাথামোটা বিদ্যেসাগর!"

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কিন্তু একটুও চটলেন না। উলটে হেসে বললেন, "সূর্যগ্রহণ তো সামনের অমাবস্যার সঙ্গেই পড়েছে শুনছি। কেন? কিছু দরকার আছে?"

অধিরাজ যেন ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না, "না। অর্ণবের জ্যোতিষী ওকে সূর্যগ্রহণের দিন প্রেমিকার মুখ দেখতে বারণ করেছেন। কিন্তু অর্ণব জেদ ধরেছে দেখা করতেই যাবে। দরকার পড়লে সোলার ভিউয়ার চশমা পরেই যাবে। এমনকী অশুভ প্রভাব কাটানোর জন্য একডজন নারকেল ভাঙার প্ল্যানও করছে। তাই না অর্ণব?"

- "ইজ ইট?" বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়েই জানতে চান।

অর্ণবের মনে হল তার মাথাতেই কেউ দড়াম করে আস্ত নারকেল ভাঙল। সে ঘাবড়ে গিয়ে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে নিজেই বলে ফেলে, "ইজ ইট স্যার?"

— "ইজ ইট স্যার মানে?" ডঃ চ্যাটার্জী হাঁ, "তোমার প্রেমিকা, তোমার চশমা, তোমার নারকেল; আর তুমিই জানো না! নাকি প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলেও রাজার অনুমতি লাগবে?"

অর্ণব কোনওমতে সামলে নিয়েই বলল, "ও! ইয়েস! ইট ইজ!"

– "পাঁজি লাগবে বাবা? আমার কাছে বোধহয় আছে একটা।" ভদ্রলোক দুই যুবকের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকালেন, "নিয়ে আসব? আফটার অল প্রেমিকার ব্যাপার।"

– "না। ঠিক আছে।" অধিরাজ সবিনয়ে বলে, "অর্ণব এমনিতেই অনলাইনে দু হাজার উনিশ আর কুড়ির পাঁজি অর্ডার করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পড়বে।"

তিনি আর কথা বাড়ালেন না। অধিরাজদের চা-কফি-কোকো অফার করলেন, এবং ওরা ডিউটিতে আছে জেনে বড়ই দুঃখিত হলেন। অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, "বীণা পন্ডিতের মতো এরকম চুপচাপ নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা আমি খুব কমই দেখছি। উনি বিশেষ কারোর সঙ্গে মেলামেশা করেন না। পয়লা তারিখে ভাড়াটা দিয়ে যান। আমার ধারণা ছিল সব মেয়েরাই অল্পবিস্তর মুখরা হন, কিন্তু ওঁর মুখে খুব কম শব্দই শোনা যায়।"

"আপনি সুমঙ্গল পন্ডিতকে কখনও দেখেছেন?"

"নাঃ"। বাড়িওয়ালা মাথা নাড়েন, "সুমঙ্গল পন্ডিতকে কোনওদিনই দেখিনি। তবে বীণা পন্ডিতের এক ভাই মাঝে-মধ্যে আসেন।" -

– "ওঁর সোর্স অব ইনকাম জানেন কিছু?"

– "শুনেছি ওঁর কর্তার মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে। তার সুদের টাকার ভদ্রভাবেই চলে যায়। অন্তত উনি তেমনই বলেছেন।" বাড়িওয়ালা হাসলেন, দেখুন, এর বেশি আর কী জিজ্ঞাসা করব? তবে পরিচয়টা কনফার্ম করার জন্য পুলিস ভেরিফিকেশন একটা করিয়েছিলাম।"

"পরিচয় ঠিক ছিল?"

"একদম ঠিক ছিল বাবা। জেনুইন বলেই তো ভাড়া দিয়েছি।"

"বেশ।"

আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ওরা সোজা বীণা পন্ডিতের বাড়িতেই চলে এসেছিল। যতটুকু জানার ছিল সবই জানা হয়েছে। বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আর অধিরাজ নিজের পরিচয় দিতে না দিতেই ভদ্রমহিলা সেই একই প্রশ্ন করে বসলেন।

অধিরাজ এবার চোখের ইশারায় মিস দত্ত আর অর্ণবকে সার্চ করতে বলে ওঁর প্রশ্নটার উত্তর দেয়, "এখনও কোনও খবর নেই ম্যাডাম। যাওয়ার সময় উনি বলে যাননি যে কোথায় যাচ্ছেন?"

"না।" ভদ্রমহিলা একটু বিষণ্নভাবেই উত্তর দেন, "উনি কোনওদিনই কিছু বলতেন না। পুলিসের সঙ্গে কাজ করতেন। ওঁদের মানা ছিল হয়তো।" "অফিসার রথীন দাশগুপ্তকে চিনতেন আপনি?"

"হ্যাঁ। ওঁর ছোটবেলার বন্ধু।"

"ওঁদের দু'জনের কোনও ছবি পাওয়া যাবে?"

ভদ্রমহিলা উঠে গিয়ে বহু পুরনো আলমারি থেকে একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে অধিরাজের হাতে দিলেন। অ্যালবামের মধ্যে সাদা-কালো ও রঙীন একাধিক ফটোতে রথীন দাশগুপ্তের সঙ্গে আরও একজন ক্লিন শেভড পুরুষ। কোনও সন্দেহই নেই যে তিনিই সুমঙ্গল পন্ডিত। অধিরাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিগুলো দেখছে। তার পাশ থেকে ডঃ চ্যাটার্জীও ঝুঁকে পড়লেন ছবিটার দিকে। সুমঙ্গল পন্ডিতকে দেখে ভদ্রলোক রীতিমতো হতাশ হলেন। লোকটা দেখতে মোটেই প্রিয়দর্শন নয়। বরং তার মুখের দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছে করে না।

"ঠিক আছে। রেখে দিন।"

বীণাকে অ্যালবামটা ফেরত দিয়ে মৃদু হাসল অধিরাজ। ভদ্রমহিলা ফের আলমারির দিকেই এগিয়ে গেলেন। সেই সুযোগেই ডঃ চ্যাটার্জী নীচু স্বরে বললেন, "লোকটা মেক-আপ ছাড়া বড়ই খারাপ দেখতে। ইমপ্রেসিভ নয়।"

- "আপনি কী এক্সপেক্ট করেছিলেন?" অধিরাজ নির্লিপ্তভাবেই বলে, "লোকটা যদি জেমস বন্ডের মতো হ্যান্ডসাম হত তাহলেই বরং অবাক হতাম। ইমপ্রেসিভ দেখতে নয় বলেই যে কোনও রূপ ধরতে পারত। চোখে পড়ার মতো চেহারা নয় বলেই ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া সহজ। একজন ফ্যান্টম ইনফর্মারের জন্য একদম পারফেক্ট।"

ডঃ চ্যাটার্জী আর কিছু বলার সুযোগই পেলেন না। তার মধ্যেই বীণা অ্যালবামটাকে আলমারিতে রেখে ফিরে এসেছেন।

"অফিসার দাশগুপ্তের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কেমন ছিল?" এবার ভদ্রমহিলা একটু ভেবে জানালেন, "খুবই ভালো। ওঁর মুখে শুনেছি ছোটবেলা থেকেই ওঁদের বন্ধুত্ব। উনি ছোটবেলা থেকেই খুব ঠান্ডা আর লাজুক স্বভাবের ছিলেন। সেজন্য স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা ওঁর ওপরে নানারকম টর্চার করত। রথীনবাবু ওঁকে সেইসব ছেলেদের হাত থেকে বাঁচাতেন। দু'জনে খুব ভালো বন্ধু ছিলেন।" -

"সুমঙ্গলবাবুর কি অভিনয়ের শখ ছিল?" এবার একটু বিস্মিত হলেন বীণা, "আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি অসাধারণ অভিনয় করতেন। ফিল্ম, থিয়েটারের ভূত মাথায় চেপেছিল বলে পড়াশোনাটাও ঠিকমতো করেননি। হাইস্কুল পাশ করার পরই আসাম থেকে পালিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। কিন্তু কিছু করতে পারেননি। পুলিসে ভর্তি হওয়ারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেটাও হয়নি।"

"তাহলে ফের আসামে ফিরে যাননি কেন?"

– "তখন ওখানে দাঙ্গা চলছিল। ওঁর পরিবার তাতেই মারা গিয়েছিলেন। উনি ফিরে গিয়ে কী করতেন? অফিসার দাশগুপ্তের বাবা বিপদ বুঝে আগেই ছেলেকে কলকাতায় এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বলে অফিসার দাশগুপ্তই শুধু বেঁচে গিয়েছেন। নয়তো ওনার পরিবারও তো শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

অধিরাজ মাথা নাড়ল। স্বাধীনতার পর থেকেই আসামের তীব্র এক দাঙ্গার কথা সে জানে। উনিশশো আটচল্লিশ থেকেই এই জাতিগত বিদ্বেষ বিভিন্ন সময়ে আসামের বুকে জ্বলছে। বাঙালি পুলিসকর্মী, আর্মি থেকে শুরু করে বিধায়ক অবধি কেউ রক্ষা পাননি। অফিসার দাশগুপ্তের পরিবারও রক্ষা পায়নি। সেইজন্যই হয়তো তিনি পরিবারের কথা তেমন খুলে বলেননি শিশির সেনকে।

"তার মানে কলকাতাতেই ফের দুই বন্ধুর দেখা হয়"।

-"হ্যাঁ।" বীণা জানালেন, "উনি তখন বেকার হয়ে ঘুরছিলেন। অফিসার দাশগুপ্তও তখন একা। কলকাতায় যে আত্মীয়ের কাছে থাকতেন, তিনিও তখন মারা গিয়েছিলেন। ওঁরও কেউ ছিল না। অফিসার দাশগুপ্ত ওঁকে আশ্রয় দেন। ওঁর বিয়ের পরে থাকার জন্য বাড়ি, কাজও দেন। সে জন্য উনি খুব কৃতজ্ঞ ছিলেন।"

"হ্যাঁ।" অধিরাজ মাথা নাড়ে, "কিন্তু অফিসার দাশগুপ্ত যতটা প্রতিভাবান ছিলেন, মিঃ পন্ডিতও ঠিক ততটাই তুখোড় ইনফর্মার ছিলেন। এমনকী সি আই ডি, হোমিসাইড তাঁকে ফ্যান্টম ইনফর্মার নাম দিয়েছিল। স্বয়ং অফিসার দাশগুপ্তও তাঁকে ইন্টারন্যাশনাল স্পাইয়ের সঙ্গে তুলনা করতেন। অনেক বড় বড় কেসে তিনি অফিসারকে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সকলেই অফিসার দাশগুপ্তের নামই জেনেছে। সুমঙ্গল পন্ডিতের কথা কেউ জানতে পারেনি। তা নিয়ে ওঁর অভিযোগ ছিল না?"

- একমুহূর্তের জন্য যেন ভদ্রমহিলার চোখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।

পরক্ষণেই মুখ কঠিন হয়ে এল, "না। উনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। যা পেয়েছিলেন তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।"

"আপনি কলকাতার মেয়ে, না আসামের?"

"আমি কলকাতার মেয়ে।"

"শিশির সেনকে চেনেন?"

"ওঁর মুখে নাম শুনেছি।" ভদ্রমহিলা ইতিবাচক মাথা নাড়ালেন; "উনি বলতেন শিশির সেন যদি ঠিকমতো ডিউটি করতেন তবে অমন অলুক্ষুণে কাণ্ড হত না।"

অধিরাজ কৌতূহলী, "শিশির সেন কোন ডিউটি করেননি?"

বীণা একটু ইতস্ততঃ করলেন, "দেখুন, সত্যি মিথ্যে জানি না। শোনা কথা। বলাটা কী ঠিক হবে?"

"তবু যা জানেন একটু বলুন। যদি আমাদের কিছু সুবিধা হয়।"

– "যেদিন অফিসার দাশগুপ্তের বাড়িতে কাউন্টডাউন শূন্য আসে, সেদিন শিশির সেন ওঁর বসের অর্ডার মতো জায়গায় দাঁড়াননি। বরং রেডলাইট - এরিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন!"

এবার অধিরাজ রীতিমতো চমকে উঠল। ডঃ চ্যাটার্জীর মুখ দেখে মনে হয়, হিমালয়টা গুঁড়িয়ে তাঁর চোখের সামনেই বুঝি ফের টেথিস সাগরে রূপান্তরিত হয়েছে! ততক্ষণে আত্রেয়ী দত্ত এবং অর্ণবও তল্লাশি শেষ করে। ফিরে এসেছে। অর্ণব কথাটা শুনে যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। আত্রেয়ীর হাতে জনসনস বেবি ক্রিম ও বেবি পাউডার। সে কী করবে বুঝতে না পেরে সেটাই তুলে দেখায়, "স্যার, এগুলো পেয়েছি।"

অধিরাজ নিষ্পলকে বীণা পন্ডিতের দিকে তাকিয়েছিল। বোধহয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিল। আত্রেয়ীর ডাকে সম্বিত ফিরে পেল। সে একঝলক সেদিকে তাকিয়ে বলল, "বেবি ক্রিম কে মাখে?"

বীণা নিরুত্তাপস্বরে জবাব দেন, "আমি।"

– "ও।" সে আত্রেয়ীর দিকে তাকায়, "এভিডেন্স ব্যাগে নিয়ে নিন মিস দত্ত।"

"ওকে স্যার।"

অধিরাজ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আপনি এই কথাগুলোই স্বয়ং শিশির সেনের সামনে বলতে পারবেন?"

বিদ্যুৎগতিতে উত্তর এল, "পারব।"

"ফাইন।" অধিরাজ উঠে দাঁড়ায়, "আজ আর কোনও প্রশ্ন করব না। কাল এডিজি সেনকে নিয়ে এসে বাকি যা জানার জেনে যাব। আপনার আপত্তি নেই তো?"

– "নাঃ।" ভদ্রমহিলার মুখ ভাবলেশহীন, "আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"থ্যাঙ্কস্।"

আর কোনও কথা না বলে ওরা বীণা পন্ডিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। অর্ণব তখনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। শিশির সেন সম্পর্কে যা শুনে এল তা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডঃ চ্যাটার্জী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষপর্যন্ত বিড়বিড় করে বললেন, "বিশ্বাস হয় না! অসম্ভব।"

"কিন্তু ভদ্রমহিলা ড্যাম কনফিডেন্ট!" অর্ণব বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই শোনায়, "যদিও আমারও অসম্ভবই মনে হচ্ছে।" -

"সম্ভব কী অসম্ভব তা কালই বোঝা যাবে অর্ণব।" অধিরাজেরও মুখ গম্ভীর, "পুলিসের লোকেরা রেডলাইট এরিয়ায় যেতে পারে না? বেশির ভাগ ক্রাইমগুলো রেড লাইট এরিয়াতেই ঘটে ডক। পুলিস রেডও প্রায়সই পড়ে। শিশির সেন রেডলাইট এরিয়ায় গিয়েছিলেন শুনে আঁতকে উঠছেন কেন?"

"কিন্তু উনি অফিসার দাশগুপ্তের কথা অমান্য করে রেডলাইট এরিয়ায় কী করছিলেন?"

"সে তো কালই জানা যাবে। তার আগে আপনি দয়া করে আজই রাবণের ছবিটার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট আমায় দিন। আর এই জনসনস বেশি ক্রিম আর পাউডার থেকেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলুন।"

"কিন্তু এডিজি সেন আর রেডলাইট..!"

ডঃ চ্যাটার্জী ফের একই কথা বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই দু'হাত জোড় করে ফেলেছে অধিরাজ, "বাবা ফুটবলনাথ! আপনার ব্রোকেন গ্রামাফোন রেকর্ডটা বন্ধ করে যেটুকু বলছি সেটুকুই করুন প্লিজ। নয়তো আমার লাইফের রেকর্ডটা আর আনব্রোকেন থাকবে না।"

'ফুটবলনাথ' শব্দটা শুনেই পুরো গরম তেলে ফেলা পিঁয়াজির মতো চিড়বিড়িয়ে উঠলেন ডঃ চ্যাটার্জী, "নিউ রিক্রুটের সামনে একদম এসব অশ্লীল শব্দ বলবে না বলছি! অসভ্য, হনুমান, কদর্য উনপাঁজুরে বদমাশ ছোঁড়া কোথাকার!"

উত্তরে অধিরাজ কিছু বলার আগেই তার মোবাইল বেজে উঠছে। অফিসার পবিত্র আচার্য! নামটা দেখেই ফের মনের ভেতরের তিক্ততাটা টের পেল "অধরাজ । তবু ফোন কাটল না। বরং লাউডস্পিকারে দিয়ে বলল, "বলো।" ওপাশ থেকে পবিত্র'র কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তার কণ্ঠস্বর অসম্ভব সিরিয়াস, "রাজা। খুব খারাপ নিউজ আছে।"

অধিরাজ গাড়ির সিটে টানটান হয়ে বসে। অর্ণব ড্রাইভ করতে করতেই মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছে। ডঃ চ্যাটার্জী টেনশনে ম্যানার্সকে গুলি মেরে নখ খাচ্ছেন! অধিরাজ বলল, "শুনছি।"

"জাস্ট এক মিনিট আগে নেতাজি নগর পুলিস স্টেশন থেকে খবর এসেছে। ওখানে এক সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট স্টোরের দু'জন সিকিউরিটিকেই কাল রাতে কেউ খুন করে গিয়েছে। স্ট্যাবিং কেস! দুটো সার্জিক্যাল স মিসিং! এত কড়াকড়ির পরেও এই কাণ্ড। ওদের স্টোরে সিসিটিভিও নেই এত । দেরিতে খবর দিল যে...!" -

অর্ণব, ডঃ চ্যাটার্জী ও আত্রেয়ী দৃষ্টি বিনিময় করে। একটা শকিং নিউজের পরে আরেকটা! অধিরাজের মুখ ইস্পাত কঠিন, "এটাই বাকি ছিল! ঠিক আছে। লাশদুটোকে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দাও।"

“ওকে।”

ফোনটা কেটে দিয়ে অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকায়। তার কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো প্রকট!

– “এত দিন খুনী ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাতেই এই অবস্থা! এখন একটা নয়, দু'দুটো ব্র্যান্ড নিউ সার্জিক্যাল স’ তার হাতে আছে। ব্যাড নিউজ... ভেরি ব্যাড নিউজ!”

অর্ণব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। অর্থাৎ, এখন কী করণীয়? তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝতে পেরে অধিরাজ বলে, “লোকটার একটাই দুর্বলতা! ঐ ন'টা স্কাল। সে স্লটার-হাউজে দামি জিনিসগুলো মায় নাইফগুলোও ছেড়ে গিয়েছিল। এমনকি নাইফ শার্পনারটাও নিয়ে যায়নি। নাইফগুলো এইজন্যই নেয়নি, কারণ হয়তো তার কাছে আরেকটা সেট আছে। কিন্তু ন'টা খুলি তার কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে রীতিমতো প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে নিয়েছে। এখন যদি খুলিগুলোকে কবজা করতে পারি তবে অন্তত একবার লোকটাকে ডিফিট দেওয়া যাবে।”

“কিন্তু কীভাবে? খুলিগুলো আছে কোথায়?” —

অধিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলল; “শুধু খুলি নয় অর্ণব, আমার ধারণা দু' দুটো ব্র্যান্ড নিউ সার্জিক্যাল স’ও তার সঙ্গেই আছে।”

“কিন্তু কোথায়!” অর্ণব আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলে, “এই গোটা কলকাতা শহরে কোথায় সে খুলি আর স’ লুকিয়ে রেখেছে তা বের করবেন কী করে? এ তো খড়ের গাদায় সূঁচও নয় – পিন খোঁজা।”

“পিন নয়— সার্জিক্যাল স।” অধিরাজ অর্থপূর্ণভাবে চোখ টেপে, “জাস্ট ওয়াচ মি।”

(২৪)

“প্যান্ট খোল!”

আয়নার ভেতরে এক অসহায় কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে নির্দয়, নির্মম কণ্ঠে ধমকে উঠল এক বলিষ্ঠ চেহারার তরুণ, “প্যান্ট খোল বলছি। দেখি তোর মালটা আছে কি না!”

প্রতিবিম্বের কিশোর ভয়ে কাঁপছে। অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে কোনওমতে বলল, “আর করব না! ছেড়ে দাও।”

- “ছেড়ে দেব?”

বলিষ্ঠ তরুণ নির্দয়ের মতো কষিয়ে এক থাপ্পড় মারল কিশোরের গালে। কিশোরটির গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ স্পষ্ট হয়ে বসে যায়। সে ধাক্কাটা নিতে না পেরে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। তরুণ তার ওপরে চেপে বসে। ছেলেটির বুকের হাড় যেন মটমটিয়ে উঠল।

“খোল শালা! আজ দেখেই ছাড়ব তুই মাগী, মদ্দা না হিজড়ে।"

কিশোর আপ্রাণ নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। বারবার বলছে, “আমার ভুল হয়ে গেছে। আর কখনও করব না।”

“কী কেস?”

ততক্ষণে আরেক তরুণ এসে হাজির। সেও রীতিমতো সুঠাম চেহারার অধিকারী। পরনের সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট দেখলেই মনে হয়, স্পোর্টসম্যান। দৃশ্যটা দেখে অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে, “ছেলেটাকে মারছিস কেন?”

“এই শুয়োরের বাচ্চাটা কী করেছে জানিস?” প্রথম তরুণ অসম্ভব ক্ষোভে বলে, “আমি যখন ড্রেসিংরুমে চেঞ্জ করছিলাম, তখন হারামি লুকিয়ে বসে দেখছিল। রোজই দেখে মালটা। আজ যেই হাতেনাতে ধরেছি, অমনি বলে ‘তোমায় দেখতে খুব সুন্দর!’ ন্যাংটো ছেলে দেখতে নাকি ওর ভালো লাগে।”

কিশোর তখন মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছে। এবার দ্বিতীয় তরুণ ভারী মজা পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, “মেয়েছেলে নাকি রে। দেখি তো!”

কিশোর তাদের হাতে-পায়ে ধরল, "প্লিজ, আমায় ছেড়ে দাও। আর কখনও করব না। প্লিজ...।"

দুই তরুণ ততক্ষণে মজা পেয়ে গিয়েছে। একজন সবলে ওর হাত পা চেপে ধরে রেখেছে। অন্যজন টান মেরে তার পোষাক খুলতে ব্যস্ত। কিশোর আপ্রাণ শক্তিতে দুই সবলের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে "একদম পারছে পেরে উঠবে না! ফের তাকে এক চড় কষাল প্রথমজন, হাত পা চালাবি না। তাহলে সোজা ছাত থেকে তুলে নীচে ফেলে দেব।"

সে ভয়ে ওখানেই আধমরা হয়ে যায়। ততক্ষণে হিড়হিড় করে তার অন্তর্বাস সমেত প্যান্ট খুলে ফেলেছে দুই সবল মানুষ! নিজেকে ঢাকার জন্য শুধু চামড়া ছাড়া আর কোনও আবরণ নেই! কিশোর ভয়ে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তার নগ্নতা যতখানি লজ্জার, তার থেকেও বেশি স্পর্শকাতর। নগ্ন দেহের থেকে নগ্ন মনের লজ্জা, স্পর্শকাতরতা আরও বেশি। কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা নেই অন্যপক্ষের। ছাত্ররা যেমন ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র বের করে দেখে ভারী মজা পায়, একরকম খেলা ভাবে তারাও ব্যাপারটা তেমনই ভেবেছে।

"এটা কী করতে আছে?"

একজন তার পুরুষাঙ্গটাকে সজোরে টিপে ধরে। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে ছেলেটি। লোহার মতো আঙুলে অঙ্গটাকে নেড়ে চেড়ে বলল প্রথম তরুণ, "জানিস এটা দিয়ে কী করে?"

অসম্ভব ভয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। বুঝতে পেরেছে বেশি কথা বললে আরও বেশি অত্যাচার করবে এরা।

"জানিস না?" দুই তরুণ পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করে, "দাঁড়া, দেখাচ্ছি। নেট প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে। তুইও সারাজীবন মনে রাখবি।"

সত্যিই নেট প্র্যাকটিস হয়েছিল। এবং সে সারাজীবন মনেও রেখেছিল। দুই তরুণের উদ্ধত, তীক্ষ্ণ পৌরুষের আঘাতে ফের রক্তাক্ত, অপমানিত হয়েছিল সে। অথচ কী ভুল করল নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি। সে দেখেছিল, অনেক মেয়েই ড্রেসিংরুমের জানলায়

উঁকি মেরে তরুণ খেলোয়াড়দের পোষাক বদলাতে দেখে। প্লেয়াররা যে টের পায় না এমন একেবারেই নয়। বরং স্পষ্ট দেখেও না দেখার ভান করে। কখনও কখনও আড়চোখে কোনও বিশেষ মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে নিজের কাজে মন দেয়। ব্যাপারটা কী প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল, এর নাম নাকি ভালোবাসা!

সেই কিশোরও মেয়েদের দেখাদেখি কৌতূহলে চোখ পেতেছিল ড্রেসিংরুমের জানলায়। যা দেখল তাতে চক্ষু চড়কগাছ! সুঠাম, সুপুরুষ সব ছেলেরা প্রায় অর্ধনগ্ন হয়ে জার্সি পড়ছে। একেকজনের কী চেহারা! তার মধ্যে এক গৌরবর্ণ তরুণের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের দেহটায় খাঁজে খাঁজে স্বেদবিন্দু। প্রতিটি পেশী পেলব ময়ালসাপের মতো আড়মোড়া ভাঙছে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে কপালে, নাকে কিংবা ঈষৎ মোটা ঠোঁটে।

ছেলেটার হৃৎপিণ্ড দ্বিগুণতালে চলতে শুরু করে। সে যেন অদ্ভুত এক রঙীন নেশায় মজে গেল। সে নেশা কী বোঝানো মুশকিল। সে এক উদ্দাম বল্গাহীন আকর্ষণ। জ্বলন্ত উল্কাখণ্ডের মতোই বুকের ভেতরে কী এক অশান্তিময় জ্বালার লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে যাওয়া! এক মুহূর্তও শান্তি নেই। বোধহয় মেয়েরা একেই ভালোবাসা বলে।

কিন্তু সেই প্রিয় তরুণকে সে দিনের কিশোর ছেলেটা কিছুতেই বোঝাতে পারল না যে সে শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিল। যাকে দেখলে তার মনের ভেতরটা অসীম আবেশে ঢলে পড়তে চাইত, যার প্রতিটি ঘামের ফোটার সঙ্গে মিশে যেতে চাইত; সে-ই তাকে আরেক বন্ধুর সঙ্গে মিলে পৌরুষের ঔদ্ধত্যের চরম পাঠ শিখিয়েছিল! বেশ কয়েকবার নেট প্র্যাকটিসের পর যখন তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ওরা, তখন ছেলেটা অর্ধমৃত। মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে আসছে। চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু পড়ছে টপটপ করে! নগ্ন দেহটা অযত্নে, অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে ড্রেসিংরুমের মেঝেতে। গর্বিত তরুণেরা ভেবেছিল; এটা বিশেষ কৃতিত্বের কাজ। তাদের কাছে এটা একটি 'নোংরা' ছেলেকে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া! সুশিক্ষিত সমাজের কাছে, এটা ভারী মজার ব্যাপার। অথচ

কেউ বুঝতেও চাইল না, সেই তথাকথিত মেয়েলি, 'নোংরা' ছেলেটা আসলে কী চেয়েছিল! আমি তো শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিলাম!

লোকটা একদৃষ্টে তার দশম শিকারের ছবির দিকে তাকিয়েছিল। তুমিই বলো না, আমার কি ভালোবাসতে নেই? সেদিন যদি আমার জায়গায় কোনও চতুর্দশী পঞ্চদশী হাঁ করে তাকিয়ে পুরুষের পোষাক বদলানো দেখত, তবে তো তা বীরপুঙ্গবের একটুও খারাপ লাগত না! তবে আমায় কেন...? আমি শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিলাম! তার কোনও শর্ত ছিল না। নারীদের ভালোবাসায় অনেক স্বার্থ থাকে। আমার কোনও স্বার্থ ছিল না। মেয়েরা প্রেমিকের কাছে ভালোবাসা, শরীরের থেকেও বেশি টাকা, গয়না, নিরাপদ জীবন দাবি করে। ওরাও সবাই একরকমের গৃহপালিত পরনির্ভরশীল জীব! ওদের মধ্যে আছেটা কী? আমি তো কোনওটাই চাইতাম না। শুধু ভালোবাসা।

একটু সহৃদয় প্রেম। একটু সঙ্গসুখ। এর থেকে বেশি চাওয়ার কী আছে? সে আস্তে আস্তে জনসনস বেবি ক্রিমের কৌটোটা বের করে সযত্নে ক্রিম মাখতে থাকে। এ গন্ধটা বড় প্রিয় তার। এই গন্ধে নিরাপত্তা আছে। এই মিষ্টি সৌরভ তাকে আপন করে দেয়। পরম মমতাময়ী মায়ের মতো স্নেহাশিষ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে।

লোকটা জোরে নিঃশ্বাস টানে। তার মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট, ভারী আরাম পেয়েছে। সে পরম আদরে ছবিটার ওপর হাত বোলায় । প্রিয়, ...প্রিয়তম আমার। এত রাগ কেন? চাঁদের গায়ে শুধুই জ্যোৎস্না থাকবে? রাহুর থাকতে নেই? সে কী দোষ করেছে? সেও তো ভালোবাসতেই চায়। তার ভালোবাসা অন্যরকম বলে বুঝতে পারো না? কেন?

সেদিন থেকেই বুঝেছি 'পুরুষকে' ভালোবাসতে নেই। তাকে ভালোবাসার আরেক নাম যন্ত্রণা। কিন্তু বারবার প্রচণ্ড আকর্ষণে আমায় পাগল করে তুলেছে পুরুষেরা! তাতেই বা আমার দোষ কী? আমি তো এই কামনা নিয়ে নিজে জন্মাইনি। আমায় যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই জন্মলগ্নে এই অভিশাপ লিখেছিলেন অদৃষ্টে। অথবা জিনগত ভাবেই আমার এই অদ্ভুত বাসনা! কিন্তু কে বুঝবে? কেউ বোঝেনি। রক্তাক্ত শৈশব, রক্তাক্ত কৈশোর! একই ভুল ক্রমাগত করেছি। সহপাঠীকে মনে মনে কামনা করে তার সমস্ত কাজ করে দিয়েছি। তার হোমওয়ার্ক, প্রোজেক্ট, এমনকি সমস্ত খুঁটিনাটি কাজও অনুগত

ভৃত্যের মতো করেছি। এমনকী পরীক্ষার সময়ে কড়া ইনভিজিলেটরের চোখ এড়িয়ে তার খাতায় সব উত্তর লিখে দিয়েছি। কেন? এই আশায় যে কোনওদিন সে আমার ভালোবাসা বুঝবে।

ভীষণ অভিমানে মানুষটার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। তারপর কী হল জানো? সে এক মেয়ের হাত ধরে দিব্যি চলে গেল। আমাকে নিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে ঠাট্টা করত! আমি ওদের কথোপকথন স্বকর্ণে শুনেছি। আমার প্রিয় সহপাঠী তখন প্রেমিকাকে আমার সম্পর্কে বলছিল, “ও আবার একটা মানুষ নাকি! আগেকার দিনে বাদশাদের খোজা দাসী-বাঁদী থাকত না? ও হচ্ছে তাই!”

বুঝতে পারছ এই কথা নিজের কানে শোনার পর আমার কী অবস্থা হয়েছিল! সেদিন ও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল আমার অবস্থানটা কী! তারপরও অবশ্য শিক্ষা হয়নি! এক স্যারের সুঠাম শরীরটা খুব ভালো লাগত। থাকতে পারিনি। নিজের মনের কথা বলে তাকে চুমু খেতে গিয়েছিলাম বলে তিনি আমাকে পুরো নগ্ন করে গোটা ক্যাম্পাস ঘুরিয়েছিলেন। চুমুই তো ছিল, ভালোবাসাই তো ছিল! তার জন্য এমন শাস্তি! আমি লজ্জায় ঘেন্নায় কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। আমি হেঁটে গেলে সবাই ফিসফিস করত! জানতাম ওরা হাসছে। রাস্তায় হাঁটলেই চতুর্দিক দিয়ে আওয়াজ ভেসে আসত; ‘গুলাবো’, ‘চম্পা’, ‘আনারকলি’! দেহের ক্ষত ওষুধে সারে। কিন্তু মনের ক্ষত কীভাবে সারবে!

লোকটা দু'হাতে কান চেপে ধরল। যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে টিটকিরিগুলো! বর্বর সুশীল সমাজ চিৎকার করে বলছে; “অ্যাই শালা হিজড়ে!” সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তার দেহ এক অজানা তীব্র বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছে।

তারপর থেকে আর ভয়ে কখনও কাউকে ‘ভালোবাসি’ বলতে পারিনি। ভয়ের চোটে নিজের অদম্য ইচ্ছের কথা নিজের মনেই চেপে রেখেছি। কেন এমন হবে বলো? পুরুষের স্পর্ধা সবসময়ই আমার প্রেমকে অগ্রাহ্য করছে, ছিন্নভিন্ন করেছে! কিন্তু আমি কম কীসে? গুণের অভাব ছিল? প্রেমের অভাব ছিল? কীসের অভাব ছিল! বলো, বলো আমায়! একটাই শুধু পাপ; আমি নারী নই! কী আশ্চর্য!

খুনীর কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তুমিও করবে না। কিন্তু কাউকে আমি মারতে চাইনি। আমি তো শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিলাম। শুধু ভালোবাসতে চেয়েছিলাম...! অথচ আমার ভালোবাসার অধিকার নেই! বাঁচার অধিকার নেই। আমার তো মরারও অধিকার নেই! ওঃ ইশ্বর, আই অ্যাম কার্সড আই অ্যাম কার্সড!

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার মুখমণ্ডল নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ভালোবাসা, প্রেম যন্ত্রণা দিয়েছে আমায়। প্রত্যেকবার অপমানিত, লাঞ্ছিত করেছে। তাই ওদেরও আমি যন্ত্রণা দিয়েছি। যাদের যাদের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল, তাদের সেই জাতীয় ভালোবাসাই ফিরিয়ে দিয়েছি যেটা আমায় স্বয়ং এই সমাজ শিখিয়েছে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক প্রেম! ওরা কেউ আমার হত না! তাই ওরা আর কারোর হবে না! হয়নি। আমি প্রতিবার চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করেছি; শৌর্যে, বীর্যে, বুদ্ধিমত্তায় আমি ওদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আমাকে ভালো না বাসলেও ভয় পেতেই হবে।

সে অসম্ভব মোহে ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে! ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না তোমাকে। আমি আজ পর্যন্ত যত পুরুষ দেখেছি তার মধ্যে তুমি সুন্দরতম, তুমিই শ্রেষ্ঠ। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি আমার। ভয় পাচ্ছ তাই না? পাও! কারণ আমি তোমার পেছন মরলেও ছাড়ছি না! লোকটা হো হো করে হেসে ওঠে। তারপরই বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে তার প্রিয় কবিতা!

“রোগের মতোন বাঁধিব তোমারে
দারুণ আলিঙ্গনে—
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে।
গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,

আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে।
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধারঘোরে,
কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধরে।
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা সভয় গণি,
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার হাসির ধ্বনি।”

তার কন্ঠস্বর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছল। চিৎকার করে বলল,

“এ পাষাণ প্রাণ চিরশৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে
একবার তোরে দেখেছি যখন,
কেমনে এড়াবি মোরে।”

(২৫)

বিকেল থেকেই আকাশের মুখভার। এমনিতেই শীত বেশ জমিয়েই কামড় বসাচ্ছিল। তার ওপর সন্ধ্যে হতে না হতেই অঝোরধারে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া বরফশীতল হাওয়া। কলকাতার পথঘাট অন্ধকার হতে না হতেই ফাঁকা। নিতান্তই যাদের উপায় নেই, তারা ছাড়া প্রায় সমস্ত নগরবাসীই উষ্ণতার খোঁজে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বেশিরভাগ দোকানদারই বুঝে গিয়েছে যে এ শীতের রাতে বিশেষ ক্রেতা পাওয়া যাওয়া যাবে না। তাই ঝপাঝপ দোকানের শাটারও পড়েছে। শুধু বিদেশি মদের দোকান আর বার-কাম রেস্তোরাগুলো খোলা।

সুপ্রাচীন শ্লটার-হাউজের ঠিক মাথার ওপরে সুদীর্ঘ বিদ্যুতের রেখা ঝলসে উঠল। বৃষ্টির মধ্যে আপাদমস্তক ভিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে দাম্ভিক ধ্বংসস্তূপ। অবিরাম বর্ষণের একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। অন্যান্য দিন তবু দু' একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। আজ তাও শোনা যাচ্ছে না। কুকুরগুলোও বোধহয় বৃষ্টির দাপটে মাথা বাঁচাতে আশ্রয়ের খোঁজে গিয়েছে। ভগ্ন, প্রাচীন বাড়িটার প্রত্যেকটা ইট থেকে অশ্রুর মতো জল ঝরে পড়ে। অনেক রক্ত, অনেক অশ্রুজলের সাক্ষী এই কসাইখানা! হাজার হাজার নিরীহ, নিষ্পাপ প্রাণের বলি দেখতে দেখতে হয়তো সে-ও পাষাণ হৃদয় হয়ে উঠেছে। তাই প্রকৃতির কান্নায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হচ্ছে না তার কঠিন দেহ! শূন্য অক্ষিকোটরের মতো দুটো জানলা দিয়ে জলবিন্দু হাহাকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পেশল বুকে। গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে। তবু অদ্ভুত নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন শ্লটার-হাউজ। প্রত্যেকটা পেশী দিয়ে প্রতিহত করছে জলের নরম বিন্দুকে। প্রত্যাখ্যান করছে। বৃষ্টির ছাঁটও পাগলের মতো একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে পড়ছে। যেন গন্তব্যস্থল ঠিক করে উঠতে না পেরে আলুলায়িত কেশ উন্মাদিনীর মতো এলপাথাড়ি মাথা ঠুকে মরছে।

শ্লটার-হাউজের চতুর্দিকে আজ আর পুলিস প্রহরা নেই। ভীষণ শীত আর বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্যে তারাও সাময়িক বিরতি নিয়েছে। এই হাড়কাঁপানো শীত আর অঝোর ধারার মধ্যে একমাত্র যম ছাড়া আর বোধহয় কেউ ডিউটিতে বেরোয় না। পুলিসকর্মীরা নিশ্চয়ই মাথায়

বাজ পড়ার অপেক্ষায় মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে না! অগত্যা স্লটার-হাউজ আপাতত অরক্ষিত। যদিও তাকে ঘিরে রেখেছে হলুদ ফিতের সতর্কবাণী; 'ক্রাইম সিন। ডু নট ক্রস্'। দরজায় ঝুলছে পুলিসি তালা।

অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ প্রেক্ষাপটকে আরও বেশি নীলাভ অন্ধকার, আরও ঝাপসা করে দেয়। এখন ঠিকমতো কিছু ঠাহর করাই দায়। তবু আকস্মিকভাবেই মনে হল স্লটার-হাউজের পার্শ্ববর্তী একটা গাছের ডাল সজোরে নড়ে উঠল। একটা ছায়ামূর্তি যেন অভিশপ্ত প্রেতের মতো গুঁড়ি মেরে গাছের ডাল বেয়ে খোলা জানলা দিয়ে স্লটার-হাউজের মধ্যে ঢুকে গেল! আরও একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তার পরনে একটা বহুদিনের পুরনো ও ভারী রেইনকোট। মুখটা মুখঢাকা টুপিতে ঢাকা। চলন সন্ত্রস্ত। প্রতিটা পদক্ষেপে সতর্কতা। দেখলে মনেই হয় না যে ও আদৌ মানুষ! বরং অশরীরী ছায়ার সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি। চোখের ভ্রম হয়তো বা! ওর যে আদৌ রক্তমাংসের কায়া আছে তা বিশ্বাস করাই কষ্টকর।

নিঃশব্দেই দপ করে একটা আলোর রশ্মি জ্বলে উঠল। দোতলার জানলা বেয়ে টর্চের বেশ জোরালো আলোর আভাস আসে। মানুষটা হাতে টর্চ নিয়ে খুব সাবধানে দোতলা থেকে নেমে এল। প্রত্যেকটা প্রাচীন সিঁড়ির ওপরে মেপে মেপে পা রাখছে। বিশ্বাস নেই! সিঁড়িগুলো প্রায় ভাঙতেই বসেছে। কখন পায়ের চাপে হুড়মুড়িয়ে পড়ে কে জানে!

তবে তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না। লোকটা নিরাপদেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল একতলায়। চুপিসাড়ে এগিয়ে গেল কিলিং ফ্লোরের দিকে। যেতে যেতেই থমকে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ডিস্প্লে'র হুকগুলো। তার মুখে একটা ধারালো অথচ বাঁকা হাসি ভেসে ওঠে। তার কত কীর্তির সাক্ষী এই হুকগুলো! তাজা রক্তের গন্ধ আজও তার নাকে লেগে আছে। এখানেই একের পর এক মানুষগুলোকে শেষ করেছিল। প্রথমে পাঁচজনকে। তারপর একে একে আরও চারজন! ঐ হুকগুলোতেই ঝুলিয়ে দিয়েছিল লাশগুলোকে। কর্তিত মুণ্ড ক্ষত বিক্ষত লাশগুলোর থেকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিল সোজা ড্রেনে! কেউ ধরতেই পারেনি তাকে! বত্রিশ বছর ধরে সে কিংবদন্তী হয়ে আছে!

"আই অ্যাম লিজেন্ড!" ভীষণ আত্মতুষ্টিতে একটা সজোরে শ্বাস টেনে বলল সে। লিজেন্ডই বটে! বত্রিশ বছর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চিনতেই পারেনি। স্টেশনের ভিড়ে, বাসস্ট্যান্ডের জটলায় মিশে কোটি কোটি আমজনতার মধ্যেই একজন হয়ে রয়ে গেল। কেউ জানতেই পারেনি, 'সার্জিক্যাল স' কিলারের আসল মুখ কোনটা! কত অন্ধকার রাতে কত নিরীহ পথচারীর পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছে সে। কত লোক তার পাশে বসেই সুকোমল পান্ডেকে গালাগালি দিয়েছে। কত দিন কত রাত্রি শহরের কত গলিখুঁজি দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গিয়েছে। খোলা জানলার ওপাশে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটা টেরও পায়নি এইমাত্রই তার পাশ দিয়ে চলে গেল সারা শহরের আতঙ্ক! কেউ সন্দেহ করেনি!

জীবন তাকে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে শিখিয়েছিল। নিজেকে না প্রকাশ করার উপায়! একসময়ে মনের কথা প্রকাশ করে এত অত্যাচার সয়েছে যে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝে গিয়েছিল, এ দুনিয়ায় কখনও নিজের আসল রূপটা প্রকাশ করতে নেই। সবচেয়ে বড় ছদ্মবেশ সেটাই। বাইরের রূপ বদলটা খুব কঠিন নয়। ওটা একটু শিখে নিলেই করে নেওয়া যায়। কিন্তু নিজেকে একটা অন্ধকূপে পরিণত করাটাই হচ্ছে আসল ক্যামোফ্লেজ। নীরবতাই তার ভাষা! লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারাই তার চেহারা! তার কোনও নির্দিষ্ট নাম নেই, ঠিকানা নেই, পরিচয় নেই। সে কথা কিনতে জানে, বেচতে জানে না। তার মনে কী আছে তা জানা ঈশ্বরের অসাধ্য। কখন আসে, কখন যায়; কোথায় যায়, কেন যায় কেউ খবর রাখে না!

তার একটাই পরিচয় সে মূর্তিমান আতঙ্ক। ব্যস এটুকুই! কুখ্যাত 'সার্জিক্যাল স' কিলার এবার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল কিলিং ফ্লোরের দিকে। এখনও লোহার গরাদ দেওয়া সার সার ঘরগুলো বুকে অন্ধকার জমিয়ে চুপ করে বসে আছে। কোনও একসময়ে মরণ আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হত এর দেওয়ালে দেওয়ালে। আজ হৃতগৌরব, হতশ্রী। তবু দেখলে গা শিরশিরিয়ে ওঠে। অনেকদিন তারা রক্তপান করেনি। সেই তৃষ্ণা যেন অন্ধকারের রূপ ধরে জীবন্ত হয়ে উঠছে। সে সযত্নে লোহার শিকগুলোয় হাত বোলায়। চিনতে পারছ আমায়? বত্রিশ বছর আগে তোমরা আমায় অন্যরূপে দেখেছিলে। আমি কিন্তু ভুলিনি দেখো। আবার বত্রিশ বছর পরে ফিরে এসেছি। আরও একবার এসেছিলাম।

তবে দিনের বেলায় চিনতে পারোনি। আজ রাতের অন্ধকারে এই আগন্তুককে চেনা যাচ্ছে? লোহার গরাদ হয়তো সামান্য শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তার স্পর্শে সশব্দে ঈষৎ নড়েচড়ে উঠল। লোকটা সস্নেহে কসাইখানার লৌহকপাটকে একবার দেখে নেয়। চিনেছ দেখছি। মানুষ চিনতে পারেনি। কিন্তু তোমরা ঠিক চিনে -ফেলেছ। ভুলবে কী করে? তোমরা তো আমারই প্রজাতির ! নীরব, নৈঃশব্দে মোড়া অন্ধকারের প্রাণী! রক্তের গন্ধ তোমাদের খুব প্রিয়, আমারও। আমরা কেউ কখনও দাবি করিনি যে আমাদের শিরায় অহিংসার রক্ত বইছে। দু'জনেই বাইরের মানুষের সামনে লোহার গরাদ তুলে দিয়েছি। ভেতরে যে কত রক্ত জমে আছে; তা কাউকে দেখতে দিইনি। তুমি আর আমি দু'জনেই সমান নিষ্ঠুর! জীবন্ত অসহায় প্রাণীর গলা কেটে নিতে আমাদের কারোরই হাত কাঁপে না।

সে লক্ষ্য করেনি, কখন যেন চুপিসাড়ে তার পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে আরও দুটো ছায়ামূর্তি। ওরাও যেন শুধু ছায়াশরীর! প্রাণের স্পন্দন তাদের মধ্যেও দেখা যায় না। আশ্চর্য রকমের স্থির। জমাট অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় রঙের পোষাক পরে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চুপচাপ দেখে চলেছে লোকটার কাণ্ড। "গরাদগুলোকে নিয়ে পড়েছে কেন স্যার?" অন্ধকারের ভেতরেই শোনা যায় অর্ণবের চাপা কণ্ঠস্বর, "ওগুলোরমধ্যে কিছু নেই তো?"

"ওগুলোর মধ্যে কিছু আছে কিনা জানি না অর্ণব, কিন্তু লোকটার মাথার মধ্যে কী আছে সে বুঝতেই পারছি।" অধিরাজের কন্ঠস্বর যেন বাতাসের চেয়েও হাল্কা, "বত্রিশ বছর পর ওর মাথাটা আরও গেছে! জিনিয়াসের মাথায় যখন শয়তান ঢোকে, তখন তার চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু হয় না।"

তার ফোন ভাইব্রেট করে ওঠে। সে ব্লু টুথ সেটের মাধ্যমে সংযোগস্থাপন করে খুব নীচু স্বরে বলল, "বলুন ডক।"

"রাবণের ছবিতে দুটো লোকেরই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি রাজা। একটা শিশির সেনের। অন্যটা আননোন।" ডঃ চ্যাটার্জী কোনও ভূমিকা না করেই জানালেন, "তবে জনসনস বেবি ক্রিম আর পাউডারের ওপরে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি, তার সঙ্গে এই আননোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট হুবহু মিলে যায়!"

– "শিশির সেনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট!" অধিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলে, "এডিজি সাহেব ডোবাবেন দেখছি। অফিসার দাশগুপ্তের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাননি?"

"নোপ্!" তিনি একটু চিন্তিত, "এই ব্যাপারটায় আমিও আশ্চর্য হয়েছি। অফিসার দাশগুপ্তের আঁকা ছবিতে তাঁর নিজেরই ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই! বরং শিশির সেনের ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছড়াছড়ি। তাহলে কি এই ছবিটা অফিসার দাশগুপ্ত আঁকেননি?"

"পসিবল।" অধিরাজ বলল, "আপনার প্রশ্নের উত্তরটা একটু পরে - দিচ্ছি ডক। আপাতত গুডনাইট।"

ডঃ চ্যাটার্জীকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়েই লাইন কেটে দেয় সে। লোকটা ততক্ষণে গরাদওয়ালা দরজা খুলে ঢুকে পড়েছে কিলিং ফ্লোরের একটা ঘরে। তার হাতের টর্চের আলো সরলরেখায় পড়ল ঘরের মেঝেতে। অর্ণব ও অধিরাজ দেখল মেঝের একটা টাইলস সশব্দে সরে গিয়েছে। তার জায়গায় চতুষ্কোণ গর্ত! লোকটা হাতের টর্চটা মাটিতে নামিয়ে সেই গর্তের ভেতর থেকে কিছু বের করে এনেছে। তারপর আরেকটা টাইলস সরল। তার ভেতর থেকেও বেরিয়ে এল কিছু জিনিস। এক এক করে টাইলস সরিয়ে মোট দশটা জিনিস তুলে আনল সে। দুই অফিসার দেখল, সেগুলো আর কিছুই নয়— ন'টা মানুষের খুলি এবং একটি প্রাচীন সার্জিক্যাল স! "মেঝেটা ফাঁপা স্যার!" অর্ণব প্রবল বিস্ময়ে বলে, "টাইলসগুলো রিমুভেবল ও বটে। ও পাবলিক খুলিগুলোকে স্রেফ লুকিয়েছিল। অন্য কোথাও নিয়ে যায়নি।"

- অধিরাজ কোনও উত্তর দিল না। সে একদৃষ্টে খুনীর ভাবভঙ্গি দেখছে। - "ইনি কে? পুরুষ না মহিলা? মুখও তো দেখতে পাচ্ছি না! আধখানা রেইনকোটে ঢাকা। তার ওপর আবার সেই মুখ ঢাকা টুপিটাই পরে রয়েছে।" অধিরাজ এবার ইশারায় তাকে কথা বলতে বারণ করে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় খুনীর দিকে। তার পেছন পেছন অর্ণবও এগোল। দু'জনের হাতেই উঠে এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র!

লোকটা অসম্ভব দুশ্চিন্তায় ছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী যেরকম বুদ্ধিমান, এতক্ষণে যে সে খুলিগুলোকে বাজেয়াপ্ত করেনি এই অনেক! আর কী কী টের পেয়েছে কে জানে! তবে যাই হোক, সে এখনও ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের থেকে এক কদম এগিয়ে। এখনও তার

মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অফিসারকে ডিফিট দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ভাবতেই মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। অত সহজ নয় আমাকে ধরা! বত্রিশ বছর ধরে অপদার্থ পুলিসেরা যা পারেনি, তুমি তা পারবে! জেরি অত সহজে ধরা দেয় না...!

"থ্যাঙ্ক ইউ!"

সে আর কিছু বলার বা করার আগেই আকস্মিকভাবেই মুখের সামনে দপ করে দু' দুটো জোরালো টর্চ জ্বলে উঠল । তীব্র আলোর রশ্মিতে লোকটার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে হাত তুলে সঙ্গে সঙ্গেই মুখটাকে আড়াল করেছে।

"আমরা অনেকক্ষণ ধরেই আপনার পেছন পেছন আসছি। আপনি তো ফিরেই দেখলেন না!"

অধিরাজের গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগমিয়ে ওঠে গোটা ফ্লোরে। সে যেন ভারী দুঃখিত হয়ে বলল, "অন্তত পেছনের বাইকরাইডারকে লক্ষ্য করবেন তো! ফলো করার আর্ট কি একা আপনিই জানবেন? আমরাও তো অল্পবিস্তর জানতে পারি! এতখানি আন্ডার এস্টিমেট! সত্যিই রাবণের কেস হল যে! অতি দর্পে হতা লঙ্কা!"

লোকটার পুরো মুখটা যথারীতি টুপিতে ঢাকা। কিন্তু তার চোখদুটো স্পষ্ট দেখতে পেল অর্ণব! তার রক্ত প্রায় জল হয়ে যায়! এ কী চোখ! কী ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহায় দপদপ করে জ্বলছে! এ কী কোনও মানুষের চোখ হতে পারে? দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল, "তাহলে এটা ট্র্যাপ ছিল?"

"আজ্ঞে!" অধিরাজ নম্রভঙ্গিতে দীর্ঘ দেহ ঝুঁকিয়ে বাও করল, "এই ন'টা মাথা আপনার কাছে যে কতটা দামি তা আর কেউ না বুঝুক; আমি বুঝেছিলাম। তোমায় বলেছিলাম না অর্ণব? কষ্ট করে খোঁজার দরকার নেই! ওনার বড়ই দয়ার শরীর। উনি নিজেই আমাদের খুলিগুলোর খোঁজ দিয়ে দেবেন। খামোখাই তুমি ধরা পড়ার ভয় পাচ্ছিলে। ইনি এতই ভদ্র যে মেয়েদের মুখের দিকে তাকানই না। ঠিকানাটা আমাদের সত্যিই জানা ছিল না। সেজন্যই একদম আপনার পেছন পেছন এসে পড়েছি। থ্যাঙ্ক ইউ এগেইন স্যার।"

লোকটার মনে পড়ল যখন সে এ পথে আসছিল, তখন একজোড়া ছেলে-মেয়েও বাইকে করে তার পিছু পিছু আসছিল বটে। পুরুষটির মুখ "হেলমেটে ঢাকা ছিল। ছেলেটির কোমর জড়িয়ে ধরে একটি লেডিজ রেইনকোট পরা মেয়ে ভারী লাজুক ভঙ্গিতে পেছনে বসেছিল। স্বচ্ছ রেইনকোটের তলা দিয়ে উঁকি মারছিল তার সালোয়ার কামিজ। বর্ষা ভেজা রাস্তায় এক প্রেমিক যুগল অথবা দম্পতি বাইকে চড়ে কোথাও যাচ্ছে বা ফিরছে। দৃশ্যটা একটুও অস্বাভাবিক মনে হয়নি তার। মেয়েদের দিকে তাকানোর সে প্রয়োজনই বোধ করে না, তাই মেয়েটির মুখ লক্ষ্যও করেনি। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের সামনে এসে বাইক আরোহী তাকে হুশ করে কাটিয়ে চলে যাওয়ায় কোনওরকম সন্দেহও হয়নি।

সে বিস্মিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখনও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না! এত বড় ফাঁদ পেতেছে এরা! এ তো এক কথায় ওস্তাদের মার! তার মানে 'বাগ'টার অস্তিত্ব আগেই জেনে ফেলেছিল। কিন্তু সেটাকে নষ্ট না করে পালটা কাজে লাগিয়েছে। ইচ্ছে করেই তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ন'টা মাথার কথা বলেছিল। হয়তো সেই মুহূর্ত থেকেই তার ওপর লক্ষ্য রেখেছিল! সে মূর্খের মতো ভাবছিল, এখনও ওরা কিছুই টের পায়নি। ন'টা করোটির খোঁজ পাওয়ার আগেই তাকে সেগুলো সরিয়ে নিতে হবে, যেমন রেড পড়ার আগেই সরিয়ে ফেলেছিল! ঠিক যেমন ওরা আন্দাজ করেছিল, তেমনই সে-ও থাকতে না পেরে অন্ধকার হতে না হতেই অস্থির চিত্তে ছুটে এসেছে। আর তার পেছন পেছন এরাও এসে পৌঁছেছে। পার্ক সার্কাসে পৌঁছেই আন্দাজ করতে পেরেছিল যে সে কোথায় যাচ্ছে। তাই পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল নির্দ্বিধায়। ন'টা করোটি কোথায় আছে তা ওদের আদৌ জানা ছিল না। সে নিজের হাতেই খাল কেটে কুমীর এনেছে। খুনী স্বয়ং অফিসারদের এভিডেন্স অবধি পৌঁছে দিল! মার্ভেলাস! প্রিয়তম, তোমার তুলনা নেই! কীভাবে আমায় বাধ্য করলে বোকার মতো একখানা স্টেপ নেওয়ার জন্য! আমি ভুল করিনি, তুমি আমায় বাধ্য করালে ভুল করতে। সেক্সি!

"আপনি কি আমার পেছনের মেয়েটিকে খুঁজছেন?" অধিরাজ একটু চিন্তা করে বলল; "অর্ণব, আমার মায়ের লেডিজ রেইনকোট, সালোয়ার কামিজ আর অমন দামি উইগটা

কোথায় রেখেছ ভাই?”

“আমার ব্যাকপ্যাকে আছে স্যার। বাইকে ঝুলিয়ে রেখেছি।” অর্ণব নিরীহ স্বরে বলে, “আবার পরে আসব?”

খুব - –

“না না! পরার দরকার নেই।” অধিরাজ এগিয়ে যায় খুনীর দিকে; “আর পরাপরির সিন নেই। এবার মুখোশ খোলার সিন! দেখো, চিনতে পারছ?”

বলতে বলতেই সে একটান মেরে দুর্বৃত্তের মুখঢাকা টুপিটা খুলে এনেছে। এখন দুটো টর্চের তীব্র আলোয় লোকটার মুখ স্পষ্ট। অর্ণব স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে। ঢোঁক গিলে বলল, “তারক মন্ডল! বীণা পান্ডের বাড়িওয়ালা!”

“উঁহু”। অধিরাজ মাথা নাড়ে, “এটা ওনার একমাত্র পরিচয় নয়। বরং গত কয়েক বছর ধরে ঐ পরিচয়েই আছেন। আসলে...।”

- “সুমঙ্গল পন্ডিত?” অর্ণব ওয়াইল্ড গেস করে।

“রাইট ডিয়ার! ইনি এক অর্থে সুমঙ্গল পন্ডিতও বটে। অন্তত সুকোমল পান্ডেকে নিজের নাম তাই বলেছিলেন। সুকোমল ওঁকে সুমঙ্গল পন্ডিত হিসাবে চিনলেও ওঁর আসল নাম তাও নয়।” অধিরাজ লোকটাকে গানপয়েন্টে রেখে বলে, “তার আগে ওঁকে একবার টপ টু বটম সার্চ করে নাও তো! উনি তো আবার ছুরিছোরা নিয়ে ঘোরেন।”

অর্ণব বিনাদ্বিধায় লোকটার রেইনকোট খুলে আপাদমস্তক ভালোভাবে সার্চ করল। তারপর মুখ তুলে বলল, “নো ওয়েপনস। ক্লিয়ার স্যার।”

“গ্রেট! সার্জিক্যাল সটা বাজেয়াপ্ত করো। খুলিগুলোও।” অর্ণব খুলিগুলো আর সার্জিক্যাল স’টা জড়ো করে বিরাটাকৃতি এভিডেন্স ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল, “কিন্তু ইনি কে?”

“ওঁর অনেক নাম। সব বলা মুশকিল। তবে যে নামে ওঁকে সবাই চেনে তা হল, অফিসার রথীন দাশগুপ্ত — বিখ্যাত এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট!” অর্ণবের মনে হল তার পায়ের তলা থেকে বুঝি মাটি সরে গেল! রথীন দাশগুপ্ত। কিন্তু তিনি তো...! -

"মরুক ওঁর শত্রু।" অধিরাজ খুনীর চোখে চোখ রেখে বলে।"১৯৮৭ সালের একুশে অক্টোবর যিনি মারা গিয়েছিলেন, তিনি রথীন দাশগুপ্ত নন, সুমঙ্গল পন্ডিত। হ্যাঁ, যাকে আমরা এত উঠে পড়ে খুঁজছিলাম, সেই সুমঙ্গল পন্ডিতই। তাকেও রেপ করে খুন করেছিলেন তারই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রথীন দাশগুপ্ত!"

"তুমি বুঝতে পেরেছ!" তারক মন্ডল, ওরফে রথীন দাশগুপ্ত প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন, "সেজন্যই বীণার সামনে ইচ্ছে করে শিশিরের নাম বলেছিলে! এ তো রীতিমতো মরণ ফাঁদ পেতেছ দেখছি! আমার সামনে কোনও রাস্তাই ছাড়োনি! ভুলটা আমায় করতেই হত! সুপার সে-ক্সি!" অধিরাজের ভ্রূ কুঞ্চনে পরিষ্কার বোঝা গেল যে এহেন বিশেষণ তার মোটেই পছন্দ নয়। অর্ণবের তখনও মনে হচ্ছে সামনের দু'জন নির্ঘাৎ গান্ধারী ভাষায় কথা বার্তা চালাচ্ছে!

- "বোঝোনি অর্ণব? আমি যখন বীণা পন্ডিতের সামনে শিশির সেনের নাম বললাম, তখন উনি 'বাগ'-এর মাধ্যমে শুনতে পেয়েছিলেন। এবং যখন এটা জানালাম যে আগামীকাল শিশির সেনকে নিয়ে জেরা করতে আসব, তখনই প্রমাদ গুণলেন। বীণা পন্ডিতের শিশির সেনকে ভয় পাওয়ার কারণ ছিল না। কারণ এডিজি সেন ওঁর কাছে থ্রেট নন। বরং তাঁর বাড়িওয়ালার কাছে চরম থ্রেট! বত্রিশ বছর পর চেহারায় অনেক ভাঙচুর হয়েছে। শীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে। মাথার ঢেউ খেলানো চুল উঠে গিয়ে টাক পড়েছে, ফুলো ফুলো গালও ভেঙে গিয়েছে। বত্রিশ বছর আগের মিষ্টি যুবকের আর সেই সৌন্দর্য নেই। এই রূপে ওঁকে দেখে চেনা অন্য লোকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব! কিন্তু শিশির সেন চিনবেন না, কী করে হয়! যাঁর সঙ্গে দিনরাত উঠেছেন, বসেছেন; যাকে ভাইয়ের মতো দেখতেন, যে ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে পাশে পাশে ঘুরত; সেই বিশ্বস্ত সঙ্গী শিশির সেনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না তা তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। আর পরের দিন এডিজি সেনকে নিয়ে জেরা করতে এলে মতো শুধু বীণা পন্ডিতকে নয়, তাঁর বাড়িওয়ালা মায় হয়তো প্রতিবেশীদেরও একইসঙ্গে ইন্টারোগেট করা হত! উনি কি সেটা হতে দিতে পারেন? জানতাম, শিশির সেনের সামনে দাঁড়ানোর সাহস ওঁর নেই। মরিয়া হয়ে এবার পালানোর চেষ্টা করবেনই! কিন্তু খালি হাতে কীভাবে পালাবেন?

বত্রিশ বছর ধরে যে মাথাগুলো আগলে রেখেছেন সেগুলো না নিয়ে যমরাজ তো নরকেও ফিরবেন না! উনি এত কাঁচা লোকও নন যে করোটিগুলো নিজের বাড়িতে রাখবেন। সুতরাং পালাবার আগে ওঁকে করোটিগুলো নিয়েই পালাতে হত। হাতে মাত্র চব্বিশঘণ্টা সময়। তাই গোটা সি আই ডি, হোমিসাইড গোটা কলোনিটার ওপরই লক্ষ্য রেখে বসেছিল। আর আপনিও সত্যিই মরিয়া হয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন এবং ঠিক আমার হিসেবমতোই মাথাগুলো নেওয়ার জন্যই দৌড়লেন!”

“সে রাতে আমার এক সঙ্গীকে তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ‘ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম সেক্সি?’।” অফিসার রথীন দাশগুপ্ত সেই চাপা খিক খিক হাসি হেসে বললেন, “ও গাধাটা উত্তর দেয়নি। বাট ইউ আর ড্যাম সেক্সি! স্পাইককে সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে জেরিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলে তার গোপন ডেরায়! এমনকী ন'টা মাথার ব্যাপারটাও বুঝে গিয়েছ। সত্যিই ওগুলো আমার প্রাণের চেয়েও দামি! সুপ্পা-র্ব! একেই বলে সুপারকপ!”

অধিরাজের চোখে এবার বিষণ্নতা। ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল সে, “সুপারকপ তো আপনিও ছিলেন স্যার! রথীন দাশগুপ্ত সমাজের চোখে হিরো ছিলেন!”

“হিরো?” রথীন দাশগুপ্ত প্রায় ফুঁসে উঠলেন; “হিরো নই– আমি জিরো ছিলাম! আ বিগ জিরো!”

বলতে বলতেই তাঁর চোখ লাল হয়ে ওঠে। এক দুরন্ত রাগে গলা কাঁপছে, “আমার অপরাধ আমি শৈশবে পুরুষ হয়েও মেয়েলি প্রকৃতির ছিলাম। মেয়েদের পোষাক পরতে ভালো লাগত। সেইজন্য আমার জ্যেঠু দিনের পর দিন আমায় রেপ করে গিয়েছিলেন! আমি তখন একটা কাদা মাটির তাল ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না! না এনকাউন্টার এক্সপার্ট, না সার্জিক্যাল স কিলার। অস্ত্র কাকে বলে জানতামই না! স্রেফ একটা শিশু! সেই শিশুটাকে রোজ...!”

ভদ্রলোক থেমে গেলেন। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। আর বর্ণনা করতে পারছেন না। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অধিরাজের মনে হল, জল নয়! রক্ত! যে রক্ত সবার চোখ এড়িয়ে দিনরাত ক্ষত বিক্ষত হৃদয়গুলো থেকে নিঃশব্দে চুঁইয়ে পড়ে, তেমনই বুকের শিরা ছেঁড়া রক্ত টুপ টাপ ঝরে পড়ছে অফিসার দাশগুপ্ত'র চোখ বেয়ে।

"জ্যেঠুর দাড়ি গোঁফ ছিল নিশ্চয়ই। পুলিসে কে ছিলেন?"

"বাঃ! সেটাও বুঝেছ! কে-য়া-বা-ত!" অফিসার দাশগুপ্ত'র চোখে মুগ্ধতা, "হ্যাঁ। জ্যেঠুর দাড়ি গোঁফ ছিল। সেজন্যই দাড়ি গোঁফে ঘেন্না, ভয় ধরে গিয়েছিল। দাড়ি গোঁফ সহ্যই হত না, সে মানুষের হোক কী পশুর! আমার জন্মদাতা পুলিসে ছিলেন। পরিবার আমায় ত্যাগ করেছিল। নিজের বাবা আসামের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলেন! আমি সেদিন মরেই যেতাম যদি না একজন এক্স আর্মি ম্যান আমার কান্না শুনে ওখানে এসে পৌঁছতেন! বিভাস দাশগুপ্ত । উনি বিবাহিত হলেও কোনও সন্তান ছিল না। উনি আমার প্রাণ বাঁচালেন, অ্যাডপ্ট করলেন, পরিবার দিলেন। আমি ওঁর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।" -

"তারপর কী হল? নতুন জীবন তো আপনি পেয়েছিলেন! তবে?"

"তাতে কী!" অফিসার দাশগুপ্ত ফুঁসে ওঠেন, "তোমাদের ঈশ্বর আমায় যে অভিশাপ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তার কী করব? আমিও ভালোবাসতে চেয়েছিলাম ! কৈশোরে, বয়ঃসন্ধির সময়ে, তারুণ্যে— প্রত্যেকবার ভালোবাসতে গিয়ে অপমানিত, রক্তাক্ত, লাঞ্ছিত হয়েছিলাম। কারণ আমি নারীকে নয়, পুরুষকে ভালোবাসতাম। আর্মি স্কুলে আমার ওপর কী টর্চার হয়েছিল তুমি ভাবতেও পারবে না! আমার পালক পিতা ভয় পেয়ে আমায় সাধারণ স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেখানেও আমি মেয়েলি, লাজুক ছিলাম বলে আমার ওপর পুরুষ শ্রেষ্ঠরা বুলিং করতেন।" তিনি আস্তে আস্তে চোখ মুছলেন; "তখন সুমঙ্গল আমায় বাঁচিয়েছিল। ও চিরকালই খুব ডেয়ার ডেভিল। বীণা তোমাদের মিথ্যে বলেছিল। ওর দোষ নেই। আমিই বলেছিলাম।"

"জানি। উনি উল্টোটাই বলেছিলেন। সুমঙ্গল পন্ডিতের যদি বুলিঙে ভয় থাকত, তবে উনি একজন এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের খবরি হওয়ার রিস্ক নিতেনই না। এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের সঙ্গে তার টিম থাকে। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। ব্যাক আপ থাকে। কিন্তু একজন খবরিকে খালি হাতেই লড়তে হয়। যে কোনও সময়ে খুন হয়ে যেতে পারে। তার কোনও অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। সে অকুতোভয়!" অধিরাজ মাথা নাড়ে, "বিশেষ করে যে লোকটা ইন্টারন্যাশনাল স্পাই হওয়ার কোয়ালিটি রাখে সে জানে ধরা পড়লে তার ওপর

কী পরিমাণ অত্যাচার হতে পারে। যে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় কুখ্যাত গ্যাংস্টারদের ঘাঁটিতে ঢুকতে পারে, তার চরিত্রের সঙ্গে 'ভয়' শব্দটা যায় না। এমনকী শৈশবেও নয়।"

"ড্যাম সেক্সি!" তিনি মাথা ঝাঁকালেন; "তুমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাও না কেন? ওরা তোমায় পেলে মাথায় তুলে নাচবে!"

আবার একই বিশেষণ! অধিরাজের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। তবু সে অসীম সহ্যশক্তিতে নিজের বিরক্তি চেপেই রেখে বলে, "তারপর?"

"সুমঙ্গল বাবাকে বলে দিল যে আমার ওপর বুলিং হয়। বাবা তখন একদিন আমায় ডেকে বললেন, "এসব কী শুনছি? তুমি আর্মি ম্যানের ছেলে! তোমার ওপর বুলিং কেন হবে? আত্মরক্ষা করতে শেখো।" তিনিই আমায় আর্মির লড়াইয়ের ট্রেনিং দিয়েছিলেন। এককথায় আর্মি কম্ব্যাট টেকনিক। সেলফ ডিফেন্স, অ্যাটাকিং! কিন্তু শেখালে কী হবে? আমার মানসিকতাটাই তখন এমন হয়ে গিয়েছিল যে অত্যাচারটাই নীরবে সহ্য করে নিতাম। একটা ঘুষি মারতে গেলেও বুকের পাটা লাগে। তখন আমার সেটা ছিল না।" -

তিনি একটু থামলেন। অধিরাজ নীরব। সে অফিসার দাশগুপ্তকে কনফেশনের সময় দিচ্ছে। অর্ণবও চুপ করে শুনছে। সবসময়ই ভেবে এসেছে এ লোকটাকে হাতে পেলে খুন করবে! একটু আগেও হাত নিশপিশ করছিল। কিন্তু এখন...!

"কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। হাই স্কুল অবধি আমায় বাঁচানোর জন্য সুমঙ্গল ছিল। তারপর ওর মাথায় অ্যাকটিঙের ভূত চাপল। ও চলে গেল। আমি একা হয়ে গেলাম। অসম্ভব নিরাপত্তাহীন! সবসময়ই ভয় হত, আবার বুঝি...!"

অধিরাজ নীরবে দেখল, লোকটার চোখে অনাবিল ভয়! আস্তে আস্তে কেঁপে উঠল মুখের বলিরেখাগুলো। এক্সপ্রেশন বদলে গেল। এবার ভয়ের বদলে রাগ! নিষ্ঠুর চোখ তুলে বললেন, "কলেজে ভর্তি হলাম। কিন্তু নিজেকে যতই বদলাই, স্বভাব তো বদলায় না। সেখানে এক স্যারের ওপর এমন মোহ তৈরি হল যে গোলাপ দিয়ে ভালোবাসি বলেই ফেললাম। লাল গোলাপ আমার খুব প্রিয়। গোলাপের গুচ্ছ দিয়েছিলাম। তার বদলে তিনি আমায় উলঙ্গ করে গোটা ক্যাম্পাস ঘোরালেন! সারা ক্যাম্পাসে সবাই জানল আমি...।"

বলতে বলতেই মুখ ঢেকে ফেললেন অফিসার দাশগুপ্ত। লজ্জা, ভয়ে, ঘৃণায় কাঁপছেন। অধিরাজের ইচ্ছে করল, একবার লোকটার কাঁধে হাত রাখে। কিন্তু ওঁর যা স্বভাব, তাতে হাত বাড়াতে গিয়েও সরিয়ে নিয়েছে সে।

-“ব্যস। আমিও ঠিক করলাম এই শেষ! অনেক সহ্য করেছি। আর কত! আর কত ব্যথা। আর নয়। কীসের এত ঔদ্ধত্য? কীসের গর্ব? পুরুষ বলে? তবে আমিও দেখে নেব।” তিনি বললেন, “এনাফ ইজ এনাফ। ঔদ্ধত্য শেষ করেই ছাড়ব! আমায় সারা ক্যাম্পাসের সামনে এভাবে অপমান করা! ভালোবেসে লাল গোলাপই তো দিয়েছিলাম! তার এই প্রতিদান? আমার সারা মাথায় যেন দাবানল জ্বলে উঠল। আমি রাগে পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। সেই স্যারকে এক অমাবস্যার অন্ধকার রাতে রাস্তায় পেয়ে আপ্রাণ পেটালাম! আমি মেয়েছেলে! আমি হিজড়ে! গুলাবো! এবার দ্যাখ শালা— পুরুষ কে। পুরুষ কাকে বলে আজ বোঝাচ্ছি।”

ওঁর দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, “বাবার শেখানো কম্ব্যাট টেকনিক সেদিনই প্রথম ব্যবহার করলাম। লোকটার শরীরের প্রায় সমস্ত হাড়ই ভেঙে দিয়েছিলাম। সেদিন বুঝলাম, পালটা আঘাত করতে ঠিক কতটা ভালো লাগে। রিভেঞ্জের স্বাদ কী অপূর্ব! বাবা যে কী জিনিস শিখিয়েছিলেন, সেদিন তার আসল মর্ম বুঝেছিলাম! বুঝলাম, আমি খালি হাতেও মানুষ মারতে পারি! অসম্ভব শক্তি আর তেজ ঘোড়ার মতো আমার শিরায় দৌড়াচ্ছিল। সেই উদ্ধত, গর্বিত পুরুষ আমার সামনে দাঁড়াতেই পারল না! এমনই পৌরুষ তার। যখন লোকটার হাত পা নাড়ানোর ক্ষমতাও রইল না তখন বুঝলাম, ওর হাড়ের মতো ওর সমস্ত গর্ব, ঔদ্ধত্যও ভাঙতে হবে। যেমন করে আমায় অপমান করেছিল, সারা কলেজে মুখ দেখানোর উপায় রাখেনি, তেমন ওরও মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। আমার গায়ে তখন অসুরের মতো জোর! বললে বিশ্বাস করবে না; সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম আমি ঠিক কতটা শক্তিশালী। লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে আসুরিক শক্তিতে রেপ করেছিলাম! দ্যাখ কেমন লাগে! অপমানিত হতে, রক্তাক্ত হতে কেমন লাগে! দ্যা-খ শা-লা!”

প্রচণ্ড নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে একেকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন তিনি, "লোকটা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল কারণ আমি আমার পরিবারকে ভালোবাসতাম। তাদের মুখ চেয়েই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ওঁর ওপর অ্যাটাক হওয়ার খবরটা চতুর্দিকে রটে গিয়েছিল। কিন্তু শুয়োরের বাচ্চাটা অমাবস্যার অন্ধকারে আমায় চিনতে পারেনি। বাবা আমাকে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পেরেছিলেন এটা কার কাজ। প্রমাদ গুণেছিলেন। উনি অনুভব করেছিলেন, চিরকালীন চুপচাপ, লাজুক, নম্রস্বভাবের ছেলেটার ভেতরে আরেকটা শক্তিশালী মানুষ জন্মাচ্ছে। তখন আসামেও অশান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি কলকাতায় তাঁর এক বন্ধুর কাছে আমায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে কাকু ডাকতাম। তিনিও এক্স আর্মি ম্যান। তাঁর কাছে আরও ট্রেনিং নিলাম। উনি ভালো মানুষ ছিলেন। আমার খেয়াল রাখতেন। ততদিনে আমিও টের পেয়েছি আমার ভেতরে এক প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী লোকের জন্ম হয়েছে। বাবা বলেছিলেন, অতীতকে ভুলে যেতে।

আমিও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কাকুকে বাবা সব খুলে বলেছিলেন। বাবা বুঝেছিলেন, এই শক্তি, এই রাগকে সঠিক পথে পরিচালিত করলে আমি দেবতা হব, আর ভুল পথে চালিত করলে রাক্ষস। তিনি আমায় রাক্ষস হিসাবে দেখতে চাননি। তাই আমি পড়াশোনায় মন দিলাম। কাকু আবিষ্কার করলেন, আমি খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারি। তিনি আমায় মহাকাব্য পড়তে শিখিয়েছিলেন। ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার হওয়ার তার বড় ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর্মি ম্যানের অত ধৈর্যই নেই যে বন্যজন্তুর পেছনে দৌড়বেন। বেচারি মনের দুঃখে আমায় বিভিন্ন নামজাদা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফারের ছবি দেখাতেন। আর আমিও প্রকৃতির সৌন্দর্যে ডুবলাম। কাকুই আমার হাতে ক্যামেরা ধরিয়েছিলেন।" তিনি ফিক করে হেসে ফেললেন, "ভেবে দেখো, যে হাত পরে রিভলবার আর সার্জিক্যাল স ধরবে সেই হাতই রঙ তুলি, আর ক্যামেরা ধরত!"

"পুলিসে এলেন কেন?"

দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তিনি, "আমার জন্মদাতা কী ধরনের চূড়ান্ত ন্যায়ের রক্ষক ছিলেন তা আগেই বোঝা হয়ে গিয়েছিল। যাকে গুলি করে মারা উচিত ছিল, তার কথা শুনে আমাকেই মারতে গিয়েছিলেন। পারলে দু'জনের বুকেই গোটা রিভলবার খালি করে

দিতাম। কিন্তু উপস্থিত যখন সেই রাক্ষসদের পাচ্ছি না, তখন যাদের পাওয়া যাচ্ছে তাদেরই মারব ঠিক করলাম। আমি শক্তিশালী মানুষটাকে দেবতার পথে নিয়ে গেলাম। সমাজের যত আবর্জনা আছে, যত রাক্ষস আছে সবাইকে ধরে ধরে সাফ করতে লাগলাম। এর মধ্যেই সুমঙ্গলের সঙ্গে দেখা হল। কাকু তখন মারা গিয়েছিলেন। আমার পরিবারও দাঙ্গায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার একজন সঙ্গীর দরকার ছিল। সুমঙ্গলকে আশ্রয় দিলাম। ও ওর ট্যালেন্ট কাজে লাগাল। কিন্তু মজার কথা হল, আমি খুব ফার্স্ট লার্নার। সুমঙ্গলের কাছ থেকে মেক-আপ করাটাও শিখে নিয়েছিলাম। ও দুর্দান্ত মেক আপ করতে পারত। কিন্তু আমি যেহেতু ছবি আঁকতে জানতাম, তাই রঙ ব্যবহারের টেকনিক আরও ভালো জানতাম, যার নমুনা তোমরাও গোল্ডেন স্ট্যাচু মেক আপের সময় দেখেছ। সুমঙ্গলের সাহস, বুদ্ধি, প্রতিভা আমার শক্তি ও ক্ষমতার সঙ্গে মিশল। আন্ডারওয়ার্ল্ড আমার ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। আমি সাধারণ জনগণের চোখে ঈশ্বর হয়ে উঠলাম। আর গুন্ডা-হিস্ট্রিশিটার-গ্যাংস্টারদের কাছে যম! আমার পরিবারের কেউ জীবিত ছিলেন না যার কথা ভেবে প্রাণের ভয় করব। যেটুকু পিছুটান ছিল, সেটুকুও ছিন্ন হল। আমি একদম মার্সিলেস হয়ে গেলাম।"

"তাহলে দেবতা ফের রাক্ষসে পরিণত হল কেন?" অর্ণব আর থাকতে না পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন রথীন দাশগুপ্ত। অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, "উত্তরের কিছুটা ডঃ চ্যাটার্জী আর শিশির সেন দু'জনেই দিয়েছেন অর্ণব। ডঃ চ্যাটার্জী বলেছিলেন, ডিপার্টমেন্ট যতটা 'মূর্‌খ' ভাবত এনকাউন্টার এক্সপার্টকে তিনি ততটা ছিলেন না, আর শিশির সেন বলেছিলেন ডিপার্টমেন্টের ওপরওয়ালারা তথাকথিত 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টকে' যথেষ্ট বুদ্ধিমান মনে করতেন না। ওঁকে সি আই ডি হোমিসাইড কখনও ওঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়নি।"

"ওঃ! সসসিজলিং সেক্সি!" নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন অফিসার দাশগুপ্ত, "তুমি তো আমায় সত্যিই পাগল করছ! বত্রিশ বছর আগে কোথায় ছিলে?"

অধিরাজের মধ্যে আবার বিরক্তিটা ফিরে আসে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজের ধৈর্য, স্থৈর্যকে ধরে রাখার। ফের শান্তভাবেই বলল, "বাকি কারণগুলো কী ছিল?"

“বত্রিশ বছর আগে তুমি ছিলে না, এটাই কারণ।” এবার অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে উঠলেন তিনি, “শুনেছি আমারে ভালোই লাগে না, নাই বা লাগিল তোর। / কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া/ চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া/ লোহার শিকল ডোর।”

অর্ণব বিড়বিড় করে বলে, “রাহুর প্রেম!”

– “আমার ফেভারিট কবিতা।” ফের সেই পেটেন্ট হাসিটা হাসলেন তিনি, “এখন তো হট ফেভারিট!”

“অন্য কারণগুলো কী ছিল?”

এবার একটু রূঢ়স্বরেই বলল অধিরাজ। তার রাগ দেখে ভারী মিষ্টি হাসলেন অফিসার দাশগুপ্ত। এইবার তাকে ছবির সঙ্গে মেলাতে পারল অর্ণব! লোকটা এখনও তবে এভাবে হাসতে পারে!

“প্রথমটা ঠিকই ধরেছ। দ্বিতীয় কারণটা আদি ও অনন্ত! কাম! তখন আমি দেবতা, কিন্তু এই অভিশাপ লুকোব কী করে! আমি ধরা পড়ে গিয়েছিলাম ! আমাদের হোমিসাইডের এক অফিসারের ওপর আমার দুর্বলতা ছিল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিলাম। ওর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। ও কিন্তু আমায় ‘মাথামোটা’ বলেই হাসি ঠাট্টা করত। আমার কণ্ঠস্বর সরু, সেটা নিয়েও ভ্যাঙাত। আমি চিৎকার করে বলতে চাইতাম, ভালোবাসি! কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার আমার ছিল না। কাঁহাতক সহ্য করা যায়! কাম এমনই জিনিস যে স্বয়ং দেবতারাও এর জালে পড়ে হিমশিম খেয়েছেন, আমি তো সাধারণ মানুষ!”

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “এক রাতে ভীষণ দুর্বলতার মুহূর্তে সত্যিটা প্রকাশ হয়ে গেল তার কাছে। আমি আর চাপতে পারছিলাম না নিজেকে! দু’জনে একসঙ্গে বসেই নেশা করেছিলাম। আবেগের বশে তাকে জড়িয়েই ধরলাম। ও আমার তলপেটে লাথি মেরে ঘৃণ্য জীবের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিল। অনেক নোংরা বিশেষণও দিয়েছিল বাপ মা তুলে। হুমকি দিয়েছিল, সমস্ত কথা ডিপার্টমেন্টের সবাইকে বলে দেবে!”

অর্ণব অবাক হয়ে দেখল অধিরাজের চোখে কিছু যেন চিকচিক করে উঠছে! সে নীরবে শুধু শুনছে। অধিরাজ জানে লোকটা বদ্ধ পাগল। কিন্তু উন্মাদ মানুষও তার নিজের

অবদমিত যন্ত্রণার কথা সবাইকে শোনাতে চায়। এই বিকৃতির পেছনে যে মর্মান্তিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে, তা সমস্ত নীরবতা ছিন্ন করে বাইরে আসতে চায়। এই লোকটারও একজন ধৈর্যশীল শ্রোতার প্রয়োজন আছে।

— "অথচ কীসের অভাব ছিল আমার? নিজের মুখেই বললে যে আমি সুদর্শন, আমার মতো ভালো ফটোগ্রাফার খুব কমই আছে, ভালো ছবি আঁকতে পারি, রীতিমতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শক্তিমান— শৌর্যে, বীর্যে কীসে কম! কিন্তু না! আমি কোনওদিন প্রেম পাবো না! কেন? কেন চিরদিনই আমার কামনা, বাসনাকে অবদমিত করে চলতে হবে?" অদ্ভুত ক্ষোভে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে মানুষটা, "কে-ন? কেন আমার জীবনে কেউ থাকবে না! কেন রাতের পর রাত আমায় অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে হবে। তখন যদি চাইতাম, অন্তত একশোটা মেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত আমার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য! সমাজ একজন নিষ্ঠুর এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টকে 'ম্যানলি' তকমা দেয়। কিন্তু সেই প্রেমিকের কী হবে যে পুরুষ হয়ে পুরুষকেই কামনা করে? যত গুণই থাক, ঐ একটা পরিচয়ের কাছে সর্বগুণসম্পন্ন মানুষটা হেরে যায়। কেন? কেন? সবকিছুকে ছাপিয়ে আমার একটাই পরিচয় কেন হবে যে আমি 'গে'! কেন আমায় বারবার লজ্জিত হতে হবে? লজ্জা তো তোমাদের সমাজের হওয়া উচিত, যে একটা মানুষকে একটু একটু করে জঘন্য খুনী হওয়ার পথে ঠেলে দেয়। এভিল ইজ নট বর্ন, ইটস মেড!"

অসহ্য উত্তেজনায় তার কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, "এর মধ্যেই দ্বিতীয়জন ট্রান্সফার হয়ে কলকাতা ব্রাঞ্চে এলেন। কিন্তু তাঁকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। তিনি সেই ক্রিকেট প্লেয়ার যিনি তার বন্ধুর সঙ্গে আমায় ড্রেসিংরুমের মেঝেতে ফেলে রেপ করেছিলেন। তিনি আমায় চিনতে না পারলেও আমার ইপ্সিত পুরুষের সঙ্গে তার ভালো আলাপ জমে গেল। একবার আমার সামনে দু'জনে মিলে গল্প করছিল, কার বাড়ির বাচ্চা কাজের মেয়ে সবচেয়ে গরম মাল! এরা আমায় বিকৃতকাম বলে! আমার মাথায় ফের রিভেঞ্জ নেচে উঠল। ঠিক করলাম, সমস্ত অপমানের বদলা নেব। ঐ দু'জন আমায় অপমান করেছে, গোটা ডিপার্টমেন্ট, গোটা সমাজ আমায় অপমান করেছে! ওদের কীসের গর্ব! সমস্ত গর্ব, ঔদ্ধত্য মাটিতে না মিশিয়েছি তবে আমারও নাম রথীন দাশগুপ্ত

নয়! আর ভালোবাসব না। এবার ভয় দেখাব! এমন ভয় দেখাবো যে পরের জন্মেও মনে রাখবে! স্বাভাবিকতার এত দেমাক? কে ঠিক করে দেয় যে কে স্বাভাবিক, কে অস্বাভাবিক? যে ঠিক করে তাকেও কাঁপিয়ে ছাড়ব! দেবতা হয়ে সেটা করা যায় না! দেবতাদের চরিত্র নিয়েও লোকে সমালোচনা করার সাহস পায়। কিন্তু রাক্ষস? দানব? কারোর সাধ্য আছে তাদের দিকে আঙুল তোলার?" তিনি টেনে টেনে হাসলেন, "তাদের লোকে ঘৃণা করে, ভয় পায়! কিন্তু অবজ্ঞা করতে পারে না। সমালোচনা তো নয়ই! কারোর ক্ষমতা নেই একথা বলার যে রাবণ কাপুরুষ ছিলেন!"

"রাবণ আপনার খুব প্রিয় চরিত্র, তাই না?" অদ্ভুত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকালেন অফিসার দাশগুপ্ত। স্খলিত স্বরে বললেন, "তোমায় কে বলল!" —

"আপনি শেষ ছবিটা যেটা এঁকেছেন, তার নায়ক রাবণের মতোই দশ মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পেছনের আকাশ অন্ধকার; অর্থাৎ অমাবস্যা। রাবণের গোঁফ দাড়ি নেই! অথচ থাকা উচিৎ ছিল। রাবণের বৈশিষ্ট্যই তাঁর পাকানো গোঁফ। যতই পোগোনোফোবিয়া থাকুক, রাবণ বললেই সবচেয়ে আগে তাঁর দশ মাথা আর গোঁফই আঁকবে যে কেউ! কিন্তু ছবিতে গোঁফ মিসিং! রাবণ ফাল্গুনী অমাবস্যায় মারা গিয়েছেন। কিন্তু ছবির রাবণ অমাবস্যাতেই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চিত্রকর বলতে চাইছেন যে অমাবস্যায় রাবণ মারা গিয়েছিলেন, সেই অমাবস্যাতেই এই দশ মাথাওয়ালা ব্যক্তির গ্লোরি ও ঔদ্ধত্য সবচেয়ে বেশি। ছবির দশানন আর যেই হোন, রাবণ কিছুতেই হতে পারেন না। অন্যদিকে 'সার্জিক্যাল স' কিলার বেছে বেছে ঠিক ন'টা মাথাই কেটেছে। প্রত্যেকটা খুনই অমাবস্যার রাতে। দশ নম্বরের প্রয়োজন তার ছিল না। ছবিটা যখন আঁকা হচ্ছিল, 'তখন সার্জিক্যাল স' কিলার আটটা মাথা কেটেছিল। ন'নম্বর মাথা তখনও কাটা হয়নি। চিত্রকর তবে কাকে আঁকলেন? তিনি কী করে জানলেন যে আরেক ব্যক্তি অমাবস্যার দিনই বেছে বেছে ফিরে আসবে! কী করে জানলেন যে ন'টা মাথাই কাটা পড়বে? এর একটাই উত্তর। আসলে শিল্পী অবচেতন মনে নিজেই নিজেকে এঁকেছেন। পোগোনোফোবিয়ার লোক রাবণের মুখে গোঁফ দিতে পারেন, প্রয়োজনে দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশও নিতে পারেন কারণ তিনি নিজেও জানেন যে ঐ মুখটা তার আসল মুখ নয়, কিন্তু নিজের যে রূপ তিনি আঁকছেন

তাতে গোঁফ তিনি ভুলেও দেবেন না। অথচ নিজেকে তিনি রাবণের রূপেই দেখতে চেয়েছেন। রাবণের ক্যারেক্টারে অবসেসড। তাই এরকম ছবি!"

অফিসার দাশগুপ্ত যেন শিউরে উঠলেন। কোনও কথা না বলে নির্বাক, স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে আছেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না!

"কিন্তু স্যার, রাবণ তো দশানন। উনি তো ন'টা মাথা কেটেছেন। দশ নম্বরটা কোথায়?"

অর্ণবের প্রশ্নটার উত্তর অধিরাজ রথীন দাশগুপ্তের দিক থেকে বিন্দুমাত্রও চোখ না সরিয়ে বলল, "দশ নম্বরটা ওঁর নিজের ধড়ের ওপরই আছে অর্ণব। দশ নম্বরের প্ল্যানিং আদৌ ছিল না। আমি রাবণের ছবিটা দেখেই বুঝেছি। দশটার মধ্যে একটা মাথা ওনার। বাকিগুলো হেজি। কিন্তু একটা মাথাই স্পষ্ট। সেটা ওনারই।"

এনকাউন্টার এক্সপার্ট বিহ্বল দৃষ্টিতে অপলকে অধিরাজের দিকে তাকালেন, "তুমি কে?"

অধিরাজ মৃদুস্বরে বলল, "নিজের বন্ধুকে কেন মারলেন?"

– "কারণ সুমঙ্গল সব জেনে গিয়েছিল!" রথীন দাশগুপ্ত আক্ষেপে মাথা নাড়লেন, "ওর মাধ্যমেই রফিক আসলামের স্লটার-হাউজে আমি খুন করতাম। যে খবরটা তুমি জানো না তা হল রফিকের পার্টনার ছিল সুপারি কিলার সুলেমান। আর সুলেমান হল ঐ অঞ্চলের আতঙ্ক। সুলেমানের ভয়ে কোনও সাধারণ মানুষ বত্রিশ বছর পরেও ঐ ভাঙা স্লটার-হাউজে অনুপ্রবেশ করার সাহস দেখায়নি। তখন তো প্রশ্নই উঠত না। সুমঙ্গলের বেবো ব্রিগ্যানজার সঙ্গেও কন্ট্যাক্ট ছিল। বেবোকে দিয়েই প্যাংক্যুয়োরোনিয়াম আনিয়েছিলাম। কিন্তু সুমঙ্গল সব জেনে গিয়ে আমায় ব্ল্যাকমেল করছিল। বিশ্বাসঘাতক! ওকে তো মারতেই হত। তাছাড়া ওর চেহারার গড়ন'টা হুবহু আমার মতোই ছিল। হাইট, ওয়েট ডিল-ডল পারফেক্ট।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, "আমি নিজের ফেক ডেথ ঘটাতে চেয়েছিলাম। কারণ বুঝতে পেরেছিলাম একজন সৎ পুলিসকর্মী হিসাবে, দেবতা হিসাবে, অর্থ, বাড়ি, সম্মান, পরিচয়- যা যা আর্ন করেছি তা আর আমাকে মানায় না। কারণ ? আমি তখন রাক্ষসে পরিণত হয়েছি। তাই রথীন দাশগুপ্তের মৃত্যু ঘটানো জরুরি ছিল। সুইসাইড করতে পারতাম না। ডামি খুঁজছিলাম। সুমঙ্গলকে মারার প্ল্যান ছিল না। কিন্তু যখন বন্ধুই

ব্যাকস্ট্যাব করল, তখন আমিও তার গলায় সার্জিক্যাল স বসিয়ে দিলাম। প্যাটার্ন চেঞ্জ করার উপায় ছিল না। তাই ওকেও...!”

বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি, “ওঃ সুমঙ্গল! আই মিস ইউ। আমি তোকে মারতে চাইনি! প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছি। আমি কাউকেই মারতে চাইনি! আমি তো...!”

অধিরাজ মাথা নীচু করেছে। অর্ণব নীরব। এই লোকটাকে কী বলা যায়। “শিশির কেমন আছে?”

আচমকাই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন অফিসার দাশগুপ্ত। তাঁর কণ্ঠস্বর আর্দ্র। – “বত্রিশ বছর ধরে অনুশোচনায় ভুগে চলেছেন। উনি যদি লালবাজারের সামনে থেকে না নড়তেন তবে.........।”

দু’জনকেই চমকে দিয়ে হো হো করে হেসে ওঠেন তিনি, “ও পাগলটা আর পাল্টাবে না! এতটাই বিশ্বস্ত ছিল যে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও আমায় ফলো করেছিল। রেড লাইট এরিয়া নিয়ে ওর অসম্ভব একটা ভয় ছিল। এতটাই গুড বয়, যে রেডলাইট এরিয়ার নাম শুনলেই ‘রাম রাম’ বলে পালিয়ে যেত। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ও আমার পেছন পেছন আসছে। তাই ওকে তাড়ানোর জন্য রেডলাইট এরিয়ায় ঢুকে পড়েছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! শিশির অত অর্থোডক্স হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বাঁচানোর জন্য পিছু পিছু ডেসপারেটলি রেডলাইট এরিয়ায় গিয়েছিল। ব্যাটাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছিলাম না বলে এক মহিলার ঘরে মরিয়া হয়েই ঢুকে যাই। শিশির সেটা দেখে পুরো শকড! ভাবতেই পারেনি, ওর প্রিয় স্যারের চরিত্র এমন! আমি ওখানে বসেই, মহিলাকে টাকা পয়সা দিয়ে, মেক-আপ মেরে ঠিক ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাই! কিন্তু ও চিনতেই পারেনি। তখনও বেচারা চতুর্দিকে

পাগলের মতো আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।”

“আপনি দুটো লোককে খুন করার জন্য আরও সাতটা নিষ্পাপ প্রাণ নিয়ে নিলেন! এ কেমন প্রতিশোধ স্যার?”

অধিরাজের ব্যথিত প্রশ্নের উত্তরে হিসহিসিয়ে উঠলেন অফিসার দাশগুপ্ত, “যুদ্ধে আর প্রেমে সবই চলে! এই যে দুই দেশ যুদ্ধ করে, সেনারা যুদ্ধ করে তাতে ইনোসেন্ট প্রাণ যায়

না? এনকাউন্টারে সাধারণ মানুষ মরে না? এটাও যুদ্ধ। প্রেম তো বটেই। তোমার সোসাইটি আমায় যেমনভাবে তৈরি করেছে, আমিও তাই হয়েছি। সোসাইটির বাই প্রোডাক্ট ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে তো সাধারণ মানুষকেই সহ্য করতে হবে। আমাকে কারা তৈরি করেছে? তোমার তথাকথিত 'ইনোসেন্ট' ও মূর্খ লোকের দল। মূল্য তো দিতেই হবে। ডেমোক্র্যাসির মতো একজন পারফেক্ট শয়তানও 'দ্য মনস্টার অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল।' ডামি খুঁজতে গিয়েও প্রত্যেকটা ডামি আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছে। ওদের আমি আপ্রাণ পেতে চেয়েছি- তাই বীভৎসভাবে ভালোবেসেছি! ওরা কেউ আমার হতে পারত না, অতএব আর কারোর হবে না।" লোকটার মুখে চূড়ান্ত বদমায়েশি হাসি ভেসে ওঠে, "তোমরা আমায় যেমন বানিয়েছ, আমি তেমনই হয়েছি। যেভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছ, সেভাবেই ভালোবেসেছি। কোনও অনুতাপ নেই। বরং আমি নিজের কৃতিত্বে গর্বিত। আমি লিজেন্ড। একজন সৎ পুলিস অফিসার হিসাবে, একজন দেবতা হিসাবে রথীন দাশগুপ্তই শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে সার্জিক্যাল স কিলারের চেয়ে বড় রাক্ষস আর নেই! লোকে হয় ভগবান হিসাবে শ্রেষ্ঠ হয়, নয় শয়তান হিসাবে। আমি তো দুটোতেই সেরা! চূড়ান্ত অভয়ও দিয়েছি, চরম ভয়ও দেখিয়েছি! আই অ্যাম লিজেন্ড! আই অ্যাম দ্য বেস্ট!" এতক্ষণ বেশ শান্তভাবেই সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন অফিসার রথীন দাশগুপ্ত। এবার আচমকাই তাঁর চোখদুটো অস্থির হয়ে ওঠে। মুখের রেখাগুলো ফের নড়েচড়ে উঠল। মুখের হাসিটা মিলিয়ে গিয়েছে। অর্ণব লক্ষ্য করল তাঁর চোখদুটোয় ফের সেই চূড়ান্ত নিষ্ঠুর দৃষ্টি! অবিকল মানসিক রোগীর মতো ছটফটিয়ে উঠলেন, "কিন্তু আমরা এত কথা বলছি কেন? টাইম কিলিং? ফোর্স ডেকেছ; তাই না?"

অর্ণব চমকে ওঠে। সত্যিই তাই। সে কথাবার্তার মাঝখানেই পবিত্র আচার্যকে মেসেজ করে স্লটার-হাউজে ফোর্স নিয়ে চলে আসতে বলেছে। কিন্তু লোকটা জানল কী করে!

অধিরাজ শান্তভাবেই তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, "উঁহু! একদম নড়বেন না স্যার। এই মুহূর্তে দু'দুটো রিভলবার আপনার বুকের দিকে তাক করা আছে!"

"কাপুরুষের মতোন ফাঁসিতে ঝুলব!" তিনি মাথা ঝাঁকালেন, "নেভার। তার থেকে এনকাউন্টারই ভালো। পারলে গুলি করে মারো।" অধিরাজ কোনও কথা না বাড়িয়ে দিয়ে

তার সামনে নিজের রিভলবারটা এগিয়ে ধরে, "সরি স্যার। আফটার অল, আপনি আমাদের এডিজির 'স্যার'। মুক্তিটা আপনি নিজেই নিয়ে নিন!"

"স্যারের নি-কু-চি করেছে!"

বিদ্যুৎগতিতে শূন্যে লাফিয়ে উঠল অফিসার দাশগুপ্ত'র শীর্ণ, ছোটখাটো দেহটা। হাতের টর্চটা অর্ণবের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছেন। অর্ণব সবেগে ডাক করে আকস্মিক আঘাত এড়িয়ে ফায়ার করল। কিন্তু শূন্যে ভাসা দেহটাকে স্পর্শও করল না বুলেট। ওঁর টর্চটা দেওয়ালের গায়ে সপাটে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার! ভদ্রলোক স্প্রিং এর মতো ছুঁড়ে দিয়েছেন তার ডান পা। এক মোক্ষম কিকে অধিরাজের হাতের টর্চ আর রিভলবারটা ছিটকে পড়ল! সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র! রিভলবারটা গিয়ে পড়েছে কয়েক ফুট দূরত্বে। টর্চটা সশব্দে গড়াগড়ি দিচ্ছে মেঝেতেই। আলো নিভে গিয়েছে। সেটাও ভাঙল বুঝি! শুধু তার গড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনা যায়। এখন শুধু অর্ণবের হাতে টর্চ! সেই সামান্য আলোতেই অর্ণব দেখল, ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "এত সহজ নয়!"

অধিরাজও ছাড়বার পাত্র নয়। তার হাতটা অবিকল ব্ল্যাক মাম্বার ক্ষিপ্রতায় উঠল। এবং নির্ভুল লক্ষ্যে গিয়ে ছোবল বসাল লোকটার বুকে। এনকাউন্টার এক্সপার্ট একটা কাতরোক্তি করে উঠলেন। শীর্ণ বুকের পাঁজর বুঝি ভেঙেই গেল! ! তাঁর ঠোঁটের কষ বেয়ে একফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তিনি আলতো করে আঙুলের মাথায় নিজের রক্তের রঙ দেখছেন। মোহগ্রস্তের মতো বললেন, "আই লাভ রেড! আই লাভ ইউ!"

এ তো বদ্ধ উন্মাদ! অর্ণব কী করবে বুঝতে পারছে না। এখন দু'জনেই এমন পজিশনে আছে যে ফায়ার করলে কার গায়ে লাগবে বলা মুশকিল। তার হাতের টর্চও নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করার মতো প্রয়োজনীয় আলো দিচ্ছে না। সে কিছু করার আগেই ফের অধিরাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অফিসার দাশগুপ্ত, "ছাড়বো না! ইউ আর মাইন! এখান থেকে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েই যাবো। তুমি আমার হয়েই থাকবে। জীবিত কী মৃত! আই লাভ ইউ... আই লাভ ইউ...!"

এরপর যেটা শুরু হল, সেটা দেখে অর্ণবের দম বন্ধ হয়ে আসে। অদ্ভুত এক যুদ্ধ! দু'জনের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী তা বোঝা দায়। এ যেন পাগল হাতির সঙ্গে আহত

বাঘের মরণপণ সংগ্রাম! প্রচণ্ড শক্তিতে একে অপরের ওপর আছড়ে পড়ছে। কম্ব্যাটিং টেকনিকের চূড়ান্ত নিদর্শন। রথীন কখনও অধিরাজকে মাটির ওপর ফেলে তার ওপর চড়ে বসছেন, পরক্ষণেই অধিরাজ তাকে উলটে ফেলে তার বুকের ওপর উঠে পড়ছে। কখনও অ্যাটাক, কখনও বা ব্লক। কখনও আহত হচ্ছে, কখনও ডজ করছে। দু'জনেই সমান তেজে, সমান শৌর্যে লড়ে যাচ্ছে। অধিরাজের পিস্তল হাতের কাছে নেই। রথীন দাশগুপ্তের সার্জিক্যাল স'ও অর্ণবের কাছে। কারোর হাতেই অস্ত্র নেই। অথচ কী ভয়ঙ্করভাবে লড়ছে! রেসলিঙের ইতিহাসেও এমন লড়াইয়ের উল্লেখ আছে কি না সন্দেহ! দু'জন দু'জনকে ঐ সামান্য আলোতেই মেপে নিচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে ফায়ার করলে অধিরাজেরও আহত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা! বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও অর্ণব বুঝল, এর মধ্যে গুলি চালানো অসম্ভব! বুলেটটা অফিসার দাশগুপ্তকে ভেদ না করে অধিরাজকেও ভেদ করতে পারে।

অধিরাজের লম্বা পায়ের এক লোয়ার কিক সহ্য করতে না পেরে দেওয়ালের ওপর প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়লেন অফিসার দাশগুপ্ত। মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল দেওয়ালে। মাথা ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই! তিনি মহানন্দে নিজের রক্ত নিজের গালে, ঠোঁটে মেখে নিয়ে বললেন, "আই লাভ রেড! আই লাভ ইউ!" অর্ণব বিস্ময়ে হতবাক! এ কী টাইপের শয়তান! রক্তাক্ত হচ্ছে, আহত হচ্ছে— তবু হাল ছাড়ছে না! একজন পুরুষকে অধিকার করার জন্য এ কী লড়াই! এ কী প্রেম? না পাগলামি! লোকটার ঐ শীর্ণ দেহে এখনও এত শক্তি যে অধিরাজের মতো শক্তিশালী যুবকের সঙ্গে সমানে সমানে লড়ছে!

ভদ্রলোক আচমকা বসে পড়ে সপাটে তার পা চালালেন অধিরাজের পা লক্ষ্য করে। অ্যাটাকটা সামলাতে না পেরে অধিরাজ মেঝের ওপরই দড়াম করে চিৎ হয়ে পড়ল। শিকারী বাজের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন অফিসার দাশগুপ্ত। মেঝের ওপরেই তাকে ঠেসে ধরে শার্ট ধরে সজোরে একটান! তার গায়ে এত শক্তি যে বোতামগুলো সব ছিঁড়ে গিয়েছে! অধিরাজ আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে উলটে ফেলার। কিন্তু এমন টেকনিকে তাকে চেপে ধরেছেন, যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। রথীন দাশগুপ্ত তার দুটো হাত

চেপে ধরেছেন। পায়ের ওপর হাঁটু ভাঁজ করে এমনভাবে চেপে ধরে আছেন যে পা ভাঁজ করতেই পারছে না! অসহায়ের মতো ছটফট করছে, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না!

"কাম অন ডার্লিং! তুমি তো একদম বাচ্চাছেলের মতো ভয় পাচ্ছ! তোমাকে আমার আগে কেউ কি আদর করেনি কখনও? আমি অনেক পুরুষকেই ভালোবেসেছি। কিন্তু তারা তোমার নখের যোগ্যও ছিল না।" তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "তোমার মতো এমন অসহ্য সুন্দর পুরুষ আমি জীবনেও দেখিনি! যৌবন আর সৌন্দর্যের শিখরে থাকা বাঘ তুমি! যেদিন তোমাকে পুরোপুরি দেখেছিলাম, তারপর থেকে একটা রাতও ঘুমোতে পারিনি, বিলিভ মি। আর তোমার বুদ্ধি! সেও অতুলনীয়! তুমিই আমার দেখা শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তোমার মতো এমন করে আমার মনের ভেতরে কেউ ঢুকতে পারেনি। তুমি আমার থেকেও বেশি বুদ্ধিমান। প্লিজ, এমন দুষ্টুমি কোর না। আমি তোমায় ভালোবাসি। আমায় ভালোবাসতে দাও।" বলতে বলতেই তার বুকে পেটে এলপাথাড়ি চুমু খেতে শুরু করেছেন। অধিরাজের মনে হল তার গায়ে কেউ অ্যাসিড ঢালছে। সে আর সহ্য করতে না পেরে একটা জোরালো মোচড় দিয়ে একটা হাতকে কোনওমতে মুক্ত করেছে। লোকটাকে বিন্দুমাত্রও সুযোগ না দিয়ে তাঁর দুই চোখের ওপরে স্পর্শকাতর নরম জায়গায় আঙুল দিয়ে আঘাত করল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষ ছেড়ে দিতেই সে এক ঘুষিতে তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে উঠে বসে ঠিক তখনই প্রচণ্ড ফায়ারিঙের আওয়াজ! অর্ণব অধিরাজের ওপরে রথীন দাশগুপ্তকে চেপে বসতে দেখেই বুঝেছিল যে এই সুবর্ণ সুযোগ! আর বিন্দুমাত্র ভাবনা চিন্তা না করে ফায়ার করেছিল। কিন্তু তার আগেই অধিরাজ তাকে ফ্ল্যাট করে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে বসেছে। গুলিটা তার কাঁধের চামড়া চিরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। অধিরাজ কাতরে উঠল, "আঃ! অর্ণব! ডোন্ট শ্যুট!"

- "তুমি শুনবে না! কিছুতেই শুনবে না তাই না?" লোকটা উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকায়। হাল্কা টর্চের আলোয় তার চোখে পড়ল ঘরের এক অন্ধকার কোণে একটা লোহার রড রাখা আছে। সম্ভবত ওটা দিয়েই পেটানো হত প্রাণীগুলোকে। সে প্রচণ্ড প্রতিশোধ স্পৃহায় রডটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয় অধিরাজের কাঁধ লক্ষ্য করে। অর্ণব সভয়ে দেখল; ভয়ঙ্কর শক্তিতে নেমে আসছে লোহার রডের মার। এক ঘায়ে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে!

অধিরাজ গুলির ধাক্কাটায় এখন কিছুটা অবিন্যস্ত এবং হতচকিত! সে প্রস্তুত নয়...! “স্যা-র!” —

অর্ণব অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই লাফিয়ে পড়ল অধিরাজের ওপরে। লোহার রড সর্বশক্তিতে আছড়ে পড়ল ঠিকই। তবে ভুল লক্ষ্যে! অধিরাজের কাঁধের বদলে অর্ণবের মাথার পেছনে! বোধহয় চুরমার করেই দিল তার মাথার খুলি। অধিরাজ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, সেই এক বিধ্বংসী মারে লুটিয়ে পড়েছে অর্ণব। সাদা টাইলসের মেঝে লাল হয়ে উঠল তাজা রক্তে। অর্ণব সেই যে পড়ল, আর নড়ল না! সে একদম নিস্পন্দ, নিথর।

“অর্ণব!”

ফিসফিস করে তার নাম উচ্চারণ করল অধিরাজ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো সেদিকেই তাকিয়ে আছে সে। অর্ণবের মাথা থেকে গলগলিয়ে রক্ত পড়ছে। একদম প্রাণহীন তার দেহ! টাইলসের ওপর দিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। জড়বুদ্ধির মতো সেদিকেই তাকিয়ে থেকে অস্ফুটে বলল, “কী হল! হ্যাঁ? মেরে ফেলল!”

“বেশ করেছি।”

এরকম অপ্রত্যাশিত আঘাতে অধিরাজ যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। যেন বুঝে উঠতেই পারছে না যে কী হয়ে গেল! সেই সুযোগেই তাকে একরকম হিড়হিড় করেই টেনে এককোণে সরিয়ে নিয়ে গেল দুর্বৃত্ত। অধিরাজ অসাড় এক মানুষের মতো তখনও অর্ণবের ভূলুণ্ঠিত দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মস্তিষ্ক কাজ করছে না। আবার ফিসফিস করেই বলল, “কী হল? অর্ণব।”

“মেরে ফেলেছি। আপদ একটা! সবসময়ই মাঝখানে এসে পড়ে। আগেই মারা উচিত ছিল! এখন মরেছে। বাঁচা গেছে!”

বলতে বলতেই অফিসার রথীন দাশগুপ্ত তাকে মেঝের ওপরেই চিত করে ফেলেছেন। অধিরাজ এবার আর বাধা দেওয়ার কোনওরকম চেষ্টা করলই না। যেন প্রাণহীন পুতুল একটা! সম্পূর্ণ অবশ, অসাড় ও বাহ্যজ্ঞানহীন! অফিসার দাশগুপ্ত এবার নির্দ্বিধায় তাকে জবর দখল করলেন।

"ওদিকে নয়!"

অধিরাজ তখনও বিমূঢ় দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকেই তাকিয়ে আছে। তার মুখটা জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন তিনি, "আমায় দেখো। প্লিজ! আমার কথা শোনো। আমি তোমায় ভালোবাসি । ভীষণ ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। এমন করে আমি আর কখনও কাউকে চাইনি! তোমায় না পেলে পাগল হয়ে যাবো। আমার প্রেম গ্রহণ করো। কথা দিচ্ছি, আর কাউকে মারব না। শুধু তুমি আমার হও!"

অধিরাজ নির্বাক। এখনও তার মস্তিষ্ক সাড়া দিচ্ছে না। চোখ অভিব্যক্তিহীন। দৃষ্টি শূন্য! ওদিকে আরেকটা মানুষ তাকে আদরে আদরে অতিষ্ঠ করছে! প্রচণ্ড রিরংসায় আঁচড়ে, কামড়ে একসা করছে। পরনের শার্টটা খুলে নিয়ে অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গে এলোপাথাড়ি চুমু খেয়ে জাগিয়ে তুলতে চাইছে পুরুষের কামনা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করছে। দুই নির্লজ্জ হাত দস্যুর মতো নিষ্পাপ কৌমার্যের লজ্জা, কুণ্ঠা ভেঙে চুরে ফেলছে। কিন্তু অধিরাজের যেন কোনওদিকে কোনও খেয়ালই নেই! সে পুতুলের মতোই পড়ে আছে। তার মস্তিষ্কের মধ্যে অদ্ভুত এক নীরবতা! খাঁ খাঁ শূন্যতা! এক রাক্ষস তার নিষ্প্রাণ, শীতল শরীরটাকে দলিত মথিত করছে! একে একে কেড়ে নিচ্ছে সব আবরণ। তাও যেন টের পাচ্ছে না সে। তার চোখের সামনে শুধু অন্ধকার! অন্ধকার, নীরবতা! আর কিছু নেই! দুনিয়ার কোথাও আর কিচ্ছু নেই!

লোকটা ফের তার পা থেকে চুমু খেতে খেতে উঠে এল ওপরে। দুর্বৃত্ত ক্রমাগতই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাকে অনিন্দ্যসুন্দর দেহটা ক্রমাগতই কামার্ত, পাগল করে তুলছে। কী করে একটা লোক এরকম আশিরনখ নিখুঁত হতে পারে! আগুন! আগুন! সে অধিরাজের ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে তার সমস্ত সত্ত্বাকে শুষে নিতে চায়। শ্বাসরোধকারী এক দীর্ঘ চুম্বনে তাকে পুরোপুরি গ্রাস করতে চাইছে। অধিরাজের দমবন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু প্রতিরোধ করার শক্তিটুকুও যেন তার নেই। শ্বাস নিতে পারছে না, কারণ লোকটা তাকে মুক্তিই দিচ্ছে না।

সে চোখ বুজল। বন্ধ চোখের কোণ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ছে। মনে মনে উচ্চারণ করল একটাই শব্দ— অর্ণব...! পরমুহূর্তেই ফায়ারিঙের কান ফাটানো শব্দে

কেঁপে উঠল গোটা স্লটার-হাউজ! একটা নয়, দুটো নয়, পুরো ছটা! ছ'বার ফায়ারিং!

বালির বস্তার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে অফিসার রথীন দাশগুপ্তের দেহ!

তাঁর পরনের শার্ট তাঁরই প্রিয় লাল রঙের রক্তে ভিজে গেল। কোনও শব্দ উচ্চারণ করার আগেই পুরো ছ'টা বুলেট তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে গেল। যেদিকে তিনি অধিরাজকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, লক্ষ্যই করেননি যে ঠিক সেদিকেই পড়ে আছে অধিরাজের রিভলবারটা। অন্ধকারে অত ভালোভাবে দেখা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু অধিরাজ তার বিশ্বস্ত সঙ্গীকে চিনে নিতে ভুল করেনি। একটু হাত বাড়াতেই নাগালে এসে গিয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র!

ধুরন্ধর ঠান্ডা মাথার নিষ্ঠুর খুনী ভাবতেও পারেনি, তার থেকেও ঠান্ডা মাথায়, নিষ্ঠুরতম কেউ তাকেই খুন করে দিতে পারে। চুম্বনরত অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

কয়েকমুহূর্তের স্থিরতা। তারপরেই এক প্রচণ্ড পদাঘাতে অধিরাজের ওপর থেকে ছিটকে সরে গেলেন রথীন দাশগুপ্ত। টলতে টলতে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায় অধিরাজ। অর্ণব তখনও একইরকম নিথর হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার টর্চটা তখনও জ্বলছে। সে একটা প্রাণহীন মেশিনের মতো যান্ত্রিকভাবে এগিয়ে গেল অর্ণবের দিকেই। অর্ণবের হাতে তখনও রিভলবার ধরা। অধিরাজ তার রিভলবারটা তুলে নিয়ে চেক করল। ছ'টা গুলিই আছে। তার মানে অর্ণব রি-লোড করেছিল! সে এবার রথীন দাশগুপ্তের দেহ টার্গেট করেছে। আবার মুহুর্মুহু ফায়ারিং! এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ...! একের পর এক! যেন কিছুতেই সন্তুষ্টি নেই। লোকটার মৃত্যু অনেক আগেই হয়েছিল! এখন মৃতদেহটাকে ঝাঁঝরা করে না দেওয়া অবধি শান্তি হচ্ছে না!

লাশটাকে যত আঘাত দেওয়া সম্ভব ছিল, ততগুলোই বুলেট ভরে দিয়ে থামল অধিরাজ। এখন শুধু একটা বুলেটই বাকি। তারপরই মুক্তি। আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র! সব অপমান, সব যন্ত্রণার শেষ হবে আরেকটা ফায়ারিং এর সঙ্গে সঙ্গেই।

সে অবিকল একটা রোবটের মতো নিজের কপালে রিভলবারটা ঠেকাল তার আঙুল নির্দ্বিধায় স্পর্শ করল ট্রিগার। মুখের একটা রেখাও নড়ছে না, চড়ছে না। সম্পূর্ণ

অভিব্যক্তিহীন। দেখলে মনে হয় – প্রাণহীন কোনও জড়বস্তু! চোখের পলক পড়ছে না। মাছের মতো নিষ্পলক তার চাহনি। চিবুক দৃঢ়বদ্ধ।

"রা-জা!"

ট্রিগারে চাপ দেওয়ার আগেই একটা আলোর ঝিলিক। একজন মানুষ তীব্র বেগে লাফ মেরে ছুটে এসে তার হাতটা মুহূর্তের ভগ্নাংশে জোর করে ধরে ঘুরিয়ে দিল। গুলিটা সশব্দে প্রাচীন স্লটার-হাউজের দেওয়ালে বিদ্ধ হয়ে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসের মতো একরাশ প্লাস্টার খসিয়ে দিল।

অধিরাজকে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পবিত্র আচার্য, "কী করতে যাচ্ছিলে! পাগল হয়ে গেছ? মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?"

পবিত্র'র পিছন পিছন ফোর্সও দৌড়ে আসছে। মিস আত্রেয়ী দত্ত গোটা দৃশ্যটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! স্লটার-হাউজের রক্তাক্ত মেঝেতে দুটো লোক পড়ে রয়েছে! যে মানুষটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পরনে শুধু একটা ছিন্নভিন্ন ট্রাউজার! ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের মতো দেহে চাপ চাপ রক্ত! কাঁধ, কপাল, ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে! চোখ স্থির! যে লোকদুটো মাটিতে পড়ে রয়েছে তাদের থেকেও বেশি প্রাণহীন অধিরাজ! কার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কে জানে! সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন, নির্বাক চোখ! অন্ধের মতো দৃষ্টি! এমনকী নিঃশ্বাসও পড়ছে না। সম্মোহিত মানুষের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

"এ কী! অর্ণব!" - ডঃ চ্যাটার্জী প্রায় দৌড়েই গেলেন অর্ণবের দিকে। তাকে ব্যাকুলভাবে পরীক্ষা করছেন। ঘাড়ের নীচে, নাকের নীচে হাত রেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেঁচে আছে। বেঁচে আছে!... নিঃশ্বাস পড়ছে!" এই প্রথম বোধহয় কোনও শব্দ অধিরাজের কানে গেল। চোখের সামনে থেকে অন্ধকার একটু সরল। সে দেখল অর্ণবের ওপর ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করছেন ডঃ চ্যাটার্জী, "অর্ণব! কিপ ব্রিদিং! কিচ্ছু হবে না। মেডিক্যাল টিমকে ডাকো...!"

ডঃ চ্যাটার্জীর শব্দগুলো মস্তিষ্কে ধাক্কা মারল। অধিরাজের চোখের শূন্যতা কেটে গিয়েছে। সে একটা শ্বাস টানে। এই প্রথম চোখের পলকও পড়ল। স্খলিত হাত থেকে সশব্দে খসে পড়ে খালি রিভলবারটা।

"রাজা!"

পরমুহূর্তেই সেও বেসামাল হয়ে টলে পড়ল! যেন প্রবল ঝড়ে শিকড় উপড়ে যাওয়া বটগাছ! পবিত্র ধরে না ফেললে মাটিতেই পড়ে যেত। অর্ণবকে বাকি অফিসারদের হাতে তুলে দিয়ে এদিকেই ছুটে এলেন ডঃ চ্যাটার্জী। দেখলেন, পবিত্রের শক্তিশালী দুই হাতের মধ্যে ঝুলছে অধিরাজ! রক্তাক্ত, ক্লান্ত, শক্তিহীন ও চেতনাহীন! তার ইস্পাতের মতো স্নায়ু, লৌহকঠিন সহ্যশক্তিও শেষপর্যন্ত জবাব দিল!

(২৬)

বত্রিশ বছর পর ‘সার্জিক্যাল স’ কিলারের কেস ফাইল ফাইনালি ক্লোজড হল। সুপ্রিম কোর্ট সুকোমল পান্ডেকে অনেক দুঃখ প্রকাশ করে বেকসুর খালাস দিয়েছে। যে ভয়ঙ্কর খুনীর তান্ডবে গোটা শহর বত্রিশ বছর আগে কেঁপেছিল, এবং বর্তমানেও তাকে ‘মূর্তিমান বিভীষিকা’ আখ্যা দিয়েছিল, সেই অভিশাপের ছায়া শেষপর্যন্ত মুছে গেল কলকাতার বুক থেকে। হোমিসাইডের জয়জয়কার মিডিয়ায়। বিশেষ করে যে অফিসার শেষপর্যন্ত বাজি মাত করলেন, তাকেই হিরো বানিয়ে মাথায় করে নাচছে মিডিয়া। আই জি, সি আই ডি, হোমিসাইড, অধিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন যে কোনও নারীর স্বপ্নের পুরুষ, যে কোনও মানুষের কাছে ‘নায়ক’। চ্যানেলে চ্যানেলে তারই বিভিন্ন সময়ের ভিডিও ফুটেজ চলছে। খবরের কাগজের হেডলাইনে তারই নাম। বাড়ি ভরে উঠেছে ফুলের বোকেতে। ফ্যান মেইলস আর প্রেমপত্রের আঘাতে হিমশিম খাচ্ছে সি আই ডি হোমিসাইড আর অধিরাজের পরিবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মিডিয়া অনেক চেষ্টা করেও তার বাইট নিতে পারেনি। কারণ অধিরাজ মিডিয়ার সামনে আসছেই না। এমনিতেও সে বিশেষ মিড়িয়া ‘ডার্লিং’ নয়। সাংবাদিকদের জন্য তার একটাই উত্তর রেডি করা; ‘নো কমেন্টস'। কিন্তু এখন সেটুকু দেখাও পাওয়া যাচ্ছে না! মিডিয়া প্রায় পাপারাৎজির মতো তার বাড়ির সামনে ওঁৎ পেতে বসে আছে। যদি কয়েক সেকেন্ডের ফুটেজও পাওয়া যায়!

অধিরাজ ব্যানার্জির একঝলকও এই মুহূর্তে চ্যানেলওয়ালাদের কাছে মূল্যবান। আপাতত মিডিয়াকে ফেস করছেন এডিজি শিশির সেন। তিনিই জানিয়েছেন ‘সার্জিক্যাল স’ কিলারের নাম ‘তারক মন্ডল’। বত্রিশ বছর আগে এই মৃত্যুযজ্ঞ শুরু করে ফেরার হয়ে গিয়েছিলেন। সি আই ডি, হোমিসাইড খোঁজ করে জেনেছে যে তিনি দক্ষিণ ভারতে অন্য পরিচয়ে থাকতেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে একটি কফি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। পরে নিজের ছোটখাটো বিজনেস শুরু করেন। নাগাল্যান্ড এমনকি শ্রীলঙ্কায়ও বেশ কিছুদিন ছিলেন। দশ বছর আগে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। পার্কসার্কাসের স্লটার-হাউজটাতেই চলত তার এই নরমেধ যজ্ঞ। স্লটার-হাউজটাকে ভাঙচুর করে মাটির

তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে রফিক আসলামের কঙ্কাল। তাকেও খুন করে স্লটার-হাউজের মেঝে খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছিল খুনী। সেই ভাড়া করা অ্যাকটর-অ্যাকট্রেসকেও আলিপুর থানার ফুটেজ দেখে গ্রেফতার করেছে সি আই ডি। তারা পালিয়ে গেলেও খবরি নেটওয়ার্ক তাদের খুঁজে বের করল। তারা স্বীকার করেছে যে অধিরাজ ব্যানার্জির ফটো দেখিয়ে তাকে স্টক করতে বলেছিল তারক মন্ডল। তারাও তার অজান্তেই তাকে ফলো করত। টাকার বিনিময়ে পেনটাকে রিপ্লেস করেছিল তারাই। বীণা পন্ডিতও স্বীকার করেছেন যে তারক মন্ডল তথা অফিসার দাশগুপ্তের কথাতেই তিনি মিথ্যে বলেছিলেন। সাউথ ইন্ডিয়া এবং শ্রীলঙ্কায় থাকার ফলে তিনি এতটাই ট্যানড হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর চেহারা এতটাই পরিবর্তিত হয়েছিল যে প্রথমে বীণাও তাঁকে চিনতে পারেননি। কিন্তু পরে চিনতে পেরেছিলেন। অফিসার দাশগুপ্ত তাঁকে বলেছিলেন যে বত্রিশ বছর আগে সুমঙ্গল একটি কাজে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁর প্রাণও বিপন্ন। তাই নিজের মৃত্যুর নাটক করেছেন ও অন্য পরিচয়ে আছেন। বীণা জানতেন অফিসার দাশগুপ্ত ও সুমঙ্গল গ্যাংস্টারদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। তাই সরল মনে তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলেন। অফিসার দাশগুপ্তের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞও ছিলেন।

সেজন্যই তাঁর কথামতোই বয়ান দিয়েছিলেন।

মৃত ব্যক্তি, তথা 'সার্জিক্যাল স' কিলারের আসল পরিচয় গোপনই রেখেছেন এডিজি সেন। লোকটার লাশ দেখেই মাথায় প্রায় বাজ পড়েছিল তাঁর। চোখ বুজে ফেলেছিলেন তিনি। তীব্র শকে বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা কাউকে কিছু বলেননি।

শেষপর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ডঃ চ্যাটার্জীকে বলেছিলেন, "আমার সন্দেহই ঠিক ছিল! বত্রিশ বছর ধরে এই পাথর বুকে বয়ে আসছি আমি! কাউকে বলতে পারিনি! দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এটাই বাস্তব। বরং নিজের স্যারকে সন্দেহ করছি বলে নিজেকেই সহস্রবার মনে মনে চাবুক মেরেছি! অনুতাপে দগ্ধ হয়েছি। ওঃ।"

ডঃ চ্যাটার্জী জানতে চান, "কিন্তু আপনিই তো আইডেন্টিফাই করেছিলেন স্যার।"

"উপায় কী? পোষাক থেকে শুরু করে সব এক ছিল। এমনকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট পর্যন্ত মিলে গিয়েছিল। আর আপনি জানেন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিথ্যে কথা বলে না।"

"ঠিক। তবে সন্দেহ কেন হয়েছিল?"

শিশির সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওঁর লাশের রিং ফিঙ্গারে একটা আংটির ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। স্যার কখনও আংটি পরতেন না। কিন্তু লাশের হাতে একটা আংটির ছাপ ছিল। তখনই মনে হয়েছিল— এটা স্যার নন। কিন্তু তিনিই যে আসল খুনী তা ভাবতেও পারিনি! তিনি যে রেডলাইট এরিয়ায় যেতেন তা আবিষ্কার করেই শকড় ছিলাম। সেদিন গোটা চত্ত্বর আকাশ পাতাল খুঁজেও বের করতে পারিনি। তিনি যে কোথায় গেলেন, ভেবে ভেবে পাগল হয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত তাঁর কথামতো যখন লালবাজারের সামনে পৌঁছলাম ততক্ষণে সব শেষ! সারাজীবন অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে মরেছি! বারবার ভেবেছি, যদি আমি ওঁর আদেশ অমান্য না করতাম...! কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আমি ওখানে থাকলেও কিচ্ছু বদলাত না! ব্যানার্জীর কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। ও আমায় বাঁচিয়েছে।"

"কিন্তু আপনি যে ওকে মেরে ফেললেন স্যার!" ডঃ চ্যাটার্জী আস্তে আস্তে বললেন, "আপনার দুই অফিসারের একজন হসপিটালে ভর্তি। আরেকজন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! অর্ণবের মাথার জখম ততটা মারাত্মক নয়। অনেকগুলো স্টিচ পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেরে উঠবে। কিন্তু রাজার কী হবে স্যার? ওর অবস্থা দেখেছেন আপনি? পাগল হতে বাকি আছে! ওর মতো একজন মানুষকে বকরাক্ষসের সামনে ঠেলে দেওয়া জরুরি ছিল? এটা কেস নয়, টর্চার স্যার! আর সেই টর্চারের এফেক্ট রাজার ওপর ট্রিমেন্ডাসলি পড়েছে।" -

"আই অ্যাম সরি।" কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে নীরব হয়ে থেকে উত্তর দিলেন এডিজি শিশির সেন, "কিন্তু আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে ব্যানার্জি ছাড়া অন্য কেউ কেসটাকে এভাবে ক্র্যাক করতে পারত? ক্র্যাক তো দূর, এই টেনশনটাকে, মলেস্টেশনকে সহ্য করে লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা আর কারোর আছে? ব্যানার্জি বলেই পেরেছে। অন্য কেউ হলে আগেই মরে যেত। বকাসুরকে থামানোর ক্যালিবার একমাত্র ওরই ছিল।"

বাস্তব ঘটনা। এই কথার কী উত্তর দিতেন ডঃ চ্যাটার্জী! তিনি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "ওদের দু'জনকে দেখেছেন আপনি?"

এবার একটু বিব্রত হয়েই মাথা নাড়লেন এডিজি সেন, "হ্যাঁ। অর্ণবকে বেটার দেখলাম। কিন্তু...!"

বলতে বলতেই থেমে গেলেন তিনি। মনে পড়ল অধিরাজের অবস্থাটা। পরের দিনই নিজেই গিয়েছিলেন ওর বাড়ি। অধিরাজের মা'কে দু'হাত জোড় করে বলেছিলেন, "আপনি রত্নগর্ভা।" অধিরাজের মা খুব শান্তস্বরেই প্রতি নমস্কার করেন, "আসুন। আপনার অফিসারের সঙ্গে দেখা করে যান।"

অধিরাজের বেডরুম তখন প্রায় অন্ধকার। খুব স্তিমিত আলো জ্বলছে। তার মধ্যেই বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, অধিরাজ নির্জীবের মতো পড়ে আছে। খুব নীচু গলায় কিছু যেন বিড়বিড়ও করছে। তাকে দেখেই মনে হয় জীবনীশক্তির প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে।

- "এ কী! কী হয়েছে?"

অধিরাজের মা প্রশ্নটার কোনও উত্তর দেননি। নীরবেই ছেলের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। শিশির সেন এবার এগিয়ে গিয়ে নিজের তরুণ তুর্কীটির কপালে হাত রেখেছিলেন।

তাঁর হাত যেন সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে গিয়েছিল। তার চেয়েও মারাত্মক ছিল অধিরাজের প্রতিক্রিয়া! সে প্রায় লাফ মেরে উঠে বসেছিল, "কে! কে!" "ব্যানার্জি। আমি!"

এডিজি আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন তার দিকে। কিন্তু অধিরাজ ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে সরে গিয়েছিল দেওয়ালের দিকে। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, "আমায় ছোঁবে না! ...চলে যাও!"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন এডিজি সেন। এ কি তার পরিচিত অফিসার অধিরাজ ব্যানার্জি! না একটা ভয়ার্ত শিশু! সে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সিঁটিয়ে বসেছিল। পারলে যেন দেওয়ালের সঙ্গেই মিশে যায়! ব্ল্যাঙ্কেটটা টেনে নিয়ে নিজের আপাদমস্তক ঢেকে বলেছিল, "আমার শীত করছে... শীত করছে!"

শিশির সেন কীভাবে যে নিজেকে সামলেছিলেন তা তিনিই জানেন। আর কোনও কথা বলতে পারেননি। ফেরার আগে অধিরাজের মা হাতজোড় করে বলেছিলেন, "প্লিজ স্যার, আমাদের এই একটা মাত্রই সন্তান। ছেলেটাকে এবার রেহাই দিন। আগের কেসে গুলি খেয়ে মরতে মরতে বেঁচেছে। এবার কী অবস্থা আপনিই স্বচক্ষে দেখে গেলেন। ও যদি না থাকে তবে আমাদের কী হবে? ওর বাবার প্রাণ এই ছেলে। অথচ তিনিও ওর ধারে কাছে যেতে পারছেন না! ও এরকমই করছে! কিচ্ছু খাচ্ছে না, সারা রাত ঘুমোচ্ছে না! কারোর ছায়া দেখলেই ভয় পাচ্ছে। একমাত্র আমিই ওর কাছে যেতে পারছি। আর কেউ না। অফিসার পবিত্র আচার্যকে ফ্লাওয়ার ভাস ছুঁড়ে মেরেছিল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতেই দিচ্ছে না! এমন কেস ওকে দেবেন না যাতে ও নিজেই...!"

আফসোসে, দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল শিশির সেনের। এর চেয়ে যদি অধিরাজের বাবা-মা তাকে কষিয়ে দুটো থাপ্পড়ও মারতেন, তবে হয়তো এত কষ্ট হত না। আক্ষেপে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে আসে। ক্ষমা প্রার্থনার মুখও নেই।

তিনি অসহায়ের মতো ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকালেন, "আপনি কিছু করতে পারেন না?"

"ভাবছি।" ডঃ চ্যাটার্জী একটু ধীর স্বরে বলেন, "যতক্ষণ না জ্বরটা নামছে, ততক্ষণ কিছু করা মুশকিল। ওর এখন কেয়ার, ঘুম আর রেস্ট দরকার স্যার। ছেলেটা ফাইটার। কাটিয়ে উঠবে ঠিকই। তবে হয়তো সময় লাগবে।" -

"কী লাগবে শুধু বলুন। যত বড় ডাক্তার লাগুক, যা মেডিসিন লাগুক আই ডোন্ট কেয়ার! কিন্তু আমি আমার বেস্ট অফিসারদের ফেরত চাই, ইন এনি কস্ট।" -

ফরেনসিক এক্সপার্ট বিষণ্ন হাসলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিনই বিকেলে আহেলি আর মিস দত্তকে নিয়ে ডঃ চ্যাটার্জী হাজির হলেন অধিরাজের বাড়িতে। পথে যেতে যেতেই দু'জনকেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কী করতে হবে। বলেছিলেন, "রাজা ছেলেদের দেখলেই মারতে যাচ্ছে। কিন্তু ওর ভেতরে এখনও সেই চিরপরিচিত ভদ্রলোকটা রয়েছে যে মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না। নয়তো ওর মা ওর কাছে যেতে পারতেন না! একটা লোক যদি না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ধুম জ্বর গায়ে নিয়ে বসে থাকে, তবে সে এমনিতেই

মরে যাবে বা পাগল হয়ে যাবে। আর এ ঠান্ডা লাগা জ্বর নয়। মেন্টাল স্ট্রেস আর ট্রমা থেকেই জ্বরটা ট্রিগার করেছে। অতএব মেডিকেশন আর রেস্ট না পেলে কমবে না। ও আরেকটু হলেই সুইসাইড করত, যদি না পবিত্র ঠিক সময়ে লাফিয়ে পড়ে বন্দুকটা সরিয়ে দিত। লোকটা পুরো খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ণবকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল। কিন্তু সে-ও হসপিটালাইজড্। এখন সবটাই তোমাদের ওপরে নির্ভর করে যে তোমরা কী করবে।"

আহেলি কোনও কথা না বলে নীরবে মাথা নাড়ে। আত্রেয়ী আহেলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তার অবস্থাও খারাপ। অধিরাজের বেডরুমের সামনে দাঁড়িয়ে নীচু স্বরে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী, "তোমরা ঢুকে যাও। আমি গেলেই তেড়ে আসবে। ও কাউকে চিনতে পারছে না। তবে মেল, ফিমেলের পার্থক্যটা নিশ্চয়ই বুঝবে। গো অ্যাহেড।"

আহেলি আর আত্রেয়ী খুব সন্তর্পণে ঢুকে গিয়েছিল অধিরাজের বেডরুমে। ঘরে ঢুকে দেখল অধিরাজ তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে। ওদের দেখেই ভয়ার্ত স্বরে বলল, "কে! চলে যাও! কাছে আসবে না!"

আহেলি যেন একেবারে হৃদয় থেকে ডাকল, "অফিসার ব্যানার্জি, আমি! মিস্ মুখার্জী।"

নারী কণ্ঠস্বর শুনে এবার সে যেন একটু আশ্বস্ত হল। কিন্তু কিছু বলল না। শুধু বিড়বিড় করে বলল, "শীত করছে... বড় শীত করছে... আমার শীত করছে...!"....

আহেলি আস্তে আস্তে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল তার দিকে। অধিরাজ বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। কিন্তু আক্রমণ করার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সে যেন আরও একটু ঠেসে গুটিশুটি মেরে বসল।

"এটা আমি। আহেলি মুখার্জী। চিনতে পারছেন না?"

অধিরাজ কোনও কথা বলল না। কিন্তু তার দৃষ্টিতে কোনও পরিচিতির ছাপ পড়েনি। আত্রেয়ীর মনে হল, এ দৃষ্টি কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষেরই নয়। কোনও বিপন্ন শিশুর, যে নিজেকে ঠিকমতো প্রকাশ করতেও শেখেনি! অধিরাজ আবার একই কথা বলল, "শীত করছে!"

আহেলি নিজের গায়ের শালটা খুলে নিল। তারপর সযত্নে ওকে ঢেকে দিয়ে বলল, “এবার শীত করছে?”

এবার যেন অদ্ভুত ম্যাজিক হল। অধিরাজ স্থির দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপরই কথা নেই, বার্তা নেই দু হাত বাড়িয়ে আহেলিকে সাপ্টে ধরল। ভয়ার্ত স্বরে বলল, “আমায় বাঁচাও... ও আমায় ধরবে... ও আমায়...।”

আহেলির মনে হল, এই মুহূর্তটায় মরে গেলেও তার কোনও আফসোস থাকবে না। অধিরাজের সবল দেহ তার নরম দেহবল্লরীকে পিষছে। জ্বর তপ্ত নিঃশ্বাস ছুঁয়ে যাচ্ছে তার কান, রেশমী চুল। গালের ওপর উত্তপ্ত গাল। তার প্রিয় মানুষ জড়িয়ে ধরে আছে তাকে। পূর্ণবয়স্ক এক যুবক, কিন্তু অবিকল শিশুর মতো মুখ লুকোচ্ছে তার কাঁধে। যেন তার কাছে আশ্রয় খুঁজছে। সে একটু ইতস্ততঃ করেই তার পিঠে হাত রাখে। সস্নেহে পিঠে, মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, “কেউ ধরবে না। আমি আছি তো!” তাকে আরও সজোরে চেপে ধরল ভয়ার্ত অধিরাজ, “তুমি কোথাও যাবে না! তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না! তুমি চলে গেলেই ও আসবে...!”

“কেউ আসবে না। আমি আছি তো। পাহারা দিচ্ছি।” অধিরাজকে ধরে রেখেই আত্রেয়ীর দিকে তাকাল আহেলি। আত্রেয়ী ইশারা বুঝতে পেরে তার হাতে ডঃ চ্যাটার্জীর দেওয়া সেডেটিভের সিরিঞ্জটা দিয়ে দেয়। আহেলি খুব সন্তর্পণে ইঞ্জেকশনটা পুশ করল। অধিরাজ তখন তার কাঁধে মুখ গুঁজে বসে আছে। সে টেরও পেল না। আহেলি ইঞ্জেকশন দিতে ওস্তাদ। অধিরাজের কোনওরকম সন্দেহই হয়নি। তার দুটো হাত তখনও আহেলিকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। ভীষণ বিশ্বাসে সে এখন ভর করেছে আহেলির ওপরে। এই ম্যাজিকটা কী করে হল উপস্থিত দুই নারীই জানে না । ডঃ চ্যাটার্জী যা বলেছেন ওরা তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। আহেলি চরম ধৈর্যে অপেক্ষা করছে সঠিক সময়ের। সে আস্তে আস্তে হাত বোলাচ্ছে তার পিঠে, মাথায়।

কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলল অধিরাজ। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলল, “তুমি আমায় ছেড়ে কখনও যাবে না তো?”

"না।" একটা শিশুকে যেমন আশ্বস্ত করা হয় তেমনভাবেই আহেলি তাকে আশ্বাস দেয়, "কখনও না।"

"যেও না।" -

আরও কিছুক্ষণ পরেই শিথিল হয়ে গেল তার আলিঙ্গন। আহেলি তবু একবার পরখ করার জন্য ডাকল, "অফিসার ব্যানার্জি?"

কোনও উত্তর নেই। অধিরাজ তার কাঁধে মাথা রেখে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আত্রেয়ী এতক্ষণ হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিল। এবার চাপা স্বরে বললেন, "স্যার ধরা দিলেনও তো কীভাবে দিদিভাই!"

আহেলি বিষণ্ন হেসে মাথা নাড়ল, "এভাবে চাই না! উনি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছেন, হ্যালুসিনেট করছেন। এ অবস্থাটা আমি আগেও দেখেছি। এখন চিনতে পারছেন না, তাই বলছেন, 'আমার কাছে বসে থাকো'। চিনতে পারলেই বলবেন, 'আপনি এখানে কেন বসে আছেন মিস মুখার্জী!' লোকটা আমায় দু চক্ষে দেখতে পারে না।"

"পারবেন। একদিন এ কথাটাই নিজের মুখে সজ্ঞানে বলবেন, মিলিয়ে নিও।"

আহেলি মৃদু হেসে বলল, "ডঃ চ্যাটার্জীকে ডেকে দাও। বলো অপারেশন সাকসেসফুল।"

ডঃ চ্যাটার্জী খবরটা পাওয়া মাত্রই বললেন, "ঘুমিয়ে পড়েছে? শিগগির ডাক্তারকে ডাকো। এই ফাঁকে চেক করে যাক। এখন অন্তত আট ঘণ্টা থেকে ন'ঘণ্টা ঘুমোবে। কড়া ডোজের সেডেটিভ দিয়েছি। যদি কিছু টেস্ট করার দরকার পড়ে তবে এই সুযোগেই স্যাম্পল নিয়ে নেওয়া যাবে।" ডঃ চ্যাটার্জীর হস্তক্ষেপে চেক-আপ সম্ভব হল। ডাক্তারবাবু চেক করে বললেন, "ভুল বকবেন না তো কী করবেন! টেম্পারেচার তো একশো পাঁচ ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেছে। আরও তিন ডিগ্রি উঠলেই ব্রেন ড্যামেজ হত। তার ওপর লাংসটাও এখনও পুরোপুরি রিকভার করেনি। কত দিন ঘুমোননি উনি? সম্ভবত টানা বেশ কয়েকদিন না ঘুমিয়েই আছেন। স্ট্রেস, আর মারাত্মক ট্রমা থেকেই হয়েছে। নার্ভাস ব্রেকডাউন থেকেও হতে পারে। রুটিন টেস্ট লিখে দিচ্ছি। করিয়ে নিন। কিন্তু আমি শিওর

এটা সাইকোজেনিক ফিভার। ঘুমোতে দিন। রেস্ট, মেডিকেশন, শান্তি; এগুলোই মেইন ওষুধ। প্রেসক্রিপশন সেকেন্ডারি।”

যখন বাইরের দুনিয়া ‘সার্জিক্যাল স’ কিলারের আতঙ্ক থেকে উদ্ধার পাওয়ার আনন্দে নাচছে, মিডিয়া ‘নায়কের’ ছবি তোলার জন্য বাড়ির সামনে ওৎ পেতে বসে আছে, তখন আহেলির শাল গায়ে দিয়ে অধিরাজ শিশুর মতো গুটিশুটি সেডেটিভের ঘোরে ঘুমোচ্ছিল। আত্রেয়ী সুযোগ পেয়ে ডঃ চ্যাটার্জীকে জিজ্ঞাসা করে, “এই অসম্ভবটাকে সম্ভব করলেন কী করে স্যার? মিস মুখার্জীকে স্যার ঐ অবস্থাতে বিশ্বাস করলেন কী করে?” “সিম্পল সাইকোলজি। সারা কেসে লোকে শুধু ও বেচারির বস্ত্রহরণ করেছে! কেউ ঢেকে দেয়নি অর্ণব ছাড়া। সেইজন্যই বলছিলাম অর্ণবকে দরকার ছিল। আহেলি সেটাই করেছে, যেটা অর্ণব করত। ওকে ঢেকে দিয়েছে। দ্যাটস অল!”

এরপর আস্তে আস্তে অধিরাজের অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে গেল। টানা বেশ কয়েকদিন মড়ার মতো ঘুমিয়ে যখন সে চোখ খুলল, তখন জ্বর নেমেছে। চাউনিটাও স্বাভাবিক। কিন্তু চাপা ভয়, আর গুমোট ভাবটা তখনই কাটল না। তার মুখ গম্ভীর। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। সবসময়ই গুম মেরে বসে আছে। ডঃ চ্যাটার্জী তা নিয়ে বিশেষ ভাবিত হননি। জানতেন যখন অর্ণব তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন এক ধাক্কায় অনেকটাই সুস্থতার দিকে এগোবে।

বাস্তবে ঘটনাটা ঘটলও তাই। অর্ণব একটু সুস্থ হয়েই ‘স্যারের’ সঙ্গে দেখা করতে এল। তার মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে অধিরাজের মুখে উদ্বেগের ছাপ পড়েছে। দু'জনকে প্রাইভেসি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন ডঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু ইভসড্রপিং করতে ছাড়লেন না। তাঁর কানে এল অর্ণবের চিরশান্ত সর্বংসহা কণ্ঠস্বর, “স্যার!”

“অর্ণব!” অধিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলল, “আই অ্যাম সরি।”

“কেন স্যার?”

বেশ কিছুক্ষণ কোনও আওয়াজ এল না। অখণ্ড নীরবতা। ডঃ চ্যাটার্জী কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। কী হল! কোনও শব্দ নেই কেন! দু'জনে মিলে করছেটা কী!

"ওটা কী দেখছ!" নীরবতা ভেঙে এবার অধিরাজের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। গলার আওয়াজেই স্পষ্ট, বিস্ফোরণ হতে চলেছে।

"আপনার রিফ্লেকশন।"

"না!" অধিরাজের গলা কাঁপছে, "ওটা রিফ্লেকশন নয়! ওটা কার্স। লোকে আমায় নায়ক বলে! কিন্তু আমি ক্লাউন অর্ণব। আমি অভিশপ্ত! আমার সিম্পলি মরে যেতে ইচ্ছে করে। লজ্জায়, ঘেন্নায় রোজ একটু একটু করে মরছি। নিজের দিকে যতবার তাকাই ততবারই মনে পড়ে ঐ স্কাউন্ড্রেলটা কী করেছে! কেন করেছে!"

"স্যার। প্লিজ, উত্তেজিত হবেন না। ভুলে যান।"

"ভুলে যাব।" -

এইবার বজ্রপাত! দাবানলের মতো দাউদাউ করে জ্বলছে অধিরাজ, "রোজ আমার সর্বাঙ্গে ঐ লোকটার আঙুল হেঁটে বেড়ায়। যদি আমি না থাকতাম, তবে এসব কিছু হত না! তোমায় এত কষ্ট পেতে হত না! আরেকটু হলেই তোমায় হারাচ্ছিলাম। রোজ দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি। এটাকে তোমরা সৌন্দর্য বলো! এটা কার্স! এটা কার্স! আই অ্যাম কার্সড! আই অ্যাম আ ড্যাম কার্সড ম্যান!"

বলতে বলতেই প্রচণ্ড জোরে আয়নার কাচ ভাঙার শব্দ! ডঃ চ্যাটার্জী নিশ্চিন্ত হলেন। ফাঁড়াটা আয়নার ওপর দিয়েই গেল।

– "আমি অভিশপ্ত ! আমি অভিশপ্ত! আই অ্যাম কার্সড! লোকটা আমাকে কোথায় টেনে নামাল অর্ণব। আমি একটা মানুষকে খুন করে ফেললাম। আমার মাথায়ও যেন দানব ভর করেছিল! ও আমায় কত নীচে নামাল! সব গেল! মান, সম্মান— সব কিছু...!"

ঘরের ভেতরে তখন অর্ণবের সামনে নতজানু হয়ে লজ্জায়, ঘেন্নায়, অনুতাপে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছিল অধিরাজ। নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে। অর্ণব নিশ্চুপে তাকে কাঁদতে দিয়েছিল। এই কান্নাটাই অনেকদিন ধরে বুকের মধ্যে দমন করে বেড়াচ্ছিল অধিরাজ। বেড়িয়ে যাক। সমস্ত গ্লানি, অপমান, কলঙ্ক জলে ধুয়ে যাক! সমস্ত মালিন্য মুছে

যাক । অর্ণব ও ডঃ চ্যাটার্জীর সাহচর্যে আস্তে আস্তে ট্রমা থেকে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এল অধিরাজ। ডঃ চ্যাটার্জীর বন্ধু নামকরা মনোবিদ ডঃ মনোহর চৌধুরীর সাহায্যে তার মানসিক জোরও বাড়ছে। উপরন্তু শিশির সেন তাকে লম্বা ছুটিও দিয়েছেন। মুচকি হেসে বলেছেন, "বেড়াতে যাও ব্যানার্জি। আর কত ক্রিমিনালের পেছনে দৌড়াবে? এবার বরং প্রজাপতি আর খরগোশের পেছনে দৌড়ে এসো।"

এতদিন তার সামনে কেউ এই কেসটার কথা ভুলেও তোলেনি। কারণ এই কেসটা সত্যিই একটা অভিশাপ। তবু কৌতূহল তো থেকেই যায়। ঘটনার প্রায় দু'মাস পরে অধিরাজকে ঘরোয়া আড্ডার মুডে পেয়ে অতি সাবধানে প্রশ্নটা তুলল অর্ণব। ভয় ছিল, অধিরাজ হয়তো ফের মারাত্মক ভাবে রি-অ্যাক্ট করবে। কিন্তু সে খুব শান্তভাবেই বলল, "কী জানতে চাও বলো?"

"তুমি বুঝলে কী করে যে অফিসার দাশগুপ্তই খুনী?" ডঃ চ্যাটার্জী জানতে চান, "আমরা তো ভাবতেই পারিনি।"

- অধিরাজের চোখে একটা ভয় ছাপ ফেললেও সে সামলে নিয়েছে, "সব তো চোখের সামনেই ছিল। তা ও বোঝেননি?"

"সব তো আমাদের সবারই চোখের সামনে থাকে।" ডঃ চ্যাটার্জী পেটেন্ট 'অ্যাংরি বার্ড' এক্সপ্রেশন দিয়েছেন, "কিন্তু সবসময় তুমিই কেল্লা -ফতে করবে কেন? এটা কী ধরনের ভদ্রতা?"

অধিরাজ একটু হাসার চেষ্টা করে, "বেশ। মোটিভের কথা অফিসার দাশগুপ্তের জবানিতেই আমরা জেনেছি। আপনিও ইতিমধ্যেই নিশ্চয়ই জেনেছেন। শুধু কীভাবে বুঝলাম সেটুকুই বলব। শুরু থেকেই ক্রাইমের প্যাটার্নটা দেখুন। প্রথমত, খুনীর কাউন্টডাউনের স্বভাব। যদি গভীরভাবে ভেবে দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন যে এটা একজন এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের স্টাইল। একজন এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টই শিকারকে ছেড়ে দিয়ে উলটো দশ থেকে শূন্য অবধি গোনেন। কাউকে মারার আগে কাউন্টডাউন করা তাদেরই প্যাটার্ন। দ্বিতীয়ত, যেটাকে আপনারা ডাক্তারি ব্যাকগ্রাউন্ড

বলছিলেন না, সেটা ডাক্তাররা ছাড়া আরেকদল লোকও খুব ভালো জানে। আর্মি ম্যান। আর্মি ম্যানদের রীতিমতো অ্যানাটমি শেখানো হয়। কারণ তাদের জানতে হয়, এগজ্যাক্টলি ঠিক কোথায় গুলি মারলে, ছুরি মারলে প্রতিদ্বন্দ্বী মরবে। খুনী ডাক্তার নয়। যদি হত, তাহলে তাকে ডামি দিয়ে ট্রায়াল দিতে হত না। প্রথম শিকারকে মারতে হাত কাঁপত না। এ পাবলিক জানে কীভাবে কাটতে হবে, কতটা কাটতে হবে। কোন শিরা কাটতে হবে। অর্থাৎ এ পাবলিক খুন করার জন্য যতটা অ্যানাটমি জানার, তা জানে, কিন্তু ডাক্তার নয়। তৃতীয়ত, তার ছুরির স্মুদ ব্যবহার। ছুটতে ছুটতেও সে অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ করতে পারে। গোটা ক্রাইমে কিন্তু কোথাও বন্দুক, পিস্তল ব্যবহার হয়নি। ছুরি আর সার্জিক্যাল স ইউজড হয়েছে। মজার কথা, এত ভালো ছুরির ব্যবহার শুধু দুটি প্রজাতিই করে। আর্মি ম্যান এবং সার্কাসের নাইফ থ্রোয়াররা ছাড়া এত ভালো ছুরি চালাতে কম লোকই জানে। সুইস আর্মি নাইফ বা আর্মি নাইফ তো সুবিখ্যাত! চতুর্থত, যখন অর্ণব খেপে গিয়ে ওকে তাড়া করেছিল তখন লোকটা জিগজ্যাগ প্যাটার্নে দৌড়াচ্ছিল! অদ্ভুত নয়! একমাত্র জিগজ্যাগ প্যাটার্নেই দৌড়লে এনকাউন্টার করা সম্ভব নয়। এটা সব হিস্ট্রিশিটাররা জানে না। জানলে কিলোদরে এনকাউন্টার হত না। কিন্তু যারা এনকাউন্টার এক্সপার্ট তারা জানবেনই। পঞ্চমত, লোকটা যখন পেছন থেকে আমায় অ্যাটাক করেছিল তখন ঠিক মাথার আর ঘাড়ের মাঝখানে মেরেছিল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলেও ওর মারের স্টাইলটা বুঝতে পেরেছিলাম। স্টাইলটাকে এক কথায় বলে হ্যামারফিস্ট। এটা মার্শাল আর্ট কম্ব্যাট টেকনিক। আর্মি ম্যানরা এইভাবেই মারে। ষষ্ঠত, লোকটা যেভাবে আমার ঘরে পাইপ বেয়ে, কার্নিশ বেয়ে উঠেছিল, ওটাও আর্মি ম্যানের স্পেশ্যালিটি। আমি মাউন্টেনিয়ারিং জানি বলে পারি। কিন্তু প্রত্যেক আর্মি ম্যানকেই খাড়া দেওয়াল বা পাহাড় চড়ার ট্রেনিং নিতে হয়। ওটা আর্মিতে বাধ্যতামূলক। সুতরাং প্যাটার্নের মধ্যেই একটা এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট আর আর্মিম্যানের কম্বিনেশন পাচ্ছিলাম। আপনারা যখন ডাক্তারি ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজছিলেন, তখন আমি পুলিস আর আর্মি কম্বো ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজছিলাম।”

“মার্ভেলাস!” ডঃ চ্যাটার্জী কৌতূহলী, “তারপর?” -

- “দুটো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ঘুরছিল। অফিসার দাশগুপ্ত কীভাবে জানলেন যে খুনী লালবাজারের সামনেই লাশ ডাম্প করবে? বৌবাজার বা বাগবাজার কী দোষ করেছে?”

“হয়তো তার বৌ আর বাগ পছন্দ নয়!” ডঃ চ্যাটার্জীর কথায় এবার সত্যিই হেসে ফেলল অধিরাজ, “যদিও সত্যিই বৌ খুনীর পছন্দ নয় কিন্তু ‘বাগ’ যে তার ভারী পছন্দের তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি, ইনফ্যাক্ট কো-ইনসিডেন্টালি তার ‘লাল’-ও খুব পছন্দ। কিন্তু প্রশ্নটা নাম নিয়ে নয়। জায়গা নিয়ে। খুনী লাশ ডাম্প কোথায় করবে সেটা সম্পূর্ণ তার মর্জি। কখনও কখনও তাকে বাধ্য করা যায় ঠিকই, সেটা তার অ্যাকশনে। প্লেসে নয়। আর যেখানে লাশটা স্বয়ং ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের নিজেরই সেখানে তিনি বেঁচে থাকাকালীন কিছুতেই ডাম্প করার জায়গা জানতে পারেন না। তবে? মরার আগেই নিজের আত্মাকে প্ল্যানচেট করে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন? এটার উত্তর তখনই পাওয়া যায় যদি পুলিস অফিসার ইকোয়ালটু খুনী হয়। ঐ একটা বোকার মতো ভুল করেছিলেন তিনি।”

“দ্বিতীয় প্রশ্নটা কী?”

“এটা আপনাদের মনে আসা উচিত ছিল। খুনী অত বড় বড় জোয়ান লোকগুলোর বডি ডাম্প করল কী করে? ঘাড়ে তুলে?” অর্ণব বলল, “অবভিয়াসলি গাড়ি করে।”

“শিওর শট।” কিন্তু কোন গাড়ি করে? পুলিস স্টেশনের আশেপাশে প্রাইভেট কারকে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। অথচ ডাম্প করতে হলে অন্তত সামান্য সময় দাঁড়াতেই হবে। একটা প্রাইভেট কার পুলিস স্টেশনের সামনে যত রাত্রেই দাঁড়াক, কারোর চোখে পড়বে না? তাহলে দৃশ্যটা নিশ্চয়ই এতটাই স্বাভাবিক ছিল যে কেউ দেখলেও মাথা ঘামায়নি। সেক্ষেত্রে কোন গাড়ি থেকে লাশ ডাম্প হতে পারে?”

অর্ণব হাঁ, “পুলিস কার?”

– “ঠিক তাই। পুলিস কার। পুলিসের গাড়ি যদি থানার সামনে দাঁড়িয়েও থাকে তবে কেউ তাকিয়েও দেখবে না।” অধিরাজ বলল, “দেখুন, অত্যন্ত সরল ব্যাপার। তার ওপর পাঁচ ভিকটিমকে বাদ দিলাম। বাকি ভিকটিমদের

-দেখুন। সম্ভাবনা আছে, তাঁরা খুন হওয়ার রাতে খুনীর মুখোমুখি হন। হয়তো খুনীর সঙ্গে কথাও বলেছেন। মোডাস অপারেন্ডিটা অনেকটা এরকম, খুনী তাদের সঙ্গে মিট করে, সুযোগ বুঝে স্যান্ডব্যাগ বা মাথা আর ঘাড়ের সংযোগস্থলে অতর্কিতে আঘাত করেছিল। তারা সেন্সলেস হয়ে যাওয়ার পর প্যাংকুয়োরোনিয়াম ইনজেক্ট করে দিয়েছে। বাকিটা পিস অব কেক। কিন্তু খুনী পুলিস অফিসারদের এত ঘনিষ্ঠভাবে পেল কী করে? অফিসাররা জানতেন যে আইও-রা মরছেন। তারপরেও প্রিকশান নেননি? অসম্ভব ব্যাপার! তাহলে খুনী কি এমন কেউ যে তাদের সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে? খবরি ছাড়া আর একটি অপশনও ছিল যাদের সঙ্গে অফিসাররা খুব নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারতেন। নিজের সহকর্মী, তথা একজন পুলিস অফিসার।"

"বাপ রে!" ডঃ চ্যাটার্জী টাক চুলকোচ্ছেন, "এত তো বুঝিনি!" অধিরাজ হাসল, "প্রথমেই পুলিসের কানেকশনটা আপনাদের বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা সরল বলেই আপনারা বোঝেননি। আমিও অবশ্য প্রথমে বুঝতে পারিনি। কনফিউজড ছিলাম।"

"তার মানে অফিসার দাশগুপ্তের বাড়ি গিয়েই তুমি সব বুঝতে পেরেছিলে।"

"হ্যাঁ। কারণ একমাত্র তিনিই আমার দেখা একমাত্র এনকাউন্টার এক্সপার্ট ও আর্মির কম্বো প্যাক। উপরন্তু আপনারা যমরাজের শিং ওয়ালা লকেট, আর সুকোমলের দেখা স্কুটারের লিডটা ভুলে যাচ্ছেন।"

"শিং এর সঙ্গে স্কুটারের কী যোগাযোগ?" ডঃ চ্যাটার্জী অবাক, "স্কুটারের মাথায় আয়না আছে, শিং নেই!" -

অধিরাজ আড়চোখে তাঁর টাকটি দেখে নেয়, "আপনার মতো চকচকে?" "শোনো বদমায়েশ, বর্বর।" ফরেনসিক বিশারদ খেঁকিয়ে ওঠেন, "আমার টাক নিয়ে ফাজলামিটা পরে করবে, আগে এক্সপ্লেইন করো। নয়তো এখনই 'ছোঁড়া' তোমার 'চুলের গোড়া' ধরে টান মারব।" -

"ওকে ওকে।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "একটা কথা বলুন তো, লোকগুলোর মুণ্ডু বত্রিশ বছর ধরে সাজিয়ে রাখার মানেটা কী? ওগুলো আসলে লাগল কীসে?"

"ভূতের প্রপিতামহের শ্রাদ্ধে?"

"আজ্ঞে না। নাগা ট্রাইবের হেড হান্টিং এর কেস জানেন?"

ডঃ চ্যাটার্জীর মুখ অবিকল ফাটা বেলুনের মতো হয়ে গেল, "সেটা কী জিনিস?"

"নাগাল্যান্ডে আদিবাসীদের মধ্যে বীরত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন ছিল হেড হান্টিং। শত্রুকে পরাজিত করে তার মাথা কেটে এনে ডিসপ্লে করাটা অত্যন্ত বীরত্বের কাজ। ওদের কালচারে যার কালেকশনে যত বেশি মাথা, সে তত বড় বীর! যত স্কাল ঘরে জমবে, বাজারেও তার তত বেশি দর ও কদর! ডিসপ্লেতে যত মাথা, বীর হিসেবে তত সম্মান। এটাই নাগাল্যান্ডে আদিবাসীদের এককালীন কালচার ছিল।"

"তার সঙ্গে শিং আর স্কুটারের সম্পর্ক কী?" অধিরাজ হাসল, "আপনি জানেন না, নাগাল্যান্ডের সবচেয়ে বড় প্রতীক হল শিং। বাইসন বা গয়ালের শিং। আর অফিসার দাশগুপ্তের ক্ষেত্রে তো শিঙের ছড়াছড়ি। লকেটে শিং, বাড়িতেও শিং।"

"কিন্তু স্যার...।" অর্ণব বাধা দেয়, "ওঁর বাড়িতে তো মোষের শিং ছিল।" -

"না অর্ণব। ওখানেই তো কবি কেঁদেছেন।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "মনে আছে, আমি তোমায় বলেছিলাম মোষের শিং আরও বেশি প্যাঁচালো হয়?"

"হ্যাঁ।"

– "কিন্তু বাইসনের শিং অত প্যাঁচালো হয় না।" তার মুখে সেই দুষ্টু হাসি, "যখন পোগোনোফোবিয়ার কেসটা বুঝলাম, তখন মাথায় ঢুকল অফিসার দাশগুপ্তের বাড়িতে মোষের শিং কেন প্যাঁচালো নয়। কারণ প্রাণীটা বাফেলোই নয়, বাইসন ছিল। ওটা বাইসনের মাথা। কিন্তু অফিসার দাশগুপ্তের পোগোনোফোবিয়া ছিল বলে উনি বাইসনের মুখের দাড়ি গোঁফ তথা লোমগুলো কেটে দিয়েছিলেন। বাইসন আর বাফেলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য ওটাই। যার জন্য আমিও কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম। যিনি বিড়ালের গোঁফ অবধি কেটেছিলেন, তিনি বাইসনের দাড়ি গোঁফ রাখবেন কখনও? ওঁর গলায় সোনার লকেটে যেটা ঝুলত সেটা যমের শিং নয়, বাইসন বা গয়ালের শিং। ওঁর বাড়ির বেঁটে মূর্তিগুলোও নাগা ট্রাইবাল আর্টের নিদর্শন। উনি শুধু রাবণ নন, নাগা ট্রাইবাল কালচারেও অবসেসড।"

"আর স্কুটার?" -

"স্কুটারের রঙ ছিল লাল, হলুদ আর কালো। আরও সূক্ষ্ম বিচারে মাথাটা লাল-হলুদ, বডিটা কালো। আপনাদের আর জেনারেল নলেজের চক্করে ফেলছি না। মাথা, তথা বিরাট লাল-হলুদ ঠোঁট, আর কালো বডিওয়ালা সবচেয়ে বিখ্যাত পাখিটির নাম হর্নবিল। আরও অনেক রঙের ভ্যারাইটি আছে হর্নবিলের। কিন্তু এই হর্নবিলের লোগোয় এই তিনটে রঙই বেশি ব্যবহৃত হয়। হর্নবিল নাগাল্যান্ডের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। ওখানে হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল হল সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যাল। আমাদের খুনী হর্নবিলের রঙওয়ালা স্কুটার নিয়ে সুকোমল পান্ডের কাছে সার্জিক্যাল স চাইতে গিয়েছিলেন; তার অর্থ তিনি নাগা কালচারে অবসেসড। তার ওপরে আমাদের দাশগুপ্তবাবুও নাগাল্যান্ড বলতে অজ্ঞান হচ্ছেন! তিনি আসামের লোক, যেখানে নাগা ট্রাইবও থাকে। উপরন্তু তিনিই একমাত্র লোক যাঁর সাবজেক্ট অ্যানথ্রোপলজি! কালচারাল অ্যানথ্রোপলজিতে আবার আদিবাসীদের কালচার নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়, এক্সপ্লোর করতে হয়। এর অর্থ কী বুঝব? সব কিছু কো-ইনসিডেন্স?"

"মা-ই ...!"

— "গড" বলতেও ভুলে গেলেন ডঃ চ্যাটার্জী। অধিরাজ হাসল, "এখনই ভুরু দুটোকে টাকে তুলবেন না। আরও কয়েকটা ভুল উনি করেছেন। রাবণের ছবিটা ওঁর আঁকা উচিৎ হয়নি, কারণ ওটা দেখেই বুঝেছিলাম যে ওখানে উনি নিজেকেই এঁকেছেন। দু'নম্বর সংখ্যাটা নিজের আয়নায় লিখে ছবি তোলা উচিৎ হয়নি। গোল্ডেন মেক-আপ করে স্ট্যাচু সেজে বসে থাকাও উচিত হয়নি।"

"কেন শুনি?"

"কারণ খুনীরা সবসময়ই বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে। উনি ছবিটা তুললেন যখন, তখন ওঁর ঘরে টিভি চলছিল। লাইভ স্কোরকার্ড দেখাচ্ছিল স্ক্রিনে। যেহেতু লাইভ শব্দটা দেখা যাচ্ছে, সেহেতু ওটা হাইলাইট বা রি-টেলিকাস্ট নয়। লাইভ ম্যাচই বটে। অর্ণব তুমিই বলো, যে লোকের পেছনে ডেঞ্জারাস খুনী লেগেছে, অলরেডি আটটা খুন করে ফেলেছে, সে

যখন কাউন্টডাউন লেখে, তখন কেউ আরাম করে ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ দেখতে দেখতে তার ছবি তোলে? এত ক্যাজুয়াল? আরও মজার কথা, আয়নায় দুই সংখ্যা লেখা ছিল। একুশে অক্টোবরে যদি কাউন্টডাউনে জিরো আসে তবে দুই উনিশ তারিখ হওয়া উচিৎ। উনিশ তারিখ ১৯৮৭ সালের ওয়ার্ল্ডকাপের শিডিউলে কোনও ম্যাচই ছিল না! আমার সন্দেহ হওয়ায় একটু ভেরিফাই করলাম। আঠেরোই অক্টোবরের পর নেক্সট ম্যাচ একুশে অক্টোবর। তবে উনি ছবিটা কবে তুলেছিলেন? আঠেরোই অক্টোবরে নিশ্চয়ই নয়। কারণ একদিন আগে খুনী নিশ্চয়ই আগাম কাউন্টডাউন লিখবে না। কখনই সে লেখেনি। আর একুশে অক্টোবরে সে জিরো লিখেছিল, খামোখা দুই লিখবে কেন! তবে এরকম একটা গোলমাল হল কেন? তাহলে যিনি ছবিটা তুলছেন, খুনী তাঁর সুবিধামতোই কাউন্টডাউন লিখেছে। কেন? একটাই উত্তর! কারণ যিনি ছবি তুলছেন, তিনিই কাউন্টডাউন লিখেছেন! ওঁর তাড়াহুড়ো ছিল। নেগেটিভ ডেভেলপ করতেও তো সময় লাগে। তখন থোড়াই ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল!”

“আর গোল্ডেন মেক আপের ব্যাপারটা?”

“পবিত্র জিজ্ঞাসা করেছিল যে ‘একটা জীবিত লোক একই পোজে, দমবন্ধ করে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে কী করে!’ এর উত্তর যদি সে স্ট্যাচু সাজার নিয়মিত প্র্যাকটিস করে কিংবা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার হয়!”

“ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার স্যার?”

“অফকোর্স। কারণ একমাত্র ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফাররাই দুষ্প্রাপ্য পাখিদের ছবি তুলতে অভ্যস্ত। পাখি ডালে বসে আছে এই অবস্থায় ছবি তোলা সোজা নয়। ফটোগ্রাফারকে স্ট্যাচুর মতো অনেকক্ষণ একই পোজে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, প্রায় দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাতে পাখিটা তাকে কোনও স্থির বস্তু ভেবে নিশ্চিন্ত হয়, এবং ডালে এসে বসে। লাফালাফি করলে আর যাই হোক, ছবি তোলা যায় না! আর এই অভ্যাসটা রথীন দাশগুপ্তের ছিল। পাখির মতো চঞ্চল প্রাণীও তাঁর স্থির মূর্তি দেখে বুঝতে পারেনি যে তিনি মানুষ। বুঝতে পারলে থ্রেট বুঝে পালিয়ে যেত। ক্যামেরা বন্দি হত না। অত সেন্সিটিভ প্রাণীও বোঝেনি, তাহলে আমরা কোন কাননের ফুল?”

"তুমি ওঁর বাড়িতে গিয়েই বুঝেছিলে যে উনিই খুনী! কিন্তু উনি তো মৃত ছিলেন। তবে?"

"ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমায় এ প্রশ্ন করছেন ড? লাশটার তো মাথাই ছিল না। ডি এন এ টেস্ট কী জিনিস তখনও ফরেনসিক জানে না। ভরসা ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তার ওপর ১৯৮৭ তে ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার ছিল না। হাতে কালি দিয়ে আঙুলের ছাপ দিতে হত। লাশের হাতে নীল কালি কেন ছিল? ওটা পেনের কালি নয় বা নীল রঙও নয়। সুমঙ্গল পন্ডিতকে মারার প্ল্যানিং করে ভুজুং ভাজুং দিয়ে তার হাতের ছাপ তুলে নিয়েছিলেন অফিসার দাশগুপ্ত। তারপর নিজের রেকর্ড ফাইলে তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্টের জায়গায় সুমঙ্গলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখে দিয়েছিলেন। মানে, নিজের রেকর্ডে সুমঙ্গলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপ্লেস করেছিলেন। দুঃখের বিষয় সেই কালান্তক কালি অনেক চেষ্টাতেও ওঠেনি। সেইজন্যই আপনি সি আই ডি ডেটাবেসের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে অফিসার দাশগুপ্তের হাতের ছাপ মেলাতে পারেননি। কারণ ছবিটাতে নিঃসন্দেহে অফিসার দাশগুপ্তেরই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল। শিশির সেনের থাকাই স্বাভাবিক। উনি ও বাড়িটা মেইনটেইন করতেন। কিন্তু আপনার ডেটাবেসের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে মেলেনি কারণ সি আই ডি ডেটাবেসে অফিসার দাশগুপ্তের নামে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টটি ছিল, সেটি রথীনবাবুর নয়; সুমঙ্গলবাবুর ছিল। তাছাড়া বীণা পন্ডিতের কথাবার্তাও ফিশি। লক্ষ্য করেছ? উনি যতবার অফিসার দাশগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন, ততবারই প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করেছেন। যেমন দাঙ্গা সম্পর্কে বলেছেন; 'একমাত্র অফিসার দাশগুপ্তই বেঁচে গিয়েছেন।' 'গিয়েছিলেন' নয়, গিয়েছেন! 'আশ্রয় দিয়েছিলেন' নয়; দেন! একজন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে একজন ভদ্রমহিলা প্রেজেন্ট টেন্স কেন ইউজ করবেন যদি না উনি জেনে থাকেন যে লোকটা আদৌ মৃত নয়; জীবিত! যদি ওনার স্বামী ওঁকে অফিসের কোনও কথা বলতেন না, তবে শিশির সেনের রেডলাইট এরিয়ায় থাকার কথা ওঁকে কে বলেছিল? কনট্রাডিক্টরি কথাবার্তা। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম রথীন দাশগুপ্ত জীবিত আছেন, এবং বীণা সেটা খুব ভালোভাবেই জানেন। এমনকী তিনি অপরাধীর জনসনস বেবি ক্রিম ও পাউডারও নিজের ঘরে এনে রেখেছেন। এতখানি ক্লোজ সম্পর্ক! আবার ওঁর বাড়িওয়ালা পঞ্জিকা ছাড়াই অমাবস্যার দিন যে সূর্যগ্রহণ পড়ছে তা বলে দিতে পারেন! ক'টা লোকের সূর্যগ্রহণ

আর অমাবস্যা নিয়ে মাথাব্যথা! একমাত্র পুরোহিত আর খুঁতখুঁতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়? ওঁর সারনেম মন্ডল। না পুরোহিত, না ব্রাহ্মণ তবে?"

"এইবার পুরো খেলাটা বুঝলাম!" অর্ণব বলে, "সেইজন্যই আপনি ট্র্যাপ পেতেছিলেন?" -

"শিওর শট। আর ফলাফল তো তুমি নিজেই দেখতে পেলে।"

"একটা জিনিস বুঝলাম না!" ডঃ চ্যাটার্জী বলেন, "উনি নিজেই নিজের খুন সম্পর্কে লিড দিয়েছিলেন কেন?"

"নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। বাকিরা যা পারেননি, তিনি তা পেরেছিলেন বোঝানোর জন্য। আর শিশির সেনও বলিহারি! ওঁর সন্দেহের কথা বত্রিশ বছর ধরে চেপে গিয়েছিলেন। ওঁর বিহেভিয়ারটা দেখো। এডিজি সাহেব এত ইমোশনালও নন যে মৃত স্যারের বাড়িকে তাজমহল বানাবেন! অথচ বাড়িটা কী ওয়েল মেইনটেইনড দেখেছ? কখন লোকে এরকম করে সাজিয়ে রাখে? এমনকি নিজের গ্যাঁট কেটে ইলেক্ট্রিক বিলও দিয়েছেন! এত কাণ্ড লোকে তখনই করে যখন ভাবে, লোকটা ফিরে আসবে। শিশির সেন ভূতে বিশ্বাসী নন। তবে কোন বিশ্বাসে ঘর দোর সাজিয়ে রেখেছিলেন?

তিনিও কোনও না কোনও ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে মৃতদেহটা রথীন দাশগুপ্তের নয়। তিনি জীবিত আছেন।"

"এত কিছু থাকতে সার্জিক্যাল স কেন? বন্দুক নিলে হত না?"

"কী মুশকিল ডক! বন্দুক নিয়ে রাবণ হবেন কী করে? বন্দুক দিয়ে গলাও কাটা যায় না! গলা কাটতে হলে তো রামদার চেয়ে বেটার অপশন সার্জিক্যাল স।"

"লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার!" -

অধিরাজ এবার যেন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, "বলো।"

"আপনি বুঝলেন কী করে যে অফিসার দাশগুপ্তই সুমঙ্গল পন্ডিত সেজে সুকোমল পান্ডের কাছে গিয়েছিলেন?" -

"উনি সুকোমলকে বলির পাঁঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কী করে জানবেন যে ও একজন প্যাথেটিক প্যাথোলজিক্যাল লায়ার?" অধিরাজ হাসতে হাসতেই এবার জানলার

সামনে দাঁড়ায়, "সুকোমল মিস দত্তকে জানিয়েছিল যে সুমঙ্গল ওর ইয়ে। আসল সুমঙ্গলের থোবড়া দেখেছ? আর সুকোমল পান্ডের চয়েসগুলো দেখো। শিশির সেন, আমি, বেবো। তোমার মনে হয় সুমঙ্গল পন্ডিতের প্রতি ও অ্যাট্রাক্টেড হবে? অন্যদিকে রথীন দাশগুপ্তের চেহারা বেশ রোম্যান্টিক। হি ওয়াজ অ্যাট্রাকটিভ। ব্যস দুয়ে দুয়ে চার। উনি সুমঙ্গলের কাছে মেক-আপের পাশাপাশি ফলো করার শিল্পটিও শিখেছিলেন! একদম ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে রথীন দাশগুপ্ত ছাড়া আর কেউ হতেই পারত না...!" -

বলতে বলতেই অধিরাজ কী দেখে যেন শিউরে ওঠে! অর্ণব দেখল সে দরদর করে ঘামছে। তার চোখের দৃষ্টি ভয়ার্ত! বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

"স্যার!" -

সে তাড়াতাড়ি জানলার সামনে গিয়ে দেখল এক পাগল ভিখিরি ঠিক সেই ল্যাম্পপোস্টের নীচেই এসে দাঁড়িয়েছে। অবিকল বাবুর মতোই দেখতে! সে ক্ষুধার্ত চোখ তুলে ঠিক অধিরাজের দিকেই তাকিয়ে আছে। অবিকল সেই রূপ, যে রূপে খুনী প্রথম অধিরাজকে ছুঁয়ে গিয়েছিল! অর্ণব এগিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সশব্দে জানলা বন্ধ করে দেয়! অধিরাজের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। মানুষটা এখনও ভুলতে পারছে না রথীন দাশগুপ্তকে! কী অদ্ভুত খুনী। কী অদ্ভুত তার প্রেম! কী ভয়ঙ্কর তার ভালোবাসা? একেই কি হিন্দিতে বলে; 'জুনুন'! তাহলে জুনুন, প্রেম আর প্যাশনের থেকে ভয়াবহ জিনিস আর পৃথিবীতে নেই!

"এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তে
মিটিবে কি কভু আর।
বুকের ভিতরে ছুরির মতোন,
মনের মাঝারে বিষের মতোন,
রোগের মতোন, শোকের মতোন
রব আমি অনিবার।

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে,

আশার পশ্চাতে ভয়

ডাকিনীর মতো রজনী ভ্রমিছে

চিরদিন ধরে দিবসের পিছে

সমস্ত ধরণীময়।

যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া

এই তো নিয়ম ভবে,

ও রূপের কাছে চিরদিন তাই

এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!”

বত্রিশ বছর আগের ঘটনা... সিরিয়াল কিলিং?

একই দিনে, গভীর রাতে শহরের পাঁচটি পুলিশ স্টেশনের সামনে একের পর এক ডাম্প করা হল পাঁচজন পুরুষের লাশ। শুধু মাথার জায়গায় বসানো ছিল একটি করে হাঁড়ি। হাঁড়ির ওপর রক্ত দিয়ে লেখা — 'গেস হু?'

যারা খুন হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনও মিল নেই! কেউ কাউকে চিনতই না। তবে খুনী তাদেরই বেছে বেছে খুন করল কেন?

১৫ দিনের মাথায় পাওয়া গেল এই কেসের ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের মুণ্ডহীন মৃতদেহ। এরপর একইভাবে মৃত্যু হয়েছে আরও তিনজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের। কোনও অফিসারই আর রাজি নন কেসটি নিতে...

৩২ বছর পর কেন আবার দরকার পড়ল রি-ইনভেস্টিগেশনের?

একজন প্যাথলজিকাল লায়ার... সবকিছুতে সে মিথ্যে বলে, এমনকি নিজের নাম পর্যন্ত। অধিরাজ কি পাবে মিথ্যের ভিড়ে সত্যের খোঁজ?

অত্যন্ত দুঃখে আছে নিঃসঙ্গ মানুষটি। ক্যালেন্ডারে একের পর এক ডেট ক্রস দিয়ে যাচ্ছে সে! কিন্তু কেন?

না আছে কোনও ফরেনসিক রিপোর্ট, না আছে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী বা সিসিটিভি ফুটেজ। অন্যদিকে সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন অধিরাজের বস স্বয়ং এডিজি শিশির সেন! তদন্ত চলাকালীন অধিরাজও অনুভব করল বেশ কিছু সংখ্যার অনভিপ্রেত উপস্থিতি।

'সার্জিকাল স' হাতে হানা দেয় সে চুপি চুপি...

কিন্তু কেন? সে কে? কেনই বা সে মেতেছিল এই হত্যালীলায়? বত্রিশ বছর পরে কি কেস সলভ হবে? নাকি অধিরাজ স্বয়ং হয়ে যাবে খুনীর দশম শিকার!

কাউন্টডাউন বিগিনস... চুপি চুপি আসছে।

BIVA CLASSICS

ISBN 978-81-944841-6-5
9 788194 484165
₹ ২৬৬.০০
www.bivapublication.com